গণ-দেবতা

(চণ্ডীমণ্ডপ)

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কাত্যায়নী বুক স্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান
কাত্যায়নী বুক ষ্টল
২০৩, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫

মূল্য—চার টাকা

৬৭, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশক্তিরঞ্জন কর্তৃক প্রকাশিত ২০৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, [illegible]
শ্রীরসিকলাল পান কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণের

নিবেদন

সংক্ষেপে কয়েকটি কথা প্রয়োজনবোধে নিবেদন করিতেছি। 'গণ-দেবতা' বইখানি 'ভারতবর্ষে' ধারাবাহিকভাবে বাহির হইতেছে। এটি তাহার অংশবিশেষ;—চণ্ডীমণ্ডপ নামাঙ্কিত অংশ। দ্বিতীয় অংশ 'পঞ্চগ্রাম' নামে বাহির হইতেছে। 'ভারতবর্ষে' যাঁহারা 'চণ্ডীমণ্ডপ' পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন—'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'চণ্ডীমণ্ডপ' ও বর্ত্তমান বইখানি প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। গোড়ার আশী পৃষ্ঠা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার পর—একাশী পৃষ্ঠা হইতে অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ নূতন। প্রয়োজন বোধে পরিবর্ত্তন করিতে বসিয়া সমস্তই পাল্টাইয়া গেল। প্রায় প্রতিটি ছত্র নূতন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ভাল-মন্দের বিচারক যাঁহারা, তাঁহারা ভাল-মন্দ বিচার করিবেন। বিচারপ্রার্থীর মত তাঁহাদের রায় আমি সসম্মানে মাথা পাতিয়া লইব।

এই সুযোগে আর একটি অবান্তর কথার অবতারণা করিব। বর্ত্তমানে সাহিত্যক্ষেত্রে আর একজন শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাধনার ব্রতী হইয়াছেন। এক নামে দুই জনকে লইয়া বহু ক্ষেত্রেই বিভ্রমের সৃষ্টি হইতেছে। তিনি নবীন; তাঁহার অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার খ্যাতি (এবং নিন্দাও) আমার উদ্দেশ্যে বর্ষিত হয়। মধ্যে মধ্যে আমি চিঠিপত্র পাইয়া থাকি। কয়েকটি লাইব্রেরীতে আমার পুস্তক-তালিকার সঙ্গে তাঁহার পুস্তক অন্তর্ভুক্ত হইতে দেখিয়াছি। উপস্থিত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে—'শ্রীময়ী' ও 'অমানিতা 'মানবী' (প্রকাশক ডি. এম. লাইব্রেরী।) এই বিভ্রম অপনোদনের জন্য আমি কিছুদিন হইতেই উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় আমার গ্রামের নাম "লাভপুর বীরভূম" উল্লেখ করিয়া থাকি। সেইটুকুই এই সুযোগে পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। নূতন তারাশঙ্কর 'প্রবর্ত্তকে'র নিয়মিত লেখক। আমি 'প্রবর্ত্তকে আজ পর্য্যন্ত লিখি নাই।*

লাভপুর, বীরভূম।
আশ্বিন—১৩৪৯

ইতি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

হাউস হইতে প্রকাশিত প্রান্তিক বইখানি ও এই আমার নয়।
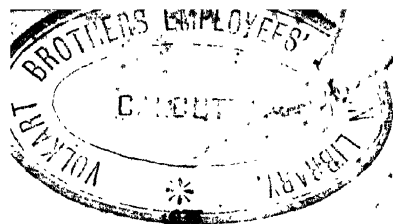
কারণ সামান্য। সামান্য কারণেই একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল। গ্রামের কামার অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার ও ছুতার গিরিশ সূত্রধর নদীর ও-পারে বাজারে-সহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকন ফাঁদিয়াছে। খুব ভোরে উঠিয়া যায়, আসে রাত্রি দশটায়। ফলে গ্রামের লোকের অসুবিধার আর শেষ নাই। এবার চাষের সময় কি নাকাল যে তাহাদের হইতে হইয়াছে, সে তাহারাই জানে। লাঙলের ফাল পাজানো, গাড়ীর হাল বাঁধার জন্য চাষীদের অসুবিধার আর অন্ত ছিল না। গিরীশ ছুতারের বাড়ীতে গ্রামের লোকের বাবলা কাঠের গুঁড়ি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে গত বৎসরের ফাল্গুন-চৈত্র হইতে; কিন্তু আজও তাহারা নূতন লাঙল পাইল না।

এই ব্যাপার লইয়া অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের বিরুদ্ধে অসন্তোষের সীমা ছিল না। কিন্তু চাষের সময় ইহা লইয়া একটা জটলা করিবার সময় কাহারও হয় নাই। প্রয়োজনের তাগিদে তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া কার্য্যোদ্ধার করা হইয়াছে; রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অনিরুদ্ধের বাড়ীর দরজায় বসিয়া থাকিয়া, তাহাকে আটক করিয়া লোকে আপন আপন কাজ সারিয়া লইয়াছে; জরুরী দরকার থাকিলে, ফাল লইয়া, গাড়ীর চাকা ও হাল গড়াইয়া গড়াইয়া সেই সহরের বাজার পর্য্যন্তও লোকে ছুটিয়াছে। দূরত্ব প্রায় চার মাইল—কিন্তু ময়ূরাক্ষী নদীটাই একা বিশ-ক্রোশের সমান। বর্ষার সময় ভরা নদীর খেয়া-ঘাটেই পারাপারে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া যায়। শুকনার সময়ে আট মাইল বালি ঠেলিয়া গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়াও সোজা কথা নয়। একটু

ঘুর-পথে নদীর উপর রেলওয়ে ব্রীজ আছে; কিন্তু লাইনের পাশের রাস্তাটা এমন উঁচু ও অল্পপরিসর যে গাড়ীর চাকা গড়াইয়া লইয়া যাওয়া কষ্টকর।

চাষ শেষ হইয়া ফসল পাকিয়া উঠিয়াছে—এখন কাস্তে চাই। কামার চিরকাল লোহা-ইস্পাত লইয়া কাস্তে গড়িয়া দেয়—পুরানো কাস্তেতে সান্ লাগাইয়া দেয়; ছুতার বাঁট লাগাইয়া দেয়। কিন্তু কামার-ছুতার সেই একই চালে চলিয়াছে; যে অনিরুদ্ধের হাত পার হইয়াছে, সে গিরীশের হাতে দুঃখ ভোগ করিতেছে। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের লোক এক হইয়া পঞ্চায়েৎ-মজলিস্ ডাকিয়া বসিল। কেবল একখানা গ্রাম নয়, পাশপাশি দুইখানা গ্রামের লোক একত্র হইয়া গিরীশ ও অনিরুদ্ধকে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন জানাইয়া ডাকিয়া পাঠাইল। গ্রামের শিবতলায় বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে মজলিস বসিল। চণ্ডী-মাণ্ডপে ময়ূরেশ্বর শিব; পাশেই গ্রামদেবী মা ভাঙা-কালীর বেদী। কালী-ঘর যতবার তৈয়ারী হইয়াছে, ততবারই ভাঙিয়াছে—সেই হেতু কালীর নাম ভাঙা-কালী। চণ্ডীমণ্ডপটিও বহুকালের; হাতীশুঁড়-বড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়া চাল-কাঠামোটি যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নীচের মেঝেও সনাতন পদ্ধতিতে মাটির। এই চণ্ডীমণ্ডপে শতরঞ্জি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল।

গিরীশ, অনিরুদ্ধ না আসিয়া পারিল না। যথাসময়ে তাহারা দু'জনেই আসিয়া উপস্থিত হইল। মজলিসে দুইখানা গ্রামের মাতব্বর লোক একত্র হইয়াছিল; হরিশ মণ্ডল, ভবেশ পাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্ত্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল—ইহারা সব ভারিক্কী লোক, গ্রামের মাতব্বর সদ্গোপ চাষী। পাশের গ্রামের দ্বারকা চৌধুরীও উপস্থিত হইয়াছে। চৌধুরী বিশিষ্ট-প্রবীণ ব্যক্তি, এ অঞ্চলে বিশেষ মাননীয়

জন। আচার ব্যবহার ও বিচারবুদ্ধির জন্য সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। লোকে এখনও বলে—কেমন বংশ দেখ্‌তে হবে। এই চৌধুরীর পূর্ব্ব-পুরুষেরা এককালে দুইখানি গ্রামের জমিদার ছিলেন; এখন ইনি অবশ্য সম্পন্ন চাষীরূপেই গণ্য। দোকানী বৃন্দাবন দত্ত—সেও মাতব্বর লোক। মধ্যবিত্ত অবস্থার অল্পবয়স্ক চাষী গোপেন পাল, রাখাল মণ্ডল, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিল। এ-গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষাল—ও গ্রামের নিশি মুখুজ্জে, পিয়ারী বাঁড়ুজ্জে—ইহারাও একদিকে বসিয়াছিল।

আসরের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরু পাল; সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল। ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী যাহারা, ছিরু ধন-সম্পদে তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয়—এই কথাই লোক অনুমান করে। লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার চরিত্র-হীন ধনী ছিরু পালকে লোকে মনে মনে ঘৃণা করে; বাহিরে ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ করে না। ছিরুর ক্ষোভ হয়; লোকে তাহাকে সম্মান করে না বলিয়া সে সকলের উপরই বিরক্ত। এ প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া সে আয়ত্ত করিতে বদ্ধপরিকর। তাই সাধারণের সামাজিক মজলিস হইলেই ঠিক মাঝখানে আসিয়া সে জাঁকিয়া বসে।

আর একটি সবলদেহ দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ যুবা নিতান্ত নিস্পৃহের মত একপাশের থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে দেবনাথ ঘোষ,—এই গ্রামেরই সদ্‌গোপ-চাষীর ছেলে। দেবনাথ নিজ-হাতে অবশ্য চাষ করে না, স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত।

আসিবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকিলেও সে আসিয়াছে; অনিরুদ্ধের কে অন্যায় সে অন্যায়ের মূল কোথায় সে জানে। ছিরু পালের মত ব্যক্তি যে মজলিসে মধ্যমণির মত জম্‌কাইয়া বসে, সে মজলিসে তাহার আস্থা নাই বলিয়াই এই নিস্পৃহতা; নীরব অবজ্ঞার সহিত সে একপাশে থাকে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আসে নাই কেবল ও গ্রমের কৃপণ মহাজন মৃত রাখহরি চক্রবর্ত্তীর পোষ্যপুত্র হেলারাম চাটুজ্জে ও গ্রাম্য ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ। গ্রামের চৌকীদার ভূপাল লোহারও উপস্থিত ছিল। আশেপাশে ছেলেদের দল গোলমাল করিতেছিল; একেবারে একপ্রান্তে গ্রামের হরিজন চাষীরাও দাঁড়াইয়া ছিল। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষী—অসুবিধার প্রায় বারো-আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকে।

অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ আসিয়া মজলিসে বসিল। বেশভূষা অনেকটা পরিচ্ছন্ন ফিটফাট—তাহাদের মধ্যে সহুরে ফ্যাশানের ছাপ সুস্পষ্ট; তাহারা দুইজনেই সিগারেট টানিতে টানিতে আসিতেছিল—মজলিসের অনতিদূরেই ফেলিয়া দিয়া মজলিসের মধ্যে আসিয়া বসিল।

অনিরুদ্ধ কথা আরম্ভ করিল; বসিয়াই হাত দিয়া একবার মুখট বেশ করিয়া মুছিয়া লইয়া বলিল—কই গো, কি বলছেন বলুন। আমর খাটি-খুটি-খাই; আমাদের আজ এ বেলটাই মাটি।

কথার ভঙ্গিমায় ও সুরে সকলেই একটু চকিত হইয়া উঠিল; প্রবীণের দলের মধ্যে সকলেই একবার সশব্দে গলা ঝাড়িয়া লইল। অল্পবয়সীদের ভিতর হইতে একটা গুঞ্জন উঠিল। ছিরু ওরফে শ্রীহরি বলিয়া উঠিল—মাটিই যদি মনে কর, তবে আসবারই বা কি দরকার ছিল?

হরেন্দ্র ঘোষাল কথা বলিবার জন্য হাঁক-পাঁক করিতেছিল; সে বলিল,—তা' মনে হ'লে এখনও উঠে যেতে পার তোমরা। কেউ ধ'রে নিয়েও আসে নাই, বেঁধেও রাখে নাই তোমাদিগে।

হরিশ মণ্ডল এবার বলিল—চুপ কর তোমরা। এখানে যখন ডাকা হয়েছে, তখন আসতেই হবে। তা তোমরা এসেছ, বেশ কথা—ভাল কথা, উত্তম কথা। তারপর এখন দু'পক্ষে কথাবার্ত্তা হবে; আমাদের বলবার যা বলব—তোমাদের জবাব যা তোমরা দেবে; তারপর তার বিচার হবে। এত তাড়াতাড়ি করলে হবে কেন?

গিরীশ বলিল—তা হ'লে, কথা আপনাদের আমাদিগে নিয়েই?

অনিরুদ্ধ বলিল—তা আমরা আঁচ করেছিলাম। তা বেশ, কি কথা আপনাদের বলুন। আমাদের জবাব আমরা দোব। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন—আপনারা সবাই যখন একজোট হয়েছেন, তখন এ কথার বিচার করবে কে? নালিশ যখন আপনাদের, তখন আপনারা বিচার কি ক'রে করবেন—এতো আমরা বুঝতে পারছি না।

দ্বারকা চৌধুরী অকস্মাৎ গলা ঝাড়িয়া শব্দ করিয়া উঠিল; চৌধুরীর কথা বলিবার এটি পূর্ব্বাভাস। উচ্চ গলা-ঝাড়ার শব্দে সকলে চৌধুরীর দিকে চাহিল। চৌধুরীর চেহারায় এবং ভঙ্গিমাতে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। গৌরবর্ণ রং, পাকা ধবধবে গোঁফ, আসরের মধ্যে মানুষটি বিশিষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল। চৌধুরী এবার মুখ খুলিল—দেখ কর্ম্মকার, কিছু মনে ক'র না বাপু, আমি একটা কথা বলব। গোড়া থেকেই তোমাদের কথাবার্ত্তার সুর শুনে মনে হচ্ছে যেন তোমরা বিবাদ করবার জন্যে তৈরী হয়ে এসেছ। এটা তো ভাল নয় বাবা। ব'স, স্থির হয়ে ব'স।

অনিরুদ্ধ এবার সবিনয়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল—বেশ, বলুন কি বলছেন।

হরিশ মণ্ডলই আরম্ভ করিল—দেখ বাপু, খুলে বলতে গেলে মহাভারত বলতে হয়। সংক্ষেপেই বলছি—তোমরা দু'জনে সহরে গিয়ে আপন আপন ব্যবসা করতে বসেছ। বেশ করেছ। যেখানে

মানুষ দুটো পয়সা পাবে, সেইখানেই যাবে। তা যাও। কিন্তু এখানকার পাট যে একেবারে তুলে দেবে, আর আমরা যে এই দু' কোশ রাস্তা জিনিসপত্র ঘাড়ে ক'রে নিয়ে ছুটব ওই নদী পার হয়ে, তা তো হবে না বাবু। এবার যে তোমরা কি নাকাল করেছ আমাদের—ভেবে দেখ দেখি মনে মনে।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, তা অসুবিধে একটুকুন্ হয়েছে আপনাদের।

ছিরু বা শ্রীহরি গর্জ্জিয়া উঠিল—একটুকুন্? একটুকুন্ কি হে? জান, জমিতে জল থাকতে ফাল পাঁজানোর অভাবে চাষ বন্ধ রাখতে হয়েছে? তোমারও তো জমি আছে, জমির মাথায় একবার ঘুরে দেখে এস দেখি পটুপটি ঘাসের ধুমটা! ভাল ফালের অভাবে চাষের সময় একটা পটুপটিরও শেকড় ওঠে নাই। বছর-সাল তোমরা ধানের সময় ধানের জন্যে বস্তা হাতে ক'রে এসে দাঁড়াবে; আর কাজের সময় তখন সহরে গিয়ে ব'সে থাকবে,—তা কর্লে হবে কেন?

হরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়া উঠিল—এই কথা!

মজলিস-সুদ্ধ সকলেই প্রায় সমস্বরে বলিল—এই।

প্রবীণেরাও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

অনিরুদ্ধ এবার খুব সপ্রতিভ ভঙ্গিতে নড়িয়া-চড়িয়া জাঁকিয়া বসিয়া বলিল—এই তো আপনাদের কথা? আচ্ছা, এইবার আমাদের জবাব শুনুন। আপনাদের ফাল পাঁজিয়ে দিই, হাল লাগিয়ে দিই চাকায়, কাস্তে গ'ড়ে দিই, পাঁজিয়ে দিই, আপনারা আমাকে ধান দেন হাল-পিছু কাঁচি পাঁচ শলি। আমাদের গিরীশ সূত্রধর—

বাধা দিয়া ছিরু পাল বলিল—গিরীশের কথায় তোমার কাজ কি বাপু?

কিন্তু ছিরু কথা শেষ করিতে পারিল না; দ্বারকা চৌধুরী বলিল—বাবা শ্রীহরি, অনিরুদ্ধ তো অন্যায় কিছু বলে নাই। ওদের দুজনের একই কথা। একজনা বললেও তো ক্ষতি নাই কিছু।

ছিরু চুপ করিয়া গেল। অনিরুদ্ধ ভরসা পাইয়া বলিল—চৌধুরী মশায় না থাকলে কি মজলিসের শোভা হয়,—উচিত কথা বলে কে?

—বল অনিরুদ্ধ কি বল্‌ছিলে, বল!

—আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমার, মানে কর্ম্মকারের হাল-পিছু পাঁচ শলি, আর সূত্রধরের হাল-পিছু চার শলি ক'রে ধান বরাদ্দ আছে। আমরা এতদিন কাজও ক'রে এসেছি; কিন্তু চৌধুরী মশায়, ধান আমরা হিসেব-মত প্রায়ই পাই না।

—পাও না?

—আজ্ঞে না।

গিরীশও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল—আজ্ঞে না। প্রায় ঘরেই দু' আড়ি চার ক'রে বাকী রাখে, বলে দু দিন পরে দোব, কি আসছে বছর দোব। তারপর সে ধান আমরা পাই না।

ছিরু সাপের মত গর্জ্জিয়া উঠিল—পাও না? কে দেয় নি শুনি? মুখে পাই না বললে তো হবে না। বল, কার কাছে পাবে তোমরা?

অনিরুদ্ধ দুরন্ত ক্রোধে বিদ্যুৎগতিতে ঘাড় ফিরাইয়া শ্রীহরির দিকে চাহিয়া বলিল—কার কাছে পাব? নাম করতে হবে? বেশ, তোমার কাছেই পাব।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ, তোমার কাছে। দিয়েছ ধান তুমি দু' বছর?

—আর আমি যে তোমার কাছে হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাব।

তাতে ক'টাকা উশুল দিয়েছ শুনি? ধান দিই নাই মজলিসের মধ্যে তুমি যে এত বড় কথাটা বলছ।

—কিন্তু তার তো একটা হিসেব-নিকেশ আছে? ধানের দামটা তোমার হ্যাণ্ডনোটের পিঠে উশুল দিতে তো হবে—না কি? বলুন মশায়, মণ্ডল মশাইরাও তো রয়েছেন, বলুন-না।

বলিল—শোন, চুপ কর একটু। শ্রীহরি, তুমি বাবা—হ্যাণ্ডনোটের পিঠে টাকাটা উশুল দিয়ে নিয়ো। আর অনিরুদ্ধ, তোমরা একটা বাকীর ফর্দ্দ তুলে, হরিশ মণ্ডল মশায়কে দাও। এ নিয়ে মজলিসে গোল করাটা তো ভাল নয়। ওঁরাই সব আদায় পত্র ক'রে দেবেন। আর তোমরাও গাঁয়ে একটা ক'রে পাট রাখ। যেমন কাজকর্ম্ম করেছিলে তেমনি কর।

মজলিস-সুদ্ধ সকলেই এ কথায় সায় দিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ এবং গিরীশ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে-ভঙ্গিতেও সম্মতি বা অসম্মতির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না।

এতক্ষণে দেবনাথ মুখ খুলিল; প্রবীণ চৌধুরীর এ মীমাংসা তাহার ভাল লাগিয়াছে। অনিরুদ্ধ গিরীশের পাওনা অনাদায়ের কথা সে জানিত বলিয়াই তাহার প্রথমে মনে হইয়াছিল—অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের উপর মজলিস অবিচার করিতেছে। নতুবা গ্রামের সমাজ-শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার সে পক্ষপাতী। বিশেষ করিয়া ছিরুর মত লোকের অন্যায়ের বিচার করিয়া যে ব্যবস্থা চৌধুরী করিল, তাহাতে দেবু খুসী হইল; অনিরুদ্ধ ও গিরীশের এবার নত হওয়া উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে বলিল—অনি ভাই, আর তো তোমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।

চৌধুরী প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ?

—আজ্ঞে!

—কি বলছ বল ?

এবার হাত জোড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, আমাদিগে মাপ করুন আপনারা। আমরা আর পারছি না।

মজলিসে এবার অসন্তোষের কলরব উঠিয়া গেল।

—কেন ?

—না পারবার কারণ ?

—পারব না বললে হবে কেন ?

—চালাকি নাকি ?

—গাঁয়ে বাস কর না তুমি ?

চৌধুরী দীর্ঘ হাতখানি তুলিয়া ইঙ্গিত প্রকাশ করিল—চুপ কর, থাম।

হরিশ বিরক্তিভরে বলিল—থাম্ রে বাপু ছোঁড়ারা ; আমরা এখনও মরি নাই।

হরেন্দ্র ঘোষাল অল্পবয়সী ছোকরা এবং ম্যাটিক পাশ,—প্রচণ্ড একটা চীৎকার করিয়া উঠিল—এইও ! সাইলেন্স—সাইলেন্স !

অবশেষে দ্বারকা চৌধুরী উঠিয়া দাঁড়াইল। এবার ফল হইল। চৌধুরী বলিল—চীৎকার ক'রে গোলমাল বাধিয়ে তো ফল হবে না। বেশ তো, কর্ম্মকার কেন পারবে না—বলুক। বলতে দাওনা ওকে।

সকলে এবার নীরব হইল। চৌধুরী আবার বসিয়া বলিল—কর্ম্মকার, পারবে না বললে তো হবে না বাবা। কেন পারবে না, বল। তোমরা পুরুষানুক্রমে ক'রে আসছ। আজ পারব না বললে গ্রামের ব্যবস্থাটা কি হবে ?

দেবনাথ বলিল—অন্যায়, অনিরুদ্ধ ও গিরীশের মহা অন্যায়।

হরিশ বলিল—তোমার পূর্ব্বপুরুষের বাস হ'ল গিয়ে মহাগ্রামে ; এ গ্রামে কামার ছিল না বলেই তোমার পিতামহকে এনে বাস

করানো হয়েছিল। সে তো তুমিও শুনেছ হে বাপু। এখন না বললে চলবে কেন।

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, মোড়ল জ্যাঠা, তা হ'লে শুনুন্। চৌধুরী মশায়, আপনি বিচার করুন। এ গাঁয়ে আগে কত হাল ছিল ভেবে দেখুন। কত ঘরের হাল উঠে গিয়েছে তা দেখুন। এই ধরুন গদাই, শ্রীনিবাস, মহেন্দ্র। আমি হিসেব করে দেখছি—আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কণার ভদ্রলোকেদের ঘরে। কঙ্কণায় কামার আলাদা। আমাদের এগারোখানা হালের ধান কমে গিয়েছে। তারপরে ধরুন—আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙলের—গাড়ীর; অন্য সময়ে গাঁয়ের ঘর-দোর হ'ত। আমরা পেরেক-গজাল-হাতা-খুন্তি গড়ে দিতাম—বঁটি-কোদাল কুড়ুল গড়তাম,—গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোকে সে সব কিনছেন বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—তাই কিনছেন। আমাদের গিরীশ গাড়ী গড়ত, দরজা তৈরী করত; ঘরের চালকাঠামো করতে গিরীশকেই ডাকত। এখন অন্য জায়গা থেকে সস্তায় মিস্ত্রী এনে কাজ হচ্ছে। তারপর ধরুন—ধানের দর পাঁচ সিকে—দেড় টাকা, আর অন্য জিনিসপত্র আক্রা। এতে আমাদের এই নিয়ে চুপচাপ প'ড়ে থাকলে কি ক'রে চলে বলুন? ঘর সংসার তার যখন করছি—তখন ঘরের লোকের মুখে তো দুটো দিতে হবে। ওপর ধরুন, আজকালকার হাল-চাল সে রকম নেই—

ছিরু এতক্ষণ ধরিয়া মনে মনে ফুলিতেছিল, সে সুযোগ পাইয়া বাধা দিয়া কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল—তা বটে, আজকাল বার্ণিশ-করা জুতো চাই, লম্বা লম্বা জামা চাই, সিগারেট চাই—পরিবারদের শেমিজ চাই, বডিস্ চাই—

—এই দেখ ছিরু মোড়ল, তুমি একটু হিসেব করে কথা বলবে।....অনিরুদ্ধ এবার কঠিন স্বরে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

ছিরু বারকতক হেলিয়া-দুলিয়া বলিয়া উঠিল, হিসেব আমার করাই আছে রে। পঁচিশ টাকা ন আনা তিন পয়সা। অসল দশ টাকা, সুদ পনের টাকা ন আনা তিন পয়সা। তুই বরং কষে দেখতে পারিস। শুভঙ্করী জানিস তো?

হিসাবটা অনিরুদ্ধের নিকট পাওনা হ্যাণ্ডনোটের হিসাব। অনিরুদ্ধ কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল—সমস্ত মজলিসের দিকে একবার সে চাহিয়া দেখিল। সমস্ত মজলিসটাও এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। অনিরুদ্ধ মজলিস হইতে উঠিয়া পড়িল।

ছিরু ধমক দিয়া উঠিল—যাবে কোথা হে তুমি?

অনিরুদ্ধ গ্রাহ্য করিল না, সে চলিয়া গেল।

চৌধুরী এতক্ষণে বলিল—শ্রীহরি!

ছিরু বলিল—আমাকে চোখ রাঙাবেন না চৌধুরী মশায়। দু'তিন-বার আপনি আমাকে থামিয়ে দিয়েছেন, আমি সহ্য করেছি। আর কিন্তু আমি সহ্য করব না।

চৌধুরী এবার চাদরখানি ঘাড়ে ফেলিয়া বাঁশের লাঠিটি লইয়া উঠিল; বলিল—চললাম গো তা হ'লে। ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম—আপনাদিগে নমস্কার।

এই সময়ে গ্রামের পাতুলাল মুচি জোড়হাত করিয়া আগাইয়া আসিয়া বলিল—চৌধুরীমশায়, আমার একটুকুন্ বিচার ক'রে দিতে হবে।

চৌধুরী সন্তর্পণে মজলিস হইতে বাহির হইবার করিয়া বলিল—বল বাবা, এঁরা সব রয়েছেন, বল!

—চৌধুরী মশায় !

চৌধুরী এবার চাহিয়া দেখিল—অনিরুদ্ধ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

—একবার বসতে হবে চৌধুরী মশায় ! ছিরু পালের টাকাটা আমি এনেছি—আপনারা থেকে কিন্তু আমার হাণ্ডনোটটা ফেরতের ব্যবস্থা ক'রে দিন।

মজলিস-সুদ্ধ লোক এতক্ষণে সচেতন হইয়া চৌধুরীকে ধরিয়া বসিল ; কিন্তু চৌধুরী কিছুতেই নিরস্ত হইল না, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

অনিরুদ্ধ পঁচিশ টাকা দশ আনা মজলিসের সম্মুখে রাখিয়া বলিল—এখনি হাণ্ডনোটখানা নিয়ে এস ছিরু পাল।...

পরে হাণ্ডনোটখানি ফেরৎ লইয়া বলিল—ও একটা পয়সা আমাকে আর ফেরৎ দিতে হবে না! পান কিনে খেয়ো। এস হে গিরীশ, এস।

হরিশ বলিল—ওই, তোমরা চললে যে হে? যার জন্যে মজলিস বসল—

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা আর ও কাজ করব না মশায়, জবাব দিলাম। আর যে মজলিস ছিরু মোড়লকে শাসন করতে পারে না, তাকে আমরা মানি না।

তাহারা হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। মজলিস ভাঙিয়া গেল।....

পরদিন প্রাতেই শোনা গেল, অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুড়ির আধ-পাকা ধান কে বা কাহারা নিঃশেষে কাটিয়া তুলিয়া লইয়াছে।

দুই

অনিরুদ্ধ ফসলশূন্য ক্ষেত্রখানার আইলের উপর স্থিরদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দেখিল। নিষ্ফল আক্রোশে তাহার লোহা-পেটা হাত দু'খানা মুঠা বাঁধিয়া ভাইস-যন্ত্রের মত কঠোর করিয়া তুলিল। অত্যন্ত দ্রুতপদে সে বাড়ী ফিরিয়া হাতকাটা জামাটা টানিয়া সেটার মধ্যে মাথা গলাইতে গলাইতে বাহির-দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

অনিরুদ্ধের স্ত্রীর নাম পদ্মমণি—দীর্ঘাঙ্গী পরিপূর্ণ-যৌবনা কালো মেয়েটি; টিকালো নাক, টানা-টানা ভাসা-ভাসা ডাগর দুটি চোখ। পদ্মের রূপ না থাক্, শ্রী আছে। পদ্মের দেহে অদ্ভুত শক্তি, পরিশ্রম করে সে উদয়াস্ত। তেমনি তীক্ষ্ণ তাহার সাংসারিক বুদ্ধি। অনিরুদ্ধকে এইভাবে বাহির হইতে দেখিয়া সে স্বামী অপেক্ষাও দ্রুতপদে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—চল্‌লে কোথায় ?

রূঢ়দৃষ্টিতে চাহিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—ফিঙের মত পেছনে লাগ্‌লি কেন! যেখানেই যাই না, তোর সে খোঁজে কাজ কি ?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—পেছনে লাগি নাই। তার জন্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। আর, খোঁজে আমার দরকার আছে বৈ কি। মারামারি করতে যেতে পাবে না তুমি।

অনিরুদ্ধ বলিল—মারামারি করতে যাই নাই, থানা যাচ্ছি, পথ ছাড়্।

—থানা ?···পদ্মর কণ্ঠস্বরের মধ্যে উদ্বেগ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

—হ্যাঁ, থানা। শালা-ছিরে চাষার নামে আমি ডাইরি ক'রে আসব।....রাগে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর রণ-রণ করিতেছিল।

পদ্ম স্থিরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না। সত্যি হলেও ছিরু মোড়ল তোমার ধান চুরি করেছে—এ চাকলায় কে এ কথা বিশ্বাস করবে?

অনিরুদ্ধের কিন্তু তখন এমন পরামর্শ শুনিবার মত অবস্থা নয়, সে ঠেলিয়া পদ্মকে সরাইয়া দিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিল।

অনিরুদ্ধের অনুমান অভ্রান্ত,—ধান শ্রীহরি পালই কাটিয়া লইয়াছে।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিয়াছে সে-ও নিষ্ঠুরভাবে সত্য, ধনীকে চোর প্রতিপন্ন করা বড় সহজ নয়। শ্রীহরি ধনী।

এ চাকলায় কাছাকাছি তিনখানা গ্রাম—কালীপুর, শিবপুর ও কঙ্কণা—এ তিনখানা গ্রামে ছিরু পাল বা শ্রীহরি পালের ধনের খ্যাতি যথেষ্ট। কালীপুর ও শিবপুর সরকারী সেরেস্তার দু'খানা ভিন্ন গ্রাম—হিসাবে জমিদারের অধীন স্বতন্ত্র মৌজা হইলেও কার্যত একখানাই গ্রাম। একটা দীঘির এপার-ওপার মাত্র। শ্রীহরির বাস এই কালীপুরে। এ দুইখানা গ্রামের মধ্যে শ্রীহরির সমকক্ষ ব্যক্তি কেহ নাই। শিবপুরের হেলা চাটুজ্জেরও টাকা ও ধান যথেষ্ট; তবে লোকে বলে—শ্রীহরির ঘরে সোনার ইট আছে, টাকা ধানও প্রচুর।···ক্রোশখানেক দূরবর্তী কঙ্কণা অবশ্য সমৃদ্ধ গ্রাম। বহু সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস। সেখানকার মুখুজ্জেবাবুরা লক্ষ লক্ষ টাকার অধিকারী;—এ অঞ্চলের প্রায় গ্রামই এখন তাহাদের কুক্ষিগত। মহাজন হইতে তাহারা প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদার হইয়া উঠিতেছে; শিবপুর কালীপুর গ্রাম দু'খানাও ধীরে ধীরে তাহাদের গ্রাসের আকর্ষণে সর্পিল জিহ্বার দিকে আগাইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু সেখানেও শ্রীহরি পালের নামডাক আছে। ময়ূরাক্ষীর ওপারে আধা সহর—রেলওয়ে জংশন; সেখানেও বহু ধনী মাড়োয়ারীর গদী আছে—দশ-বারটা চালের-কল, গোটা দুয়েক তেল-কল, একটা আটার কল আছে;—সেখানে শ্রীহরি পালকে 'ঘোষ মশায়' বলিয়াই সম্বর্দ্ধিত করা হয়। ওই জংশন-সহরেই এ অঞ্চলের থানা অবস্থিত।

পদ্মের অনুমান মিথ্যা নয়,—কঙ্কণায় অথবা জংশন-সহরে কেহ এ কথা বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু শিব কালীপুরের কেহ এ কথা অবিশ্বাস করে না ছিরু ভয়ঙ্কর ব্যক্তি—এ সংসারে তাহার অসাধ্য কিছু নাই! এ ধান কাটিয়া লওয়া তাহার অনিরুদ্ধের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই নয়—চুরিও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য; এ কথা শিবকালীপুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিশ্বাস করে। কিন্তু সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস কাহারও নাই।

শ্রীহরির বিশাল দেহ;—স্থূল নয়, একবিন্দু মেদশৈথিল্য নাই। বাঁশের মত মোটা হাত-পায়ের হাড়—তাহার উপর কঠিন পেশী। প্রকাণ্ড চওড়া দু'খানা পাঞ্জা, প্রকাণ্ড বড় মাথা, বড় বড় চোখ, আকর্ণ-বিস্তার মুখগহ্বর, কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। এত বড় দেহ লইয়া সে কিন্তু নিঃশব্দপদসঞ্চারে দ্রুত চলিতে পারে। পরের ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া সে রাতারাতি আনিয়া আপনার পুকুরে ফেলিয়া রাখে, শব্দ নিবারণের জন্য সে হাত-করাত দিয়া বাঁশ কাটে। খেপলা জাল ফেলিয়া রাত্রে সে পরের পুকুরের পোনামাছ আনিয়া নিজের পুকুর বোঝাই করে; প্রতিবৎসর তাহার বাড়ীর পাঁচিল সে নিজেই বর্ষার সময় কোদাল চালাইয়া ফেলিয়া দেয়, নূতন পাঁচিল দিবার সময় অপরের সীমানা অথবা রাস্তা খানিকটা চাপাইয়া লয়। কেহ প্রতিবাদ বড় করে না; কিন্তু ব্যক্তিগত

সীমানা আত্মসাৎ করিলে প্রতিবাদ না করিয়া উপায় থাকে না। তখন ছিরু কোদাল হাতেই উঠিয়া দাঁড়ায়; দন্তহীন মুখে কি বলে বুঝা যায় না, মনে হয় একটা পশু গর্জ্জন করিতেছে। এই চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সেই সে দন্তহীন; যৌনব্যাধির আক্রমণে তাহার দাঁতগুলা প্রায় সব পড়িয়া গিয়াছে। হরিজন-পল্লীতে সন্ধ্যার পর যখন পুরুষেরা মদে বিভোর হইয়া থাকে, তখন ছিরু নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে শিকার ধরিতে প্রবেশ করে। কতবার তাহারা উহাকে তাড়া করিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে;—কিন্তু ছিরু ছুটিয়া চলে অন্ধকারচারী হিংস্র শ্বাপদের মত।

এই শ্রীহরি ঘোষ, ওরফে ছিরুপাল বা ছিরে মোড়ল!

শ্রীহরিকে ভাল করিয়া চিনিয়াও অনিরুদ্ধ স্ত্রীর কথা বিবেচনা করা দূরে থাক তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া, বাড়ী হইতে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। পদ্ম বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে রাগ বা অভিমান করিল না,—আবার ডাকিল—ওগো, শোন—শোন, ফেরো।...

অতি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া পদ্ম এবার বলিল—পেছন ডাকছি, শোন!

অনিরুদ্ধ লাঙ্গুলস্পৃষ্ট কেউটের মত এবার সরোষে ফিরিল।

পদ্ম হাসিয়া বলিল—একটু জল খেয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া আসিয়া পদ্মের গালে সজোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—ডাকৃবি আর পেছন?

পদ্মের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল; অনিরুদ্ধের লোহাপেটা হাতের চড়—সে বড় নিদারুণ আঘাত। পদ্ম 'বাবা রে বলিয়া হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ এবার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয়ও হইল। যেখানে-সেখানে চড় মারিলে নাকি মানুষ মরিয়া যায়; সে ত্রস্ত হইয়া ডাকিল—পদ্ম! পদ্ম! বউ!

পদ্মের শরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে—সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—এই নে বাপু, এই নে—জামা খুললাম, থানায় যাব না। ওঠ্! কাঁদিস না, ও পদ্ম।....সে পদ্মের মুখ-ঢাকা হাতখানি ধরিয়া টানিল—ও পদ্ম!....পদ্ম এবার মুখ হইতে হাত ছাড়িয়া দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; মুখ ঢাকা দিয়া পদ্ম কাঁদে নাই, নিঃশব্দে হাসিতেছিল। অদ্ভুত শক্তি পদ্মের, আর অনিরুদ্ধের অনেক কিল-চড় খাওয়া তাহার অভ্যাস আছে—এক চড়ে কি হইবে!

কিন্তু অনিরুদ্ধের পৌরুষে বোধ হয় ঘা লাগিল—সে গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। পদ্ম খানিকটা গুড় আর প্রকাণ্ড একটা বাটিতে একবাটি মুড়ি ও টুকুনি-ঘটির একঘটি জল আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—তুমি যে ছিরু মোড়লকে সুবে ক'রে এজাহার করবে, গাঁয়ের লোক কে তোমার হয়ে সাক্ষী দেবে বল তো? কাল থেকে তো গাঁয়ের লোক সবাই তোমার ওপর বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাল সন্ধ্যার পর আবার মজলিস বসিয়াছিল, অনিরুদ্ধের ওই 'মজলিসকে মানি না' কথাটা সকলকে বড় আঘাত দিয়াছে। অনিরুদ্ধ এবং গিরীশের বিরুদ্ধে জমিদারের কাছে নালিশ জানানো স্থির হইয়া গিয়াছে।

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে পড়িল, কিন্তু তবু তাহার মন মানিল না।
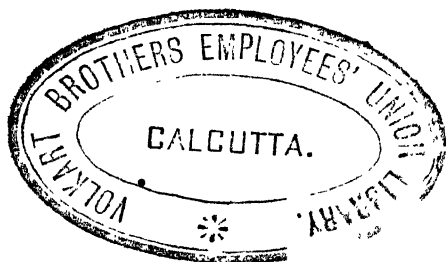
তিন

বেশ পরিপাটি করিয়া এক ছিলিম তামাক সাজিয়া হুঁকার জল ফিরাইয়া পদ্ম স্বামীর আহার-শেষের প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনিরুদ্ধের খাওয়া শেষ হইতেই হাতে জল তুলিয়া দিয়া হুঁকাটি তাহার হাতে দিয়া বলিল—খাও।....অনিরুদ্ধ টানিয়া বেশ গল্-গল্ করিয়া যখন নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়াছে, তখন পদ্ম বলিল—আমার কথাটা ভেবে দেখ। রাগ এখন একটু পড়েছে তো!

—রাগ?...অনিরুদ্ধ মুখ তুলিয়া চাহিল—ঠোঁট দুইটা তাহার থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।....এ রাগ আমার তুষের আগুন, জনমে নিবে না। আমার দু-বিঘে বাকুড়ির ধান—

কথা সে শেষ করিতে পারিল না। পদ্মের ডাগর চোখ দুটিও তখন নিরুদ্ধ অশ্রুতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—মুহূর্তে ফোঁটা কয়েক জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অনিরুদ্ধ এবার বলিল—কাঁদ্‌ছিস কেন তুই? দু'বিঘে জমির ধান গিয়াছে যাকগে। আমি তো আছিরে বাপু! আর দেখ্ না—কি করি আমি!

চোখ মুছিতে মুছিতে পদ্ম বলিল—কিন্তু থানা-পুলিশ ক'র না বাপু! তোমার দু-টি পায়ে পড়ি আমি। ওরা সাপ হয়ে দংশায়, রোজা হয়ে ঝাড়ে। আমার বাপের ঘরে ডাকাতি হ'ল—বাবা চিনলে একজনকে, কিন্তু পুলিশ তার গায়ে হাত দিলে না। অথচ মুঠো-মুঠো টাকা খরচ হয়ে গেল বাবার। মেয়েছেলে গুষ্টি সমেত নিয়ে টানাটানি; একবার দারোগা আসে, একবার নেস্‌পেকটার আসে, একবার সায়েব আসে—আর দাও এজাহার। তার পরে, ক'জনাকে

কোথা হতে ধরলে, তাদিগে সনাক্ত করতে জেলখানা পর্য্যন্ত মেয়েছেলে নিয়ে টানাটানি। তা ছাড়া গালমন্দ আর ধমক ত আছেই।

—হুঁ।....চিন্তিতভাবে হুঁকায় গোটা কয়েক টান দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল,—কিন্তু এর একটা বিহিত করতে তো হবে। আজ না হয় দু-বিঘে জমির ধান গেল। কাল আবার পুকুরের মাছ ধ'রে নেবে—পরশু ঘরে—

—অনি ভাই রয়েছ নাকি?....অনিরুদ্ধের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাহির হইতে গিরীশ ডাকিয়া সাড়া দিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পদ্ম আধ-ঘোমটা টানিয়া, এঁটো বাসন কয়খানি তুলিয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দু-বিঘে বাকুড়ির ধান একেবারে শেষ ক'রে কেটে নিয়েছে, একটি শীষ প'ড়ে নাই।

গিরীশও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—শুনলাম।

—থানায় ডায়রি করব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু বউ বারণ করছে। বলছে ছিরু পাল চুরি করেছে—এ কথা বিশ্বাস করবে কেন! আর গাঁয়ের লোকও তো আমার হয়ে কেউ সাক্ষী দেবে না

—হ্যাঁ; কাল সন্ধ্যেতে আবার নাকি চণ্ডীমণ্ডপে জটলা হয়েছিল! আমরা নাকি অপমান করেছি গাঁয়ে লোকদের। জমিদারের কাছে নালিশ করবে শুনছি।

ঠোঁটের একদিক বাঁকাইয়া অনিরুদ্ধ এবার বলিয়া উঠিল—যা-যা, জমিদার! জমিদার আমার কচু করবে!

কথাটা গিরীশের খুব মনঃপূত হইল না, সে বলিল—তাই বলার বা আমাদের দরকার কি? জমিদারেরও তো বিচার আছে, তিনিই বিচার করুন না কেন!

অনিরুদ্ধ বারবার ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—উঁহু

ছাই বিচার করবে। জমিদার নিজেই আজ তিন বছর ধান দেয় নাই। জমিদার ঠিক ওদের রায়ে রায় দেবে; তুমি জান না।

বিষণ্ণভাবে গিরীশ বলিল—আমি পাই নাই চার বছর।

অনিরুদ্ধ বলিল—এই দেখ ভাই, যখন বলেছি মুখ ফুটে—করব না, তখন আমার মরা-বাবা এলেও আমাকে করাতে পারবে না; তাতে আমার ভাগ্যে যাই থাক! তুমি ভাই এখনও বুঝে দেখ।

গিরীশ বলিল—সে তুমি নিশ্চিন্দি থাক। তুমি না মিটোলে আমি মি-টো-ব-না!

অনিরুদ্ধ প্রীত হইয়া কল্কেটি তাহার হাতে দিল। গিরীশ হাতের ছাঁদের মধ্যে কল্কেটি পুরিয়া কয়েক টান দিয়া বলিল—এদিকে গোলমালও তোমার চরম লেগে গিয়েছে। শুধু আমরা দু'জনা নাই, জমিদার ক'জনার বিচার করবে করুক না! নাপিত-বায়েন-দাই-চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ-আগলদার সবাই ধুয়ো ধরেছে—ও ধান নিয়ে কাজ আমরা করতে পারব না। তারা নাপিত তো আজই বাড়ীর দোরে অর্জ্জুনতলায় এক ইঁট পেতে বসেছে—বলে, পয়সা আন, এনে কামিয়ে যাও।

অনিরুদ্ধ কল্কেটি ঝাড়িয়া নূতন করিয়া তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—তাই বৈকি। পয়সা ফেল, মোওয়া খাও; আমি কি তোমার পর!

গিরীশের কথাবার্ত্তার মধ্যে বেশ একটি বিজ্ঞতা-প্রচারের ভঙ্গি থাকে, ইহা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে; সে বলিল—এই কথা। আগেকার কাল তোমার এক আলাদা কাল ছিল। সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল—তখন ধান নিয়ে কাজ ক'রে আমাদের পুষিয়েছে—আমরা করেছি; এখন যদি না পোষায়?

বাহিরে রাস্তায় ঠুন-ঠুন করিয়া বাইসাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে ডাক আসিল—অনিরুদ্ধ!

ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ।

অনিরুদ্ধ ও গিরীশ দুজনেই বাহির হইয়া আসিল। মোটাসোটা খাটো লোকটি, মাথায় বাবরি চুল—জগন্নাথ ঘোষ বাইসাইক্ল ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার কোথাও পড়িয়া-শুনিয়া পাশ করে নাই, চিকিৎসাবিদ্যা তাহাদের তিনপুরুষের বংশগত বিদ্যা; পিতামহ ছিলেন কবিরাজ, বাপ-জ্যেঠা ছিলেন কবিরাজ এবং ডাক্তার—একাধারে দুই। জগন্নাথ কেবলই ডাক্তার, তবে সঙ্গে দুই-চারিটা মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা দেয়—তাহাতে চট্ করিয়া ফলও হয় ভাল। গ্রামের সকল লোকই তাহাকে দেখায়, কিন্তু পয়সা বড় কেহ দেয় না। ডাক্তার তাহাতে খুব গররাজী নয়, ডাকিলেই যায়, বাকীর-উপরে বাকী দেয়। ভিন্ন গ্রামেও তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পসার আছে—সেখানকার রোজগারেই তাহার দিন চলে। কোনদিন শাক-ভাত, আবার কোনদিন যাহাকে বলে এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন; যেদিন যেমন রোজগার। এককালে ঘোষেরা সম্পত্তিশালী প্রতিষ্ঠাবান্ লোক ছিল। ধনীর গ্রাম কঙ্কণায় পর্য্যন্ত যথেষ্ট সম্মান-মর্য্যাদা পাইত; কিন্তু ওই কঙ্কণার লক্ষপতি মুখুজ্জেদের এক হাজার টাকা ঋণ ক্রমে চারি হাজারে পরিণত হইয়া ঘোষেদের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করিয়াছে। এই সম্পত্তি এবং সেকালের সম্মানিত প্রবীণগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সেই সম্মান-মর্য্যাদা চলিয়া গিয়াছে। জগন্নাথ অকাতরে চিকিৎসা এবং ঔষধ সাহায্য করিয়াও সে সম্মান ফিরিয়া পায় নাই। সে কাহাকেও রেয়াত করে না, রূঢ়তম ভাষায় সে উচ্চকণ্ঠে বলে—চোরের দল সব, জানোয়ার।...গোপনে নয়, সাক্ষাতেই বলে। তাহাদের ক্ষুদ্রতম অন্যায়েরও অতি কঠিন প্রতিবাদ সে করিয়া থাকে।

অনিরুদ্ধ ও গিরীশ বাহির হইয়া আসিতেই ডাক্তার বিনা ভূমিকায় বলিল—থানায় ডায়রি করলি ?

অনিরুদ্ধ বলিল—আজ্ঞে, তাই—

—তাই আবার কিসের রে বাপু ? যা, ডায়রি ক'রে আয় !

—আজ্ঞে বারণ করছে সব ; বলছে—ছিরু পাল চুরি করেছে—কে একথা বিশ্বাস করবে ?

—কেন ? ও বেটার টাকা আছে ব'লে ?

—তাই তো সাত-পাঁচ ভাবছি ডাক্তারবাবু।

বিদ্রূপতীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া জগন্নাথ বলিল—তা হ'লে এ সংসারে যাদের টাকা আছে তারাই সাধু—আর গরীব মাত্রেই অসাধু কেমন ? কে বলেছে এ কথা ?

অনিরুদ্ধ এবার চুপ করিয়া রহিল। বাড়ীর ভিতরে বাসনের টুংটাং শব্দ উঠিতেছে। পদ্ম ফিরিয়াছে, সব শুনিতেছে। উত্তর দিল গিরীশ, বলিল—আজ্ঞে, ডায়রি ক'রেই বা কি হবে ডাক্তার-বাবু, ও এখুনি টাকা দিয়ে দারোগার মুখ বন্ধ করবে। তা ছাড়া থানার জমাদারের সঙ্গে ছিরুর বেশ ভাব। একসঙ্গে মদ-ভাং খায়,—তারপর—

ডাক্তার বলিল—জানি আমি। কিন্তু দারোগা টাকা খেলে—তারও উপায় আছে। বাবারও বাবা আছে। দারোগা টাকা খায়—পুলিশ-সায়েব আছে, ম্যাজিষ্ট্রেট আছে। তার ওপরে কমিশনার আছে। তার ওপরে ছোটলাট, ছোটলাটের ওপরে বড়লাট আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তা তো বুঝলাম ডাক্তারবাবু, কিন্তু মেয়েছেলেকে এজাহার ফেজাহার দিতে হবে, সেই হাঙ্গামার কথা আমি ভাবছি।

—মেয়েদের এজাহার ? ডাক্তার আশ্চর্য্য হইয়া গেল। মাঠে

ধান চুরি হয়েছে, তাতে মেয়েছেলেকে এজাহার দিতে হবে কেন? কে বললে? এ কি মগের মুলুক নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধ উঠিয়া পড়িল।—তা হ'লে আমি আজ্ঞে এই এখুনি চললাম।

ডাক্তারও বাইসাইক্লে উঠিয়া বলিল—যা, তুই নির্ভাবনায় চলে যা। আমি ও-বেলা যাব। চুরি করবার জন্যে ধান কেটে নিয়েছে—এ কথা বলবি না; বললি—আক্রোষ বশে আমার ক্ষতি করবার জন্যে চুরি করেছে!

অনিরুদ্ধ আর বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল না পর্যন্ত, পাছে পদ্ম আবার বাধা দেয়। সে ডাক্তারের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে আরম্ভ করিল; গিরীশকে বলিল—গিরীশ, কামারশালের চাবিটা নিয়ে এস তো ভাই চেয়ে।

ও-পারের জংশনের কামারশালার চাবি। গিরীশকে ভিতরে ঢুকিয়া চাহিতে হইল না, দরজার আড়াল হইতে ঝনাৎ করিয়া চাবিটা আসিয়া তাহার সম্মুখে পড়িল। গিরীশ হেঁট হইয়া চাবিটা তুলিতেছিল—পদ্ম দরজার পাশ হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল—ডাক্তার ও অনিরুদ্ধ অনেকটা দূর চলিয়া গিয়াছে! সে এবার আধ-ঘোমটা টানিয়া সামনে আসিয়া বলিল—একবার ডাক' ওকে।

মুখ তুলিয়া একবার পদ্মের দিকে একবার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিয়া গিরীশ বলিল—পেছন ডাকলে ক্ষেপে যাবে।

—তা তো যাবে। কিন্তু ভাত? ভাত নিয়ে যাবে কে? আজ কি খেতে-দেতে হবে না?

গিরীশ ও অনিরুদ্ধ সকালে উঠিয়া ও-পারে যায়, তাহার পূর্বেই তাহাদের ভাত হইয়া থাকে—যাইবার সময় সেই ভাত তাহারা লইয়া যায়। সেই খাইয়াই তাহাদের দিনটা কাটে। রাত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া খায়। গিরীশ বলিল—আমাকেই দাও, আমিই নিয়ে যাই।

* * *

সংসারে পদ্ম একা মানুষ। বৎসর দুয়েক পূর্ব্বে শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর হইতেই সমস্ত দিনটা তাহাকে একলা কাটাইতে হয়। সে নিজে বন্ধ্যা। পল্লীগ্রামে এমন অবস্থায় একটি মনোহর কর্ম্মান্তর আছে —পাড়া বেড়ানো। কিন্তু পদ্মের স্বভাব যেন ঊর্ণনাভ-গৃহিণীর মত। সে সমস্ত দিন আপনার গৃহস্থালীর জাল বুনিয়াই চলিয়াছে। ধান-কলাই রৌদ্রে দিতেছে, সেগুলি তুলিতেছে, মাটি ও কুড়ানো ইঁট দিয়া ঘরে বেদী বাঁধিতেছে; ছাই-দিয়া-মাজিয়া-তোলা বাসনেরও ময়লা তুলিতেছে—শীতের লেপ-কাঁথাগুলি পাড়িয়া নতুন পাট করিতেছে। ইহা ছাড়া নিয়মিত কাজ—গোয়াল পরিষ্কার করা, জাব কাটা, ঘুঁটে দেওয়া, তিন-চারবার বাড়ী ঝাঁট দেওয়া তো আছেই।

আজ তাহার কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হইল না। সে খিড়কির ঘাটে গিয়া পা-ছড়াইয়া বসিল। অনিরুদ্ধকে থানায় যাইতে বারণ করিয়াছে, হাসিমুখে রহস্য করিয়া তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে—সে কেবল ভবিষ্যৎ অশান্তি নিবারণের জন্য। অন্য দিকে দু-বিঘা বাকুড়ির ধানের জন্যও তাহার দুঃখের সীমা ছিল না। আপন-মনেই সে মৃদুস্বরে ছিরু পালকে অভিসম্পাৎ দিতে সুরু করিল।

—কানা হবেন—কানা হবেন—অন্ধ হবেন তিনি;—হাতে কুষ্ঠ হবে, সর্ব্বস্ব যাবে—ভিক্ষে ক'রে ক'রে খাবেন।

সহসা কোথায় প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে মনে হইল। পদ্ম কান পাতিয়া শুনিল। গোলমালটা বায়েনপাড়ায় মনে হইতেছে। প্রচণ্ড রূঢ়কণ্ঠে অশ্লীল ভাষায় কে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে। ওই ছোঁয়াচটা যেন পদ্মকে লাগিয়া গেল। সেও এবার উচ্চকণ্ঠে পাড়া জানাইয়া শাপ শাপান্ত আরম্ভ করিল—

—জোড়া বেটা ধড়পড় করে মরবে, এক বিছানায় একসঙ্গে।

আমার জমির ধানের চালে কলেরা হবে। নির্ব্বংশ হবেন—নির্ব্বংশ হবেন; নিজে মরবেন না, কানা হবেন—দুটি চোখ যাবে, হাতে কুষ্ঠ হবে। যথা-সর্ব্বস্ব উড়ে যাবে—পুড়ে যাবে। পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াবে।

বেশ হিসাব করিয়া—ছিরু পালের সহিত মিলাইয়া সে শাপ-শাপান্ত করিতেছিল। সহসা তাহার নজরে পড়িল খিড়কির পুকুরের ওপারে রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া ছিরু পাল তাহার গালি-গালাজগুলি বেশ উপভোগ করিয়া হাসিতেছে। এইমাত্র ছিরু পাতু বায়েনকে মার-পিট করিয়া ফিরিতেছিল, বায়েনপাড়ার কলরবটা তাহারই বিক্রমোদ্ভূত। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের স্ত্রীর শাপ-শাপান্ত শুনিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। সে হাসির মধ্যে অন্য একটা ক্রূর প্রবৃত্তির প্রেরণা অথবা তাড়নাও ছিল। দেখিয়া পদ্ম উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ছিরু ভাবিতেছিল, লাফ দিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে না কি? কিন্তু দিবালোককে তাহার বড় ভয়। সে স্পন্দিতবক্ষে দ্বিধা করিতেছিল। সহসা পদ্মর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবার সে ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু একটা কিসের প্রতিবিম্বিত আলোকচ্ছটা তাহার চোখে আসিয়া পড়িতেই সে চোখ ফিরাইয়া লইল।

—ধার পরীক্ষে করতে এক-কোপে দুটো পাঁটা কেটে আমার কাজ বাড়িয়ে গেলেন বীরপুরুষ। রক্তের দাগ ধোয়া নাই—ঘরে তুলে রেখে দিয়েছেন। আমি এখন ব'সে ঝামা ঘসি আর কি।

পদ্মের হাতে একখানা বগি দা; রোদ পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। তাহারই ছটা আসিয়া চোখে পড়িতেই ছিরু পাল চোখ ফিরাইয়া লইল। পরক্ষণেই দুম্ দুম্ শব্দে পা ফেলিয়া আপনার বাড়ীর পথ ধরিল। পদ্মের মুখে নিষ্ঠুর কৌতুকের একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল।

চার

গ্রাম হইতে বাহির হইলেই বিস্তীর্ণ পঞ্চগ্রামের মাঠ, দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় মাইল—প্রস্থে চার মাইল; কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর ও দেখুড়িয়া এই পাঁচখানা গ্রামের সীমানার মাঠ। মাঠখানার দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী নদী। ময়ূরাক্ষীর তীরভূমিতে বিস্তীর্ণ এই মাঠখানার উর্ব্বরতা অদ্ভুত। ইহার মধ্যে আবার শিব-কালীপুরের সীমানার জমিই না কি উৎকৃষ্ট। এইটুকু অংশের নামই 'অমরকুণ্ডার মাঠ'। শিবপুরের জমির পরিমাণ এদিকে অতি অল্প; শিবপুরের সমস্ত জমি উত্তর দিকে। কালীপুরের চাষের মাঠ অধিকাংশই গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে। শিব-কালীপুর—নামেমাত্র দুইখানা গ্রাম; শিবপুর এবং কালীপুর, দুই গ্রামের বসতির মধ্যে কেবল একটা দীঘির ব্যবধান। কালীপুর গ্রামখানাই বড়, ওই গ্রামেই লোকসংখ্যা বেশী; শ্রীহরি দেবু প্রভৃতি সকলেরই বাস এখানে।

শিবপুর গ্রামখানি বহু পূর্ব্বে ছিল—ছোট একটি পাড়াবিশেষ; তখন অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় আশী-নব্বই বৎসর পূর্ব্বে সেখানে একশ্রেণীর বিচিত্র সম্প্রদায় বাস করিত; তাহারা নিজেদের বলিত 'দেবল-চাষী'। তাহারা নিজ হাতে চাষ করিত না, শিব-কালীপুরের বুড়া শিবের সেবাপূজার ভার ছিল তাহাদের উপরেই। এখন এই দেবল সম্প্রদায়ের আর কেহই নাই। অধিকাংশই মরিয়া-হাজিয়া যাইতেই ইহাদের অবশিষ্ট কয়েক ঘর এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ক্রোশ পাঁচেক দূরবর্ত্তী রক্ষেশ্বর গ্রামে এবং ক্রোশ আষ্টেক দূরবর্ত্তী জলেশ্বর গ্রামে—ওই নামীয় দুই শিবের সেবাইৎ-পাণ্ডা হিসাবে তাহাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠির সঙ্গে তাহারা বাস করিতেছে। শিব-ভক্ত দেবলদের বাস ছিল বলিয়াই পল্লীটার নাম ছিল শিবপুর।

দেবলেরা চলিয়া যাইবার পর কালীপুরের চৌধুরীরা গ্রামের জমিদারী স্বত্ব কিনিয়া, শিবপুরে আসিয়া বাস করে। জ্ঞাতি প্রজাদের সংস্রব এড়াইবার জন্যই তাহারা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। চৌধুরীরাই শিবপুরকে একটি স্বতন্ত্র মৌজায় পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবার শিবপুর স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে।

উত্তর পশ্চিমে যে গ্রামের মাঠ, সে গ্রামে নাকি লক্ষ্মী বসতি করেন না; গ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যে গ্রামের চাষের সীমানা—সেখানে নাকি লক্ষ্মীর অপার করুণা। অন্ততঃ প্রবীণেরা তাই বলে। মাঠ উত্তর ও পশ্চিমদিকে হইলে দেখা যায়—গ্রাম অপেক্ষা মাঠ উঁচু। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে ক্রমনিম্নতার একটা একটানা প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে। সেইজন্য দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে কৃষিক্ষেত্র হইলে—গ্রামের সমস্ত জলই গিয়া মাঠে পড়ে; গ্রাম-ধোয়া জলের উর্ব্বরতা প্রচুর। ইহা ছাড়াও গ্রামের পুকুরগুলির জলের সুবিধা ষোল-আনা পাওয়া যায়। এই কারণে শিবপুর এবং কালীপুর পাশাপাশি গ্রাম হইলেও দুই গ্রামের জমির গুণ ও মূল্যে অনেক প্রভেদ। এজন্য কালীপুরের লোকেরা অনেক অহঙ্কার শিবপুরের লোকে সহ্য করিয়া থাকে। শিবপুরের চৌধুরীরা এককালে তাহাদের জমিদার ছিল, তখন কালীপুরকে শিব-পুরের আধিপত্য সহ্য করিতে হইয়াছে; কালীপুরের বর্ত্তমান অহঙ্কার তাহারও একটা প্রতিক্রিয়া বটে।

দ্বারকা চৌধুরী সেই বংশোদ্ভূত। চৌধুরীদের সমৃদ্ধি অনেক দিনের কথা। দ্বারকা চৌধুরীর একপুরুষ পূর্ব্বে সম্মান সমৃদ্ধির ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়াছে। চৌধুরীর আভিজত্যের কোন ভাণও নাই; সে কথা এখন সে ভুলিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের চাষীদের সঙ্গে সে সমানভাবেই মেলামেশা করে; এক মজলিসে বসিয়া তামাক খায়—সুখ-দুঃখের গল্প করে। তবে চৌধুরীর কথাবার্ত্তার ধরণ ও সুরের মধ্যে

একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। চৌধুরী কথা বলে খুব কম, যেটুকু বলে—তাহাও অতি ধীর মৃদুস্বরে। কথার প্রতিবাদ করিলে চৌধুরী তাহার আর প্রতিবাদ করে না। কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদকারীর কথা সংক্ষেপে স্বীকার করিয়া লয়, কোন ক্ষেত্রে চুপ করিয়া যায়; কোন ক্ষেত্রে সেদিনকার মত মজলিস হইতে উঠিয়া আসে। মোট কথা, চৌধুরী শান্তভাবেই অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছে।...

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী সকালেই ছাতাটি মাথায়—বাঁশের লাঠিটি হাতে করিয়া কালীপুরের দক্ষিণ মাঠে নদীর ধারে রবি-ফসলের চাষের তদ্বিরে চলিয়াছিল। কালীপুরের জমিদারীর স্বত্ব চলিয়া গেলেও—সেখানে তাহার মোটা জোত এখনও আছে। কালীপুরের দক্ষিণেই 'অমরকুণ্ডার মাঠ'; এখানকার ফসল কখনও মরে না, এ মাঠের হাজা-সুকা নাই। মাঠটির মাথায় বেশ বিস্তৃত দুইটি ঝর্ণার জলা আছে; প্রশস্ত একটি অগভীর জলা হইতে নালা বাহিয়া অবিরাম জল বহিয়া চলিয়াছে; জলাটি কাণায় কাণায় অহরহই পরিপূর্ণ, জল কখনও শুকায় না। এই যুগ্ম-ধারাই অমরকুণ্ডার মাঠের উপর যেন ধরিত্রী-মাতার বক্ষক্ষরিত ক্ষীরধারা। নালা বাহিয়া জলাভাবের সময় নালায় বাঁধ দিয়া, যাহার যে দিকে প্রয়োজন জলস্রোতকে ঘুরাইয়া লইয়া যায়।

অগ্রহায়ণ পড়িতেই হৈমন্তী ধান পাকিতে সুরু করিয়াছে, সবুজ রঙ হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অমরকুণ্ডার মাঠের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে নদীর বাঁধের কোল পর্য্যন্ত সুপ্রচুর ধানের সবুজ ও হলুদ রঙের সমন্বয়ে অপূর্ব শোভা। ধানের প্রাচুর্য্যে মাঠের আল পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় না। কেবল ঝর্ণার দুই পাশের সুবিসর্পিল বাঁধের উপরের তালগাছগুলি আঁকাবাঁকা সারিতে ঊর্দ্ধলোকে

মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। হেমন্তের পীতাভ রৌদ্রে মাঠখানা ঝলমল করিতেছে। আকাশে আজও শরতের নীলের আমেজ রহিয়াছে; এখনও ধূলা উড়িতে আরম্ভ করে নাই। দূরে আবাদী মাঠের শেষপ্রান্তে নদীর বন্যারোধী বাঁধের উপর ঘন সবুজ শরবন—একটা সবুজ রঙের দীর্ঘ প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে; মাথায় চুণ-কাম-করা আলিসার মত চাপ বাঁধিয়া সাদা ফুলের সমৃদ্ধ সমারোহ।

কালীপুরের পশ্চিম দিকে—সম্ভ্রান্ত ধনীদের গ্রাম কঙ্কণা; গ্রামবন-রেখার উপরে সাদা-লাল-হলুদ রঙের দালানগুলির মাথা দেখা যাইতেছে। একেবারে ফাঁকা প্রান্তরে স্কুল—হাসপাতাল—বাবুদের থিয়েটারের ঘর আগাগোড়া পরিষ্কার দেখা যায়। বাবুরা হালে ঈশ্বরবৃত্তির প্রচলন করিয়াছেন টাকায় এক পয়সা; টাকা দিতে গেলেও দিতে হইবে—টাকা লইতে গেলেও দিতে হইবে। ঐ টাকায় পার্ব্বণ-উপলক্ষে যাত্রা-থিয়েটার হয়। চৌধুরী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—দীর্ঘনিঃশ্বাস। বৎসরে দেড় টাকা দুই টাকা করিয়া তাহাকে ঐ ঈশ্বরবৃত্তি দিতে হয়। অমরকুণ্ডার ক্ষেতে এখনও জল রহিয়াছে, জলের মধ্যে প্রচুর মাছ জন্মায়; আল কাটিয়া দিয়া মুখে ঝুড়ি পাতিয়া হাড়ী বাউড়ী ডোম ও বায়েনদের মেয়েরা মাছ ধরিতেছে। ক্ষেতের মধ্যেও অনেকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের দেখা যায় না—কেবল ঘন ধানগাছগুলি চিরিয়া একটা চলন্ত রেখা দেখা যায়, যেমন অগভীর জলের ভিতর মাছ চলিয়া গেলে জলের উপর একটা রেখা জাগিয়া ওঠে। অনেকে ঘাস কাটিতেছে; কাহারও গরু আছে—কেহ ঘাস বেচিয়া দুই-চার পয়সা রোজগার করে।

অমরকুণ্ডার মাঠের ঠিক মাঝামাঝি একটি প্রশস্ত আলের উপর দিয়া যাওয়া-আসার পথ। প্রশস্ত অর্থে একজন বেশ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, দুইজনে কষ্টে-সৃষ্টে চলিতে পারে। এই পথ ধরিয়া গ্রামের গরু

বাছুর নদীর ধারে চরিতে যায়। ধান খাইবে বলিয়া তখন তাহাদের মুখে একটি করিয়া দড়ির জাল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। প্রৌঢ় চৌধুরী একটু হতাশার হাসি হাসিল,—গরুগুলির মুখের জাল খুলিবার মত গো-চরও আর রহিল না।

বাঁধের ওপারে নদীর চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। চাষীদের অবশ্য আর উপায়ও ছিল না। অমরকুণ্ডার মাঠের অর্দ্ধেকের উপর জমি কঙ্কণার বিভিন্ন ভদ্রলোকের অধীনে চলিয়া গিয়াছে। অনেক চাষীর জমি আর একেবারেই নাই। তাঁহারাই প্রথম নদীর ধারে গো-চর ভাঙিয়া রবি ফসলের চাষ আরম্ভ করিয়াছিল। এখন দেখাদেখি সবাই আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য চরের জমি খুবই উর্ব্বরা। সারা বর্ষাটাই নদীর জলে ডুবিয়া থাকিয়া পলিতে পলিতে মাটি যেন সোনা হইয়া থাকে। সেই সোনা ফসলের কাণ্ড বাহিয়া শীষের মধ্যে ফলিয়া উঠে। গম-সরিষা প্রচুর হয়; সকলের চেয়ে ভাল হয় ছোলা। ওই চরটার নামই 'ছোলাকুঁড়ি' বা ছোলা-কুণ্ড। এখন অবশ্য আলুর চাষেরই রেওয়াজ বেশী। আলু প্রচুর হয় এবং খুব মোটাও হয়। নদীর ওপারের জংশনে আলুর বাজারও ভাল। কলিকাতা হইতে মহাজনেরা ওখানে আলু কিনিতে আসে। এ কয় মাসের জন্য তাহাদের এক একজন লোক আড়ত খুলিয়া বসিয়াই আছে—আলু লইয়া গেলেই নগদ টাকা! বড় চাষী যাহারা, তাহারা বিশ-পঞ্চাশ টাকা দাদনও পায়।

সকলের টানে চৌধুরীকেও গো-চর ভাঙিয়া আলু-গম-ছোলার চাষ করিতে হইতেছে। চারিপাশে ফসলের মধ্যে তাহার গো-চরে গরু চরানো চলে না; অবুঝ অবোলা পশু কখন যে ছুটিয়া গিয়া ফসলের উপর পড়িবে—সে কি বলা যায়! তাহার উপর অমরকুণ্ডার মাঠে দোয়েম জমিতে রবি ফসলের চাষও অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্কণার

ভদ্রলোকের জমি সব পড়িয়া থাকে, তাহারা রবি ফসলের হাঙ্গামা পোহাইতে চায় না; আর খইল-সারেও টাকা খরচ তাহারা করিবে না। কাজেই তাহাদের জমি ধান কাটার পর পড়িয়াই থাকে। অধিকাংশ জমি চাষ হইলে—সেখানে কতকটা জমি পতিত রাখিয়া গরু চরানো যেমন অসম্ভব, আবার অধিকাংশ জমি পতিত থাকিলে—সেখানে কতকটা জমি চাষ করাও তেমনি অসম্ভব। তবু ত গরু-ছাগলকে আগলাইয়া পারা যায়; কিন্তু মানুষ ও বানরকে পারা যায় না। খাইয়াই শেষ করিয়া দিবে। কালীপুরের দোয়েম—সোনার দোয়েম!....

কি কাল-যুদ্ধই না ইংরেজেরা করিল জার্মানদের সঙ্গে! সমস্ত একেবারে লণ্ড-ভণ্ড করিয়া দিল। দুঃখ দুর্দ্দশা সব কালেই আছে, কিন্তু যুদ্ধের পর এই কালটির মত আর কখনও হয় নাই। কাপড়ের জোড়া ছ-টাকা সাত-টাকা, ওষুধ অগ্নিমূল্য—মায় পেরেক ও সূচের দাম চার গুণ হইয়া গিয়াছে। ধান চালের দরও প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু কাপড়-চোপড়ের বাড়িয়াছে তিন গুণ! জমির দামও ডবল হইয়া গিয়াছে। দর পাইয়া হতভাগা মূর্খের দল জমিগুলা কঙ্কণার বাবুদের পেটে ভরিয়া দিল। আজ আপশোষ করিলে কি হইবে! মরুক, হত-ভাগারা মরুক! অঃ—সেই তেরোশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পঁচিশ সালে; আজ তেরশ উনত্রিশ সাল—আজও বাজারের আগুন নিবিল না। কঙ্কণার বাবুরা ধূলমুঠা সোনার দরে বেচিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনিতেছে, আর কালীপুরের জমি কিনিতেছে মোটা দামে। ধূলা বৈকি। মাটি কাটিয়া কয়লা ওঠে—সেই কয়লা বেচিয়া ত পয়সা। যে কয়লার মণ ছিল তিন আনা, চৌদ্দ পয়সা, সেই কয়লার দর কিনা চৌদ্দ আনা! গোদের উপর বিষ-ফোঁড়ার মত—এই বাজারে আবার পঞ্চায়েৎ বসাইয়া ট্যাক্স চড়াইয়া দিল।

ইউনিয়ন বোর্ড! বাবুরা সব পঞ্চায়েৎ সাজিয়া দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইয়া বসিল—আর তোমরা এখন দাও ট্যাক্স! ট্যাক্স আদায়ের ধূম কি? চৌকিদার দফাদার সঙ্গে লইয়া বাঁধানো খাতা বগলে ভুগাই মিশ্রি যেন একটা লাটসাহেব!...

সহসা চৌধুরী চকিত হইয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল। কে কোথায় তারস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে না? লাঠিটি বগলে পুরিয়া রৌদ্রনিবারণের ভঙ্গিতে ভ্রূর উপরে হাতের আড়াল দিয়া এপাশ ওপাশ দেখিয়া চৌধুরী পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল। হাঁ, পিছনেই বটে। ওই—গ্রামের কয়জন লোক আসিতেছে, উহাদের ভিতরেই কেহ কাঁদিতেছে—সে স্ত্রীলোক, তাহাকে দেখা যাইতেছে না, সামনের পুরুষটির আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। আ-হা-হা! পুরুষটা কেউটে সাপের মত ফিরিয়া মেয়েটার চুলের মুঠি ধরিয়া দুম-দাম করিয়া প্রহার আরম্ভ করিয়া দিল। চৌধুরী এখান হইতেই চীৎকার করিয়া বলিল—এই, এইঃ আ-হা-হা! ওই!

তাহারা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু স্ত্রীলোকটি চীৎকার বন্ধ করিল; পুরুষটাও তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। চৌধুরী কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া—আবার রওনা হইল। ছোটলোক কি সাধে বলে! লজ্জা-সরম, রীত-করণ উহাদের কখনও হইবে না। জানে না—স্ত্রীলোকের চুলে হাত দিলে শক্তি ক্ষয় হয়। রাবণ যে রাবণ, যাহার দশটা মুণ্ড, কুড়িটা হাত, এক লক্ষ ছেলে, একশ লক্ষ নাতি, সীতার চুলের মুঠি ধরিয়া সে একেবারে নির্ব্বংশ হইয়া গেল!

বাঁধের কাছাকাছি চৌধুরী পৌঁছিয়াছে—এমন সময় পিছনে পদশব্দ শুনিয়া চৌধুরী ফিরিয়া দেখিল, পাতু বায়েন হন্ হন্ করিয়া বুনো শূকরের মত গোঁভরে চলিয়া আসিতেছে। পিছনে কিছুদূরে

ধুপ্ ধুপ্ করিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে একটি স্ত্রীলোক। বোধ হয় পাতুর স্ত্রী। সে এখনও গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতেছে—আর মধ্যে মধ্যে চোখ মুছিতেছে। চৌধুরী একটু সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। পাতু যে গতিতে আসিতেছে, তাহাতে পথ ছাড়িয়া না দিলে উপায় নাই। উহার আগে আগে চলিবার শক্তি চৌধুরীর নাই। পাতু কিন্তু নিজেই পথ করিয়া লইল, সে পাশের জমিতে নামিয়া পড়িয়া ধানের মধ্য দিয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইল। সহসা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া চৌধুরীকে একটি প্রণাম করিয়া বলিল—দ্যাখেন চৌধুরী মশায়, দ্যাখেন।

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল। কপালে একটা সদ্য আঘাতচিহ্ন হইতে রক্ত ঝরিয়া মুখখানা রক্তাক্ত করিয়া দিয়াছে।

—ওগো, বাবুমশায় গো! খুন করলে গো!....সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

—এ্যা-ও!···পাতু গর্জ্জন করিয়া উঠিল।...আবার চেঁচাতে লাগলি মাগী?

সঙ্গে সঙ্গে পাতুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর নামিয়া গেল; সে গুন্ গুন্ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—গরীবের কি দশা করেছে দেখেন গো; আপনারা বিচার করেন গো।

পাতু পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিঠ দেখাইয়া বলিল—দেখেন, পিঠ দেখেন।...পাতুর পিঠে লম্বা দড়ির মত নির্ম্মম প্রহারচিহ্ন রক্তমুখী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। দাগ একটা দুইটা নয়—দাগে দাগে পিঠটা একেবারে ক্ষতবিক্ষত!

চৌধুরী অকপট মমতা ও সহানুভূতিতে বিচলিত হইয়া উঠিলেন, আবেগবিগলিত স্বরেই বলিলেন—আ-হা-হা। কে এমন কল্লে পাতু?

—আজ্ঞে, ওই ছিরু পাল। রাগে গন্ গন্ করিতে করিতে প্রশ্নের পূর্ব্বেই পাতু উত্তর দিল—কথা নাই, বার্ত্তা নাই, এসেই একগাছা দড়ির বাড়ীতে দেখেন কি ক'রে দিলে, দেখেন !....সে আবার পিছন ফিরিয়া ক্ষতবিক্ষত পিঠখানা চৌধুরীর চোখের সামনে ধরিল। তারপর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—দড়িখানা চেপে ধরলাম তো একগাছা বাখারীর ঘায়ে কপালটিকে একেবারে দিলে ফাটিয়ে।

ছিরু পাল, শ্রীহরি ঘোষ ?—অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। উঃ নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। চৌধুরীর চোখে অকস্মাৎ জল আসিয়া গেল। এক এক সময় অপরের দুঃখ-দুর্দ্দশায় মানুষ এমন বিচলিত হয় যে, তখন নিজের সকল সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া নির্য্যাতিতের দুঃখ যেন আপন দেহমন দিয়া প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে। চৌধুরী এমনই একটি অবস্থায় উপনীত হইয়া সজলচক্ষে পাতুর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার দন্তহীন মুখের শিথিল ঠোঁট দুইটি অত্যন্ত বিশ্রী ভঙ্গিতে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

পাতু বলিল—মোড়লদের ফি-জনার কাছে গেলাম। তা কেউ রা কাড়লে না। শক্তর সব দুয়ার মুক্ত !

পাতুর বউ অনুচ্চ কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলিতেছিল—ওই সর্ব্বনাশী কালামুখীর লেগে গো—

পাতু এক ধমক কষিয়া বলিল—এ্যাই—এ্যাই আবার ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে !

চৌধুরী একটু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—কেন অমন ক'রে মারলে ? কি এমন দোষ ক'রেছ তুমি যে—

অভিযোগ করিয়া পাতু কহিল—সেদিন চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে ব'লতে গেলাম—তা তো অপুনি শুনলেন না, চলে গেলেন। গোটা গেরামের লোকের 'আণ্ডোটজুতি' আমাকে সারা বছর যোগাতে হয় ;

অথচ আমি কিছুই পাই না! তা কর্ম্মকার যখন রব তুললে, আমিও বলেছিলাম যে, আমি আর 'আঙোটজুতি' যোগাতে লারব। কাল সন্ঝেতে পালের মুনিষ তাগাদায় এসেছিল—আমি ব'লেছিলাম—পয়সা আন গিয়ে। তা আমার বলা বটে! আজ সকালে উঠে এসেই কথা নাই বার্ত্তা নাই—আথালি-পাথালি দড়ি দিয়ে মার!

চৌধুরী চুপ করিয়া রহিলেন। পাতুর বউ বার বার ঘাড় নাড়িয়া মৃদু বিলাপের সুরে বলিল—না গো—বাবুমশায়—

পাতু তাহার কথা ঢাকিয়া দিয়া বলিল—আমার পেট চলে কি ক'রে—সেটা আপনারা বিচার কর'বেন না, আর এমুনি ক'রে মারবেন?

চৌধুরী কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—শ্রীহরি তোমাকে এমন ক'রে মেরেছে—মহা অন্যায় ক'রেছে, অপরাধ ক'রেছে, হাজারবার, লক্ষবার, সে কথা সত্যি। কিন্তু 'আঙোটজুতি'র কথাটা তুমি জান না বাবা পাতু। গাঁয়ের ভাগাড় তোমরা যে দখল কর—তার জন্যেই তোমাদিগকে গাঁয়ের 'আঙোটজুতি' যোগাতে হয়। এই নিয়ম। ভাগাড়ে মড়ি পড়লে তোমরা চামড়া নাও, হাড় বিক্রী কর—তারই দরুণ তোমার ওই 'আঙোটজুতি'।...মাংস কাটিয়া লইয়া যাওয়ার কথাটা আর চৌধুরী ঘৃণাবশে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

পাতু অবাক হইয়া গেল; সে বলিল—ভাগাড়ের দরুণ?

—হ্যাঁ। তোমাদের প্রবীণেরা তো কেউ নাই, তারা সব জানত।

—শুধু তাই লয়, মশায়; ওই পোড়ামুখী কলঙ্কিনী গো।....পাতুর বউ আবার সুর তুলিল।

পাতু এবার সঙ্গে সঙ্গে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তো 'আঙোট-জুতি' ও লয়; আপনারা ভদ্দনোকরা যদি আমাদের ঘরের পানে তাকান্—তবে আমরা যাই কোথা বলুন?

প্রৌঢ় প্রবীণ ধর্মপরায়ণ চৌধুরী বলিয়া উঠিলেন—রাম! রাম! রাম! রাধেকেষ্ট! রাধেকেষ্ট!

পাতু বলিল—আজ্ঞে, রাম রাম লয়, চৌধুরী মশায়। আমার ভগ্নী দুগ্‌গা একটুকু বজ্জাত বটে; বিয়ে দেলাম তো পালিয়ে এল শ্বশুরঘর থেকে। সেই তারই সঙ্গে মশায় ছিরু পাল ফষ্টিনষ্টি ক'রবে। যখন-তখন পাড়ায় এসে ছুতোনাতা নিয়ে বাড়ীতে ঢুকে বসবে। আমার মা হারামজাদীকে তো জানেন? চিরকাল একভাবে গেল; পালকে ব'সতে দেবে—ফুস-ফাস ক'রবে। ঘরে মশায় আমারও বউ রয়েছে। তাকে, মাকে আর দুগ্‌গাকে আমি যা কতক ক'রে দিয়েছিলাম। মোড়লকেও ব'লেছিলাম, ভাল ক'রেই ব'লেছিলাম চৌধুরী মশাই,—আমাদের জাত-জ্ঞেতে নিন্দে করে—আপনি আর আসবেন না, মশায়। আসল আক্কোশটা হ'ল সেই।

লাঠি ও ছাতায় চৌধুরীর দুই হাতই ছিল আবদ্ধ, কানে আঙুল দিবার উপায় ছিল না; তিনি ঘৃণাভরে থুতু ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—রাধাকৃষ্ণ হে! থাক্ পাতু, থাক্ বাবা—সক্কালবেলা ওসব কথা আমাকে আর শুনিও না। আমার কি হাত আছে বল! রাধে রাধে হে!

পাতু কিন্তু রুষ্ট হইল, কোন কথা না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার পিছন পিছন তাহার স্ত্রী আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। স্বামীর নীরবতার সুযোগ পাইয়া সে আবার সুরু করিল—হারামজাদী আবার ঢং ক'রে ভাইয়ের দুখে ঘটা ক'রে কানতে ব'সেছে গো! ওগো আমি কি ক'রব গো।

পাতু বিদ্যুৎ-গতিতে ফিরিল; সঙ্গে সঙ্গে বউটি আতঙ্কে অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল—অ্যা—।

পাতু মুখ খিঁচাইয়া বলিল—চেল্লাস না বাবু! তোকে কিছু বলি

যাই—তু থাম্। ধাক্কা দিয়া স্ত্রীকে সরাইয়া দিয়া সে ফিরিয়া পশ্চাদগামী চৌধুরীর সম্মুখে আসিয়া বলিল—আচ্ছা চৌধুরী মশায়, আলিপুরের রহমৎ স্যাখ যে কঙ্কণায় রমন্দ চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড় দখল ক'রছে, তার কি ক'রছেন?

আশ্চর্য্য হইয়া চৌধুরী বলিলেন—সে কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়। ভাগাড়ের চামড়া তাদিগে ছাড়া আর কাউকে বেচতে পাব না আমরা। বলে, জমিদার আমাদিগে বন্দোবস্ত দিয়েছে। খাল ছাড়ানোর মজুরি আর মুনের দাম—তার ওপর দু-চার আনা ছাড়া দেয় না। অথচ চামড়ার দাম এখন আগুন।

চৌধুরী পাতুর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—সত্যি কথা, পাতু?

—আজ্ঞে হাঁ্যা। মিছে যদি হয় পঞ্চাশ জুতো খাব, নাকে খৎ দোব।

তা হ'লে,—চৌধুরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—তা হ'লে হাজার বার তুমি ব'লতে পার ও-কথা। গাঁয়ের লোক পয়সা দিতে বাধ্য। কিন্তু জমিদারের গোমস্তা নগদীকে জিজ্ঞাসা ক'রেছ কথাটা?

পাতু বলিল—গোমস্তা নগদী কেন, জমিদারের কাছেই যাব আমি। ডাক্তার ঘোষ মহাশয় ব'ললে, থানায় যা। তা থানা কেন—আগে জমিদারের কাছেই যাই, দু'টো বিচারই হ'য়ে যাক। দেখি, জমিদার কি বলে।

সে আবার ফিরিল এবং সোজা আল-পথটা ছাড়িয়া দক্ষিণ দিকের একটা আল্ ধরিয়া কঙ্কণার দিকে মুখ করিল। বৃদ্ধ চৌধুরী ঠুক্ ঠুক্ করিয়া নদীর চরের দিকে অগ্রসর হইলেন। নদীর ওপারের জংশনের কলগুলার চিমনি এইবার স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর চৌধুরী

আসিয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধ হতভম্ব হইয়া গিয়াছে; সব করিয়া সব্ব হইল—শেষে চামড়া বেচিয়া রমেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে! ছিঃ ছিঃ, ব্রাহ্মণের ছেলে!

পাঁচ

গল্পে শোনা যায়, যমজ ভাইয়ের ক্ষেত্রে যমদূতেরা রামের বদলে শ্যামকে লইয়া যায়, শ্যামের বদলে আসিয়া ধরে রামকে। তাহাদের অনুকরণে হইলেও ক্ষেত্র বিস্তৃততর করিয়া লইয়া রাম অপরাধ করিলে মানুষ অতিবুদ্ধিবশতঃ প্রায়ই শ্যামকে লইয়া টানাটানি করে। পুলিশও মানুষ, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। পরদিনই একটা পুলিশ-তদন্ত হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ আক্রোশের কারণ দেখাইয়া ছিরু পালকে সন্দেহ করিলেও পুলিশ আসিয়া মাঠ-আগলদার সতীশ বাউড়ীর বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকটাকে জেরায় নাজেহাল করিল; অবশেষে ছাড়িয়া দিল। অবশ্য, একবার ছিরু পালের খামার-বাড়ীটাও ঘুরিয়া দেখিল;—কিন্তু সেখানে দুই বিঘা জমির আধ-পাকা ধানের একগাছি খড়ও কোথাও মিলিল না।

পুলিশ আসিয়া গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়াছিল। গ্রামের মণ্ডল-মাতব্বরেরাও আসিয়া চন্দ্রমণ্ডলের নক্ষত্র সভাসদের মত চারিপাশে জমকাইয়া বসিয়া উত্তেজিতভাবে ফিস্ ফিস্ করিয়া পরস্পরের মধ্যে কথা বলিতেছিল। ছিরু পাল বসিয়াছিল—পুলিশের অতি নিকটেই অত্যন্ত গম্ভীরভাবে। তাহার আকর্ণবিস্তৃত মুখগহ্বরের পাশে চোয়ালের হাড় দুইটা কঠিন ভঙ্গিতে উঁচু হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধ সম্মুখেই উবু হইয়া বসিয়া মাটির দিকে চাহিয়া কত কি

ভাবিতেছিল। তদন্ত-শেষে পুলিশ উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অনিরুদ্ধও উঠিল; সে চাহিয়া না দেখিয়াও স্পষ্ট অনুভব করিতেছিল যে, সমস্ত গ্রামের লোক কঠিন প্রতিহিংসা-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছে! প্রত্যক্ষ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়—নিরুপায় হইয়া মানুষকে সহ্যও করিতে হয়—কিন্তু যন্ত্রণার ভাবী ইঙ্গিত মানুষের পক্ষে অসহ্য। সে পুলিশেরই পিছন পিছন উঠিয়া আসিল।

পুলিশ চলিয়া যাইতেই চণ্ডীমণ্ডপে প্রচণ্ড কলরব উঠিল। সমবেত জনতার প্রত্যেকে আপন আপন মন্তব্য ঘোষণা আরম্ভ করিল; কেহ কাহারও কথা শোনে না দেখিয়া প্রত্যেকেই আপন আপন কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব উচ্চগ্রামে লইয়া গেল। সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের কেহই অবশ্য শ্রীহরি ঘোষকে সুনজরে দেখে না; কিন্তু অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার যখন পুলিশে খবর দিয়া তাহার বাড়ী খানাতল্লাস করাইল, বাড়ীতে পুলিশ ঢুকাইয়া দিল, তখন অপমানটাকে তাহারা সম্প্রদায়গত করিয়া লইয়া বেশ উত্তেজিত ইইয়া উঠিল। বিশেষ করিয়া সেদিন অনিরুদ্ধের সমাজকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যজনিত অপরাধের ভিত্তির উপর আজিকার ঘটনাটা ঘটিবার ফলে বিষয়টা গুরুত্বে রীতিমত বড় হইয়া উঠিয়াছে।

দেবনাথ ঘোষের গলাটা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি উচ্চ, এ গ্রামের সকল কলরবের উর্দ্ধে তাহার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। সে দুই অর্থেই। চাষীর ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম! তীক্ষ্ণধী-বুদ্ধিমান্ যুবক দেবনাথ। তাহার ছাত্র-জীবনে সে কৃতী ছাত্র ছিল। কিন্তু আর্থিক অস্বাচ্ছল্য এবং সাংসারিক বিপর্য্যয় হেতু ম্যাট্রিক ক্লাস হইতে তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইয়াছে। সে এখন এই গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। গ্রাম্যজীবনের ব্যবস্থা শৃঙ্খলার বহু তথ্য সে ব্যগ্র কৌতূহলে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছে। সে বলিতেছিল—কামার, ছুতোর, নাপিত, কাজ করব না বললেই চলবে না। কাজ করতে তারা বাধ্য।

শ্রীহরি কেবল তেমনি গম্ভীরভাবে দাঁতে দাঁতে চাপিয়া বসিয়া ছিল, এতখানি যে হইবে—সে তাহা ভাবিতে পারে নাই। ওদিকে শ্রীহরির খামার-বাড়ীতে শুকাইতে দেওয়া ধান পায়ে পায়ে ওলোট-পালোট করিয়া দিতে দিতে ছিরুর মা অশ্লীল ভাষায় গালাগালি ও নিষ্ঠুরতম আক্রোশে নির্ম্মম অভিসম্পাত দিতেছিল।

* * *

পদ্ম উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া বাহির-দরজাটিতেই দাঁড়াইয়া ছিল। থানা-পুলিশকে তাহার বড় ভয়। ছিরুর মায়ের অশ্লীল গালিগালাজ এবং নিষ্ঠুর অভিসম্পাতগুলি এখান হইতে স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। পদ্মও দুরন্ত মুখরা মেয়ে—গালিগালাজ অভিসম্পাত সে-ও অনেক জানে। সে কাহারও স্পষ্ট নামোল্লেখ না করিয়া তাহাদের অবস্থার সহিত মিলাইয়া এমনভাবে অভিসম্পাত দিতে পারে যে, শব্দভেদী বাণের মত উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির একেবারে বুকে গিয়া আমূল বিধিয়া যায়। কিন্তু আজ দারুণ উৎকণ্ঠায় শাপ-শাপান্তগুলি মুখে আসিতেছিল না। এই সময় অনিরুদ্ধ আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। অনিরুদ্ধকে দেখিয়া গভীর আশ্বাসে সে আরামের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। পরমুহূর্ত্তেই চোখমুখ দীপ্ত করিয়া বলিল —শুন্‌ছ তো? আমিও এইবার গাল দোব কিন্তু!

অনিরুদ্ধের অবস্থাটা ঠিক শীতের বরফের মত অনুতপ্ত, স্থির, কঠিন। সে রুক্ষকণ্ঠে বলিল—না, গাল দিতে হবে না—ঘরে চল্‌।

পদ্ম ঘরের দিকে আসিতে আসিতে বলিল—না, শুধু-শুধু ঘরে যাব, কানের মাথা খেয়েছ? গালগুলো শুনতে পাচ্ছ না?

—তবে যা, গাল দিগে; গলা ফাটিয়ে চীৎকার কর্‌ গিয়ে!

পদ্ম গজ গজ করিতে করিতে গিয়া ভাঁড়ার ঘর হইতে তেল বাহির করিয়া আনিয়া বলিল—কি খোয়ারটা আমার করেছ, শুনতে

পাচ্ছ না তুমি?...পদ্ম ও অনিরুদ্ধ নিঃসন্তান—তাই ছিরুর মা অনিরুদ্ধের নিষ্ঠুরতম মৃত্যু-কামনা করিয়া পদ্মের জন্য কদর্য্যতম ভবিষ্যৎ উপজীবিকার অশ্লীল নির্দ্দেশ দিয়া অভিসম্পাত দিতেছে। তেলের বাটি পাশে রাখিয়া সে স্বামীর একখানা হাত টানিয়া লইয়া তাহাকে তেল মাখাইতে বসিল। কর্কশ কঠিন হাত; আগুনের আঁচে রোম-গুলি পুড়িয়া কামানো দাড়ির মত কর্‌কেরে হইয়া আছে। শুধু হাত নয়, হাত-পা বুক—মোট কথা সম্মুখ ভাগের প্রায় সমস্ত অনাবৃত অংশটাই এমনি দগ্ধরোম। তেল দিতে দিতে পদ্ম বলিল—বাব্বা, হাত তো নয়, যেন উখো।

অনিরুদ্ধ সে কথায় কান না দিয়া বলিল—আমার গুপ্তিটা বার করে বেশ ক'রে মেজে রাখবি তো।

পদ্ম স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আমারও দা আছে, কাল মেজে ঘ'ষে সান দিয়ে রেখেছি, নিজের গলায় মেরে একদিন ছু'খানা হ'য়ে পড়ে থাকব কিন্তু।

—কেন?

—তুমি খুন খারাপী করে ফাঁসী যাবে—আর আমি হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি ভোগ করতে বেঁচে থাকব নাকি?

অনিরুদ্ধ কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল বলিল হু-উ!....অর্থাৎ পদ্মের-হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতির সম্ভাবনার কথাটা সে ভাবিয়া দেখে নাই, নতুবা ছিরেকে জখম করিয়া জেল খাটিতে বা হত্যা করিয়া ফাঁসী যাইতে বর্ত্তমানে তাহার বিশেষ আপত্তি ছিল না।

—বারণ ক'রলাম, থানা-পুলিশ ক'র না। কথা কানেই তুললে না। কিন্তু কি হ'ল? পুলিশ কি করলে? গাঁয়ের সঙ্গে কেবল ঝগড়া-বিবাদ বেড়ে গেল। আর আমি গাল দোব ব'ললেই—একেবারে বাঘের মত হাঁকিয়ে উঠছ—'না দিতে পাবি না।'

রুদ্ধক্রোধ অনিরুদ্ধ বিরক্তিতে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে তাহার সাহসও হইল না, প্রবৃত্তিও হইল না। বন্ধ্যা পদ্মাকে লইয়া তাহাকে বড় সন্তর্পণে চলিতে হয়; সামান্য কারণে নিতান্ত বালিকার মত সে অভিমান করিয়া মাথা খুঁড়িয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়া তোলে; আবার কখনও প্রবীণা প্রৌঢ়া যেমন দুরন্ত ছেলের আবদার-অত্যাচার সহ্য করে, তেমনি করিয়া হাসিমুখে অনিরুদ্ধের অত্যাচার সহ্য করে—অনিরুদ্ধের হাতে মার খাইয়াও তখনি সে খিল্ খিল্ করিয়া হাসে; কখন্ কোন্ মুখে পদ্ম চলে—সে অনিরুদ্ধ অনেকটা বুঝিতে পারে। আজিকার কথার মধ্যে তাহার আবদারের সুর ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেইটুকু বুঝিয়াই সে দারুণ বিরক্তি সত্ত্বেও আত্ম-সংবরণ করিয়া রহিল। কোন কথা না বলিয়া সে আপনার সদ্যতৈলস্পৃষ্ট পাখানা টানিয়া লইয়া বলিল—কই, গামছা কই?

পদ্ম কিন্তু এইটুকুতেই অভিমানে ফোঁস্ করিয়া উঠিল; মুখে সে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বিদ্যুদ্গতিতে মুখ তুলিয়া বিচিত্র-দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল,—পরমুহূর্ত্তেই তেলের বাটিটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

বিরক্তিভরে ভ্রূকুটি করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বেলা পানে তাকিয়ে দেখেছিস? ছেঁয়া কোথা গিয়েছে দেখ্। তিনটে বাজে।

গম্ভীরমুখে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ীর উঠানের ছায়া লক্ষ্য করিয়া পদ্ম গামছাখানা আনিয়া অনিরুদ্ধের হাতে দিয়া বলিল—ব'স, আমি জল এনে দিই, বাড়ীতেই চান ক'রে নাও।

গামছাখানা কাঁদে ফেলিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তাতে বরং দেরী হবে, পদ্ম। আমি যাব আর আসব। পানকৌড়ির মত ভুক ক'রে ডুবব আর উঠব। ভাত তুই বেড়ে রাখ্।...সে দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম ভাত বাড়িতে গিয়া রান্নাঘরের শিকলে হাত দিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ডাল-তরকারির সব তো হিম হইয়া গিয়াছে! বাবুর মুখে রুচিবে কি? বাবু নয়, নবাব। যত আয় তত ব্যয়। কামার, কুমোর, নাপিত, স্বর্ণকার—ইহাদের অবশ্য খ'রুচে বলিয়া চিরকাল বদনাম; কিন্তু উহার মত অর্থাৎ অনিরুদ্ধের মত খ'রুচে পদ্ম কাহাকেও দেখে নাই। ওপারের সহরে কামারশালা করিয়া খরচের বাতিক তাহার আরো বাড়িয়া গিয়াছে। এক টাকা সেরের ইলিশমাছ কে এ গ্রামে খাইয়াছে? এখন একটা কিছু গরম না করিয়া দিলে নবাব কেবল ভাতে-হাত করিয়াই উঠিয়া পড়িবে। খিড়কির ডোবাটার পারে পদ্ম প্রথম আশ্বিনেই কয়েক ঝাড় পেঁয়াজ লাগাইয়াছিল, সেগুলা বেশ ঝাড়ে-গোছে বড় হইয়া উঠিয়াছে। পেঁয়াজের শাক আনিয়া ভাজিয়া দিলে কেমন হয়? পদ্ম খিড়কির দিকে অগ্রসর হইয়াই লক্ষ্য করিল—দুয়ারের পাশে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে। সাদা কাপড়ের খানিকটা মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল—গত কালের ছিরুপালের সেই বীভৎস হাসি! কয়েক পা পিছাইয়া আসিয়া সে প্রশ্ন করিল—কে? কে দাঁড়িয়ে গা?

সাড়া পাইয়া মানুষটি চকিত গতিতে ঘরে প্রবেশ করিল। পদ্ম আশ্বস্ত হইল—পুরুষ নয়, স্ত্রীলোক। পরমুহূর্ত্তেই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল—এ-যে ছিরুপালের বউ! বয়স ত্রিশ-বত্রিশের বেশী হইবে না; এককালে সুন্দরী ছিল সে, কিন্তু এখন অকালবার্দ্ধক্যে জীর্ণশীর্ণ। চোখে তাহার সকরুণ মিনতি। ছিরুপালের বউ বিনা ভূমিকায় দু'টি হাত জোড় করিয়া বলিল—ভাই, কামার বউ!

পদ্ম কোন কথা বলিতে পারিল না; ছিরুপালের বউকে সে ভাল করিয়াই জানে, এমন ভাল মেয়ে আর হয় না। কত বড়

ভাল ঘরের মেয়ে যে, তাও সে জানে। তাহার কতখানি দুঃখ তাও সে চোখে দেখিয়াছে—কানে শুনিয়াছে—ছিরুপালের প্রহার সে দূর হইতে স্বচক্ষে দেখিয়াছে; তদুপরি ছিরুর মায়ের গালিগালাজ সে নিত্যই শুনিতেছে।

ছিরুর বউ তাহার সম্মুখে আসিয়া ঈষৎ নত হইয়া বলিল—তোমার পায়ে ধ'রতে এসেছি ভাই।

দুই পা পিছাইয়া গিয়া পদ্ম বলিল—না-না-না! সে কি!

—আমার ছেলে দু'টিকে তোমরা গাল দিও না, ভাই; যে ক'রেছে তাকে গাল দাও— কি ব'লব আমি তাতে!

ছিরুপালের সাতটি ছেলের মধ্যে দুইটি মাত্র অবশিষ্ট। তাও পৈত্রিক গুপ্তব্যাধির বিষে জর্জ্জরিত—একটি রুগ্ন, অপরটি প্রায় পঙ্গু।

সন্তানবতী নারীদের উপর বন্ধ্যা পদ্মের একটা অবচেতন-গত হিংসা আছে। এই মুহূর্ত্তে কিন্তু সে হিংসাও তাহার স্তব্ধ হইয়া গেল। সে আপনা-আপনি কেবলি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ছিরুপালের স্ত্রী বলিল—তোমাদের অনেক ক্ষতি ক'রেছে। চাষীর মেয়ে—আমি জানি। তুমি ভাই এই টাকা ক'টা রাখ—বলিয়া সে স্তম্ভিত-পদ্মের হাতে দুইখানি দশ টাকার নোট গুঁজিয়া দিয়া আবার বলিল—লুকিয়ে এসেছি ভাই, জানতে পারলে আমার আর মাথা থাকবে না—বলিয়াই সে দ্রুতপদে ফিরিল। দরজার মুখে গিয়া সে আবার একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত দু'টি জোড় করিয়া বলিল—আমার ছেলে দুটির কোন দোষ নাই ভাই, আমি জোড়হাত ক'রে যাচ্ছি।

পরমুহূর্ত্তে সে খিড়কির দরজার ও-পাশে অদৃশ্য হইয়া গেল। পদ্ম যেন অসাড় নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার এই স্তম্ভিত ভাব কাটিয়া গেল অদূরবর্তী একটা কোলাহলের আঘাতে। আবার একটা গোলমাল বাধিয়া উঠিয়াছে। সকল কোলাহলের ঊর্দ্ধে একজনের গলা শোনা যাইতেছে। পদ্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল;—অনিরুদ্ধ কি? না, সে নয়। তবে?....ছিরুপাল?...কান পাতিয়া শুনিয়া পদ্ম বুঝিল—এ ছিরুপালের কণ্ঠস্বরও নয়।....তবে?.. সে দ্রুতপদে আসিয়া বাহির-দরজার সম্মুখে পথের উপর গিয়া দাঁড়াইল। এবার সে স্পষ্ট বুঝিল —এ কণ্ঠস্বর এ গ্রামের একমাত্র ব্রাহ্মণ বাসিন্দা হরেন্দ্র ঘোষালের। পদ্ম এবার নিশ্চিন্ত হইল। মুখে খানিকটা ব্যঙ্গহাস্যও দেখা দিল। হরেন্দ্র ঘোষালের মাথায় বেশ খানিকটা ছিট্ আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রামের সকলকে টেক্কা দিয়া তাহার চলা চাই। ছিরুপাল সাইকেল কিনিলে, সে সাইকেল এবং কলের গান কিনিয়া ফেলিল জমি বন্ধক দিয়া। ছিরুপাল নাকি রহস্য করিয়া রটনা করিয়াছিল —সে এবার ঘোড়া কিনিবে। হরেন্দ্র মানরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিল—ছিরুপাল ঘোড়া কিনিলে সে একটা হাতী কিনিবে।....আজ আবার বামুনের কি রোখ্ মাথায় চাপিয়াছে কে জানে? পথে কোন একটা ছোট ছেলেও নাই যে জিজ্ঞাসা করে!

ঠিক এই সময়েই পদ্ম দেখিল অনিরুদ্ধ আসিতেছে। কাছে আসিয়া পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পদ্ম বলিল—মরণ— হাসছ কেনে?

অনিরুদ্ধ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িল।

—যা গেল? ব্যাপারটা ব'লে তবে তো মানুষ হাসে! এত চেঁচামেচি কিসের? হ'ল কি? হরু ঠাকুর এমন চেঁচাচ্ছে কেনে?

ঠাকুরকে ভারী জব্দ ক'রেছে। আধখানা কামিয়ে নিয়ে....আবার ...

বহুকষ্টে হাস্য-সংবরণ করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত প্রবল হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল!

কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিয়া কোনমতে অনিরুদ্ধ কথাটা শেষ করিল। তারা নাপিতও তাহাদের দেখাদেখি বলিয়াছে, ধান লইয়া গোটা বৎসর সমস্ত গ্রামের লোকের ক্ষৌরির কাজ সে করিতে পারিবে না। যাহাদের জমি নাই—হাল নাই—তাহাদের কাছে ধান পাওয়া যায় না। যাহাদের আছে তাহারাও সকলে দেয় না। সুতরাং ধানের কারবার ছাড়িয়া সে নগদ কারবার সুরু করিয়াছে। হরুঠাকুর আজ কামাইতে গিয়াছিল—তারা নাপিত পয়সা চাহিয়াছিল! খানিকটা বকিয়া অবশেষে পয়সা দিব বলিয়াই হরুঠাকুর কামাইতে বসে।

অনিরুদ্ধ বলিল—তারা নাপিত—একে নাপিত ধূর্ত্ত, তায় তারা। আধখানা কামিয়ে বলে—কই পয়সা দাও ঠাকুর। হরু বলে—কাল দোব। তারাও অমনি ক্ষুর ভাড় গুটিয়ে ঘর ঢুকে ব'লে দিয়েছে—তা হ'লে আজ থাক—কাল বাকীটা কামিয়ে দেব। এই চেঁচামেচি গালাগাল—হিন্দী ফার্সী ইংরেজী! গাঁয়ের লোক আবার জটলা পাকাচ্ছে।....অনিরুদ্ধ আবার প্রবল কৌতুকে হাসিয়া উঠল—হাসির তোড়ে তাহার মুখের ভাত ছিটাইয়া উঠানময় হইয়া গেল।

পদ্মের খানিকটা শুচি-বায়ু আছে; তাহার হা-হা করিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু সে আজ কিছুই বলিল না। অনিরুদ্ধের এত হাসিতেও সে এতক্ষণের মধ্যে একবারও হাসে নাই। কথাটা অনিরুদ্ধের অকস্মাৎ মনে হইল। সে গভীর বিস্ময়ে পদ্মের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তোর আজ কি হ'ল বল দেখি?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পদ্ম বলিল—ছিরু পালের বউ লুকিয়ে এসেছিল।

—কে ?…বিস্ময়ে অনিরুদ্ধ সচকিত হইয়া উঠিল।

—ছিরু পালের বউ গো।…তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিয়া পদ্ম কাপড়ের খুঁটে-বাঁধা নোট দুইখানি দেখাইল।

অনিরুদ্ধ নীরব হইয়া রহিল।

পদ্ম আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা, মায়ের প্রাণ।

অনিরুদ্ধ আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অকস্মাৎ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল, যেন ঝাঁকি দিয়া নিজেকে টানিয়া তুলিল;—বলিল—বাবাঃ, রাজ্যের কাজ বাকী প'ড়ে গিয়েছে। এইবার খেয়ে দেয়ে দেড় ক্রোশ পথ ছুটতে হবে!

পদ্ম কোন কথা বলিল না। হাতমুখ ধুইয়া মশলা মুখে দিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া অনিরুদ্ধ একমুখ হাসিয়া বলিল—একখানা নোট আমাকে দে দেখি।

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিল। অনিরুদ্ধ আরও খানিকটা হাসিয়া বলিল—লোহা আর ইস্পাত কিনতে হবে পাঁচ টাকার। ছিরে শালাকে টাকা দিতে খদ্দেরের পাঁচ টাকা ভেঙেছি। আর—

পদ্ম কোন কথা না বলিয়া একখানা নোট অনিরুদ্ধের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

অনিরুদ্ধ কুড়াইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল—আমি নিজে একটি—মাইরি ব'লছি—একটি টাকার এক পয়সা বেশী খরচ ক'রব না কিন্তু। কতদিন খাই নাই বল্ দেখি?

অর্থাৎ মদ।

পদ্ম তবুও কোন কথা বলিল না। অকস্মাৎ যেন অনিরুদ্ধের উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ছয়
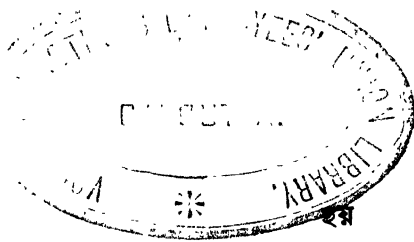
হরু ঘোষালের আধখানা দাড়ি কামাইয়া বাকীটা রাখিয়া দেওয়ায় তারা নাপিতের যতই পরিহাস-রসিকতা প্রকাশ পাইয়া থাকুক এবং গ্রামের লোকে প্রথমটা হরু ঘোষালের সেই অর্দ্ধনারীশ্বরবৎ রূপ দেখিয়া হাসিয়া ব্যাপারটা যতই হাস্যকর করিয়া তুলুক,—প্রতি-ক্রিয়ার পালাটা কিন্তু ততই ঘোরালো এবং গম্ভীর হইয়া উঠিল।

হরিশ মণ্ডল প্রবীণ মাতব্বর ব্যক্তি—লোকটির বোধশক্তিও আছে। সে-ই প্রথম বলিল—হাসিস না তোরা, হাসির ব্যাপার এটা নয়। গাঁয়ের অবস্থাটা কি হ'ল একবার ভেবে দেখেছিস?

সকলেই হাসির বেগের প্রবলতা খানিকটা সংবরণ করিয়া হরিশের মুখের দিকে চাহিল। হরিশ গম্ভীরভাবে বলিল—ঘোর অরাজক।

ভবেশ পাল—ছিরুর কাকা—স্থূল ব্যক্তি, তবুও বুদ্ধিমত্তার ভাণ তাহার আছে, সে-ও গম্ভীর হইয়া বলিল—তা বটে।

দেবনাথ হাসি-তামাসায় যোগ দিবার মত লোক নয়;—সে ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া বলিল—এ আপনারা আটকাবেন কি ক'রে? গাঁয়ের জোটান্ আছে আপনাদের? ওই-কামার ছুতোরের পঞ্চায়েতী ব্যাপারে ছিরু দ্বারিক চৌধুরীর অপমান করলে, চৌধুরী উঠে চ'লে গেল; জগন ডাক্তার তো এলই না—উল্টে অনিরুদ্ধকে উস্কে দিলে।

ভবেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হরিনাম সত্য হে! 'কলিশেষে একবর্ণ হইবে যবন'—একি আর মিথ্যে কথা, বাবা? এমনি ক'রেই ধর্ম্ম কর্ম্ম সব যাবে।

হরিশ বলিল—লুটনী দাই কি ব'লছে জান? আমার বউমায়েক

ন' মাস চ'লছে তো! তাই ব'লে পাঠিয়েছিলাম যে, রাত-বিরেতে কোথাও যদি যাস, তবে আগে খবর নিয়ে যাস যেন! তা ব'লেছ—যাব বটে, আমাকে কিন্তু নগদ বিদেয় ক'রতে হবে।

গভীর চিন্তায় বিভোর হইয়া ভবেশ বলিল—হুঁ

হরিশ বলিল—রাজা বিনে রাজ্যনাশ যে বলে—কথাটা মিথ্যে নয়। আমাদের জমিদার যে হ'য়েছে—থেকেও না-থাকা!

দেবনাথ বলিল—জমিদারের কথা বাদ দেন। জমিদার আমাদের খারাপ কিসের? এ কাজ তো জমিদারের নয়—আপনাদের। আপনারা কই শক্ত হ'য়ে ব'সে ডাকুন দেখি মজলিস। ঘাড় হেঁট ক'রে সবাইকে আসতে হবে। আসবে না—চালাকি নাকি? বিপদ-আপদ কি নাই তাদের। লোহাতে মুড় বাঁধিয়ে ঘর করে সব? চৌধুরীকে ডাকুন—জগন ডাক্তারকে ডাকুন—ডেকে আগে ঘর বুঝুন। তারপর কামার, ছুতোর, বায়েন, দাই, ধোপা, নাপিত এদের ডাকুন; আর ন্যায্য বিচার করুন।

হরিশ মাতব্বরগণের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দেবনাথ কিন্তু ব'লছে ভাল। কি বলেন গো সব?

ভবেশ বলিল উত্তম কথা।

নটবর বলিল—হ্যাঁ, তাই করুন তা হ'লে।

দেবনাথের উৎসাহের সীমা ছিল না, সে বলিল—আজই বসুন সব সন্ধ্যের সময়। আমি আসর ক'রে দিচ্ছি, স্কুলের চল্লিশ বাতির আলো দিচ্ছি; খবরও দিচ্ছি সকলকে। কি ব'লছেন সব?

হরিশ আবার সকলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি গো?

—তা বেশ! খানিকটা তামাক আর আগুনের যোগাড় রেখো বাপু!

বহুকাল পর চণ্ডীমণ্ডপটা আবার আলোকোজ্জ্বল হইয়া গ্রাম্য-মজলিসে জমিয়া উঠিল। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও চণ্ডীমণ্ডপটা এমনি ভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য-বিচার হইত, সংকীর্ত্তন হইত, পাশা-দাবাও চলিত; গ্রামখানির সলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপটি। গ্রামে কাহারও কোন কুটুম্ব-সজ্জন আসিলে—এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়া-কর্ম্ম—অন্ন-প্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সবই অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। ধূলায় ও কালগতিকে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না। জগন ডাক্তারের পূর্ব্বপুরুষ—জগনের পিতামহই কবিরাজ হইয়া বাহিরের ঘর বা বৈঠকখানার পত্তন করিয়াছিল। প্রথমে সে অবশ্য এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াই রোগী দেখিত। তারপর অবস্থার পরি-বর্ত্তনের জন্যও বটে এবং জমিদারের গোমস্তার সঙ্গে কি কয়েকটা কথান্তরের ফলেও বটে—কবিরাজ ঔষধালয় ও বৈঠকখানা তুলিয়া তামাক ও পানের স্বাচ্ছন্দ্যে নিজ গৃহে মজলিস জমাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে ভাঙন ধরাইয়া দিয়াছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে অনেকের বাড়ীতেই একটি করিয়া বাহিরের ঘরের পত্তন হইয়াছে, সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র গ্রাম জুড়িয়া অনেকগুলি ছোট মজলিস জমিয়া উঠে। কেহ বা একাই একটি আলো জ্বালিয়া সম্মুখস্থ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তবে এখনও জগন ডাক্তারের ওখানেই মজলিসটি বড় হয়। জগনের রূঢ় দাম্ভিকতা সত্ত্বেও রোগীর বাড়ীর লোকজন সেখানে যায়; আরও কয়েকজন যায়—ডাক্তারের অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক খবরের কাগজের সংবাদের প্রত্যাশায়। দেবনাথ ঘোষ এত বিরূপতা সত্ত্বেও যায়। সে-ই চীৎকার করিয়া কাগজ

পড়ে, অন্য সকলে শোনে। অসহযোগ আন্দোলন তখন শেষ হইয়াছে, স্বরাজপার্টির উগ্র বক্তৃতায় এবং সমালোচনায় কাগজের স্তম্ভগুলি পরিপূর্ণ। শ্রোতাদের মনে চমক লাগে—স্তিমিতগতি পল্লীবাসীর রক্তে যেন একটা উষ্ণ শিহরণ অনুভূত হয়।

আজ দেবনাথই সকলকে সম্ভাষণ করিতেছিল, সে-ই উদ্যোক্তা। মজলিস আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব হইতেই সে বেশ আসর জমাইয়া তুলিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুলগাছটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা, একটি বাসুদেব-মূর্ত্তি সেখানে গাছের শিকড়ে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া আছে; সেইটিই ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পূজিত হয়। সেখানে একটা মোটা শুকনা ডাল জ্বালিয়া আগুন করা হইয়াছে। সেই আগুনের চারিপাশে গ্রামের জনকতক হরিজন আসিয়া বসিয়া গিয়াছে। দ্বারকা চৌধুরী, জগন ডাক্তার, ছিরু পাল এবং আরও দুই-একজন এখনও আসে নাই।

চল্লিশ-বাতির আলোয় উজ্জ্বল চণ্ডীমণ্ডপটির উপরের দিকে চাহিয়া ভবেশ বলিল—দেখ্‌তে বেশ লাগছে বাপু।

হরিশও একবার চারিদিক দেখিয়া লইয়া বলিল—এইবার কিন্তু একবার মেরামত করতে হবে চণ্ডীমণ্ডপটিকে!—বলিয়া সে সপ্রশংস-কণ্ঠে বলিল—কি কাঠামো দেখ দেখি! ওঃ—কি কাঠ!

দেবনাথ বলিল—ষড়দলে কি লেখা আছে জানেন?—যাবচ্চন্দ্রার্ক-মেদিনী। মানে চন্দ্র-সূর্য্য-পৃথিবী যতদিন থাকবে, এও ততদিন থাকবে।

—তা থাকবে বাপু! বলিহারি বলিহারি!...ভবেশ পাল অকারণে উচ্ছ্বসিত এবং পুলকিত হইয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়েই দ্বারকা চৌধুরী লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করিয়া আসিয়া বলিলেন—ওঃ, ভলব যে বড় জোর গো!

দেবনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গেল; জগন ডাক্তার ও ছিরুর জন্য আবার সে দু'টি ছেলেকে দু'জনের কাছে পাঠাইয়া দিল। কিন্তু জগন ডাক্তার আসিল না, সে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছে—তাহার সময় নাই। চোখে চশমা লাগাইয়া সে নাকি খবরের কাগজ পড়িতেছে। ছিরুও আসে নাই; তাহার জ্বর হইয়াছে, তবে সে বলিয়াছে—"পাঁচ জনে যা করবেন তাই আমার মত।"

দেবনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ছিরুর অযাচিত বিনয়ে।

* * * *

ছিরুর কথাটা অস্বাভাবিকতা-দোষে দুষ্ট; বিনয়ের ধার ছিরু পাল ধারে না। জ্বর তাহার হয়ই নাই। সে নির্ম্মম আক্রোশে গর্ত্তের ভিতরকার আহত অজগরের মত মনে মনে পাক খাইয়া ঘুরিতেছিল। বাড়ীর ভিতরে দাওয়ার উপর উবু হইয়া বসিয়া সে প্রকাণ্ড বড় হুঁকাটায় ক্রমাগত একঘেয়ে টান টানিয়া যাইতেছিল ও প্রখর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে উঠানের একটা বিন্দুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল। নানা চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিতেছে।...

—ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলে কি হয়?...মনটা আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠে। পরক্ষণেই মনে হয়, না। সদ্য সদ্য আক্রোশের বশে একটা-কিছু করিয়া আবার হয়ত এমনি ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে। আজই পঞ্চাশ টাকা জমাদার বন্ধুকে দিতে হইয়াছে! তাই লইয়া তাহার মা এখনও গজ্ গজ্ করিয়া তাহাকে গালি পাড়িতেছে।

—মর্, তুই মর্ রে! এমন রাগ তোর! একটু সবুর নাই! হাঁদা—গাড়োল কোথাকার! পঞ্চাশ টাকা আমার খল্-খল্ ক'রে বেরিয়ে গেল! আমার বুকে বাঁশ চাপিয়ে দাও তুমি—আমার হাড় জুড়োক।...

শ্রীহরি সে দিকে কান দিতেছে না। অন্য সময় হইলে এতক্ষণ সে বুড়ীর চুলের মুঠা ধরিয়া উঠানে আছাড় মারিয়া ফেলিয়া নির্ম্মম প্রহার আরম্ভ করিত। কিন্তু আজ সে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

—অনিরুদ্ধ ওপার হইতে রাত্রি ন'টা-দশটার সময় ফেরে। অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণে —না!—সঙ্গে গিরীশ ছুতার থাকে।... দু'জনকে ঘায়েল করিয়া দেওয়াই বা এমন কি কঠিন? শ্রীহরির মিতে গড়াঞী সানন্দে তাহাকে সাহায্য করিবে।....

পরক্ষণেই সে চম্‌কিয়া উঠিল। ধরা পড়িলে ফাঁসী হইয়া যাইবে! ...তাহার সে চমক এত পরিস্ফুট যে তাহার ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা মা পর্য্যন্ত দেখিয়া ফেলিল। অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় সে বলিল—মর্ মুখপোড়া! ছোট ছেলের মত চম্‌কে উঠে যেন দেয়ালা ক'রছে!

শ্রীহরি অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল, পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া, হুঁকা হইতে কল্কেটা নামাইয়া দিয়া বলিল— এই! শুনচিস্? কল্কেটা পাল্টে দিয়ে যা'।

কথাটা বলা হইল তাহার স্ত্রীকে। ছিরুর স্ত্রী রন্ধনশালে ভাতের হাঁড়ির দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল। পাশেই ল্যাম্পের আলোয় ছিরুর বড় ছেলেটা বই খুলিয়া একদৃষ্টে বাপের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। শীর্ণ, রুগ্ন, বছর দশেকের ছেলেটা—গলায় এক বোঝা মাদুলী—বড় বড় চোখে অদ্ভুত স্থির মূঢ় দৃষ্টিতে চিন্তাগ্রস্ত বাপের প্রতিটি ভঙ্গিমা লক্ষ্য করিতেছে। শ্রীহরির ছোট ছেলেটা প্রায় পঙ্গু এবং বোবা; সেটাও একপাশে বসিয়া আছে—মুখের লালায় সমস্ত বুকটা অনবরত ভিজিতেছে। বড় ছেলেটিই উঠিয়া আসিয়া কল্কেটা লইয়া গেল। শ্রীহরি ছেলেটার দিকে একবার চাহিল। ছেলেটা অদ্ভুত, শ্রীহরির মার খাইয়াও কাঁদে না, স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। উহার জন্য এখন উহার

মাকে প্রহার করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। মাকে যেন আগলাইয়া ফেরে। মারিলে পশুর মত হিংস্র হইয়া উঠে। সেদিন সে প্রহার-রত শ্রীহরির পিঠে একটা সূচ বিঁধাইয়া দিয়াছিল। ছেলেটার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্রীহরির স্ত্রীর দিকে চাহিল—বিশীর্ণ গৌরবর্ণ মুখখানা উনানের আগুনের আভায় লাল হইয়া উঠিয়াছে—চামড়ায় ঢাকা কঙ্কালসার মুখ! শ্রীহরি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

—হ্যাঁ, আর এক উপায় আছে! অনিরুদ্ধের অনুপস্থিতিতে পাঁচিল ডিঙাইয়া পদ্ম কামারনীকে বাঘের মত মুখে করিয়া....শ্রীহরির বুকখানা ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল!...দীর্ঘাঙ্গী সবলদেহা কামারনীর সেই দা-খানা কিন্তু বড় শাণিত! চোখের দৃষ্টি তাহার শীতল এবং ক্রূর। সেদিন দাখানার রৌদ্র-প্রতিফলিত ছটায় ছিরুর চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছিল।

বায়েনদের দুর্গা—কামারনীর চেয়ে দেখিতে অনেক ভাল। যৌবনও তাহার উচ্ছ্বসিত; দেহবর্ণে সে গৌরী; রঙ্গরসে, লীলা-লাস্যে অপূর্ব্ব সে। কিন্তু বহুভোগ্যা সে, তাহার আকর্ষণ শ্রীহরিকে আর তেমন বিচলিত করে না। দুর্গার দাদা পাতু আবার তাহার নামে জমিদারের কাছে নালিশ করিয়াছে। স্পর্দ্ধা দেখ বায়েনের! শ্রীহরির মুখে তাচ্ছিল্যের ব্যঙ্গ-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। জমিদারের ছেলের সোনার নিমফলের গোট তাহার কাছে বাঁধা আছে!....অকস্মাৎ শ্রীহরি উঠিয়া দাঁড়াইল।

শ্রীহরির স্ত্রী কল্কেতে নতুন তামাক সাজিয়া আনিয়া নামাইয়া দিল। তামাক শ্রীহরিকে আকর্ষণ করিল না। দেওয়ালে-পোঁতা পেরেকে ঝুলানো জামাটা হইতে বিড়ি-দেশলাই বাহির করিয়া লইয়া সে চলিয়া গেল। অন্ধকার গলি-পথে-পথে ঘুরিয়া সে হরিজন-পল্লীর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রচণ্ড কলরব উঠিতেছে। পল্লীর প্রান্তে বহুকালের বৃদ্ধ বকুলগাছ, গ্রামের ধর্ম্মরাজতলা—সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় উহাদের মজলিস বসে। গান-বাজনা হয়, ভাসান, বোলান, ঘেঁটু-গানের মহলা চলে—আবার এক-একদিন দুর্নিবার কলহও বাধিয়া উঠে। আজ কলহ বাধিয়াছে। শ্রীহরি একটা গাছের অন্ধকারের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়া কান পাতিয়া শুনিতে আরম্ভ করিল।

পাতু চীৎকার করিয়া আস্ফালন করিতেছে।

দুর্গার তীক্ষ্ণ-কণ্ঠের আওয়াজ উঠিতেছে—ভাত দেবার ভাতার লয়, কিল মারবার গোঁসাই। দাদা সাজছে—দা-দা। মারবি কেনে তু? আমি যা খুসি তাই ক'রব। হাজার নোক আসবে আমার ঘরে, তোর কি?

সঙ্গে সঙ্গে দুর্গার মা-ও চীৎকার করিতেছে। শ্রীহরি হাসিল—তাহাকে লইয়াই আন্দোলন চলিতেছে!

সহসা সে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে অগ্রসর হইল দুর্গাদের পল্লীর দিকে। পল্লীটা খাঁ খাঁ করিতেছে। সব গিয়া ওই গাছতলায় জুটিয়াছে। শ্রীহরি সন্তর্পণে ঢুকিয়া পড়িল দুর্গাদের বাড়ীতে। বাড়ী অর্থে প্রাচীরবেষ্টনহীন এক টুকরা উঠানের দুই দিকে দু'খানা ঘর; একখানা দুর্গা ও দুর্গার মায়ের, অপরখানা পাতুর। শ্রীহরির তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাতুর ঘরখানার দিকে। শ্রীহরি হতাশ হইল। দরজাটা বন্ধ—দাওয়াটাও শূন্য।

একটা কুকুর অকস্মাৎ গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বোধ হয় চুরি করিয়া কাঁচা চামড়ার টুকরা খাইতে আসিয়াছিল। শ্রীহরি হাসিয়া একটা বিড়ি ধরাইল, সুকৌশলে হাতের মধ্যে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে লুকাইয়া টানিতে টানিতে বাহির হইল।....দুর্গার জন্য

কতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে কে জানে ?....গাছের আড়ালে আবার সে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওদিকে কিন্তু ঝগড়াটা ক্রমশই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শ্রীহরি আবার একটা বিড়ি ধরাইল। কিছুক্ষণ পর সে গাছতলা হইতে বাহির হইয়া জ্বলন্ত বিড়িটা পাতুর চালের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া দ্রুত লঘুপদে আপন বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবল আলোচনা চলিতেছে।

শ্রীহরি হাসিল।

কিছুক্ষণ পরেই গ্রামের ঊর্দ্ধলোকে অন্ধকার আকাশ রক্তাভ আলোয় ভয়াল হইয়া উঠিল। আকাশের নক্ষত্র মিলাইয়া গিয়াছে। উৎক্ষিপ্ত খড়ের জ্বলন্ত অঙ্গার আকাশে উঠিয়া নিবিয়া যাইতেছে ফুলঝুরির মত। মাঝে মাঝে হাউইএর মত প্রজ্জ্বলিত বাখারিগুলি সশব্দে বাগানের মাথায় গিয়া ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। আগুন! আগুন! ভয়ার্ত্ত চীৎকার—শিশু ও নারীর উচ্চ কান্নার রোলে শূন্যলোকের বায়ুতরঙ্গ মুখর, ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

নিমেষে বটতলার জটলা এবং তাহার পরই চণ্ডীমণ্ডপের মজলিস ভাঙিয়া গেল।

সাত

একা পাতুর ঘর নয়, পাতুর ঘরের আগুন ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া সমস্ত হরিজন-পল্লীটাকেই পোড়াইয়া দিল। বড় বড় গাছের আড়াল পাইয়া খান দুই-তিন ঘর কেবল বাঁচিয়াছে। বাকী ঘরগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পুড়িয়া গিয়াছে! সামান্য কুটীরের মত নীচু-নীচু ছোট-ছোট ঘর—বাঁশের হালকা কাঠামোর উপর অল্প খড়ের পাতলা ছাউনি; কার্ত্তিকের প্রথম হইতে বৃষ্টি না হওয়ায় রোদে শুকাইয়া বারুদের মত দাহ্য বস্তু হইয়াই ছিল। আগুন তাহাতে স্পর্শ করিবামাত্র বিস্ফোরণের মতই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া গেল। গ্রামের লোক অনেকেই ছুটিয়া আসিয়াছিল—বিশেষ করিয়া অল্পবয়সী ছেলের দল। তাহারা চেষ্টাও অনেক করিয়াছিল, কিন্তু জল তুলিবার পাত্রের অভাব এবং বহ্নিমান সঙ্কীর্ণ চালাগুলিতে দাঁড়াইবার স্থানের অভাবে তাহারা কিছু করিতে পারে নাই। তাহাদের মুখপাত্র ছিল জগন ডাক্তার। অগ্নিদাহের সমস্ত সময়টা চীৎকার করিয়া সেনাপতির মত আদেশ দিয়া ও উপদেশ বাৎলাইয়া এমন গলা ফাটাইয়া ফেলিল যে, আগুন নিবিতে নিবিতে তাহার আওয়াজ বসিয়া গেল।

রাত্রে উহাদের সকলকে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া শুইতে অনুমতি দেওয়া হইল; কিন্তু—আশ্চর্য্য মানুষ উহারা—কিছুতেই ওই পোড়া-ভিটার মায়া ছাড়িয়া আসিল না। সমস্ত রাত্রি উহারই আশেপাশে কোনরূপে স্থান করিয়া এই হেমন্তের শীতজর্জ্জর রাত্রে অনাবৃত স্থানে রাত্রি কাটাইবে। ছেলেগুলা অবশ্য ঘুমাইল; মেয়েগুলা গানের মত সুর করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিল; আর পুরুষেরা পরস্পরকে দোষ দিয়া নিজের কৃতিত্বের আস্ফালন করিল এবং দগ্ধগৃহের

আগুন তুলিয়া ক্রমাগত তামাক খাইল। প্রায় ঘরেই দু-একটা গরু, দুই-চারিটা ছাগল আছে; আগুনের সময় সেগুলাকে তাহারা মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সেগুলা এদিকে ওদিকে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—রাত্রে সন্ধানের উপায় নাই। হাঁস-মুরগীও প্রত্যেকের ছিল; তাহার কতকগুলা পুড়িয়াছে, চোখে দেখা না গেলেও গন্ধে অনুমান করা যায়। যেগুলা পলাইয়া বাঁচিয়াছে—সেগুলা ইতিমধ্যেই আসিয়া আপন আপন গৃহস্থের জটলার পাশে পালক ফুলাইয়া যথাসম্ভব দেহ সঙ্কুচিত করিয়া বসিয়া গেল। অন্য সম্পদের মধ্যে কতকগুলা মাটির হাঁড়ি, দুই-চারিটা পিতল-কাঁসার বাসন, ছেঁড়া-কাপড়ে তৈয়ারী জীর্ণ-মলিন দুর্গন্ধযুক্ত কয়েকখানা কাঁথা ও বালিশ, মাদুর চ্যাটাই, মাছ ধরিবার পলুই, দু'চারখানা কাপড়—তাহার কতক পুড়িয়াছে বা পোড়া-চালের ছাইয়ের মধ্যে চাপা পড়িয়াছে। যে যাহা বাহির করিয়াছে—সে সেগুলি আপনার পরিবার-বেষ্টনীর মাঝখানে—যেন সকলে মিলিয়া বুক দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শেষরাত্রে হিমের তীক্ষ্ণতায় কুণ্ডলী পাকাইয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্য কাতর ক্লান্তির নীরবতার মধ্যে কখন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

সকাল হইতেই জাগিয়া উঠিয়া মেয়েরা আর এক দফা শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে কাঁদিতে বসিল। একটু রোদ উঠিতেই কোমর বাঁধিয়া মেয়ে-পুরুষে পোড়া খড়ের ছাইগুলা ঝুড়িতে করিয়া আপন আপন সারগাদায় ফেলিয়া ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল। পোড়া-কাঠগুলি একদিক করিয়া রাখা হইল—জ্বালানির কাজে লাগিবে। ছাইয়ের গাদার ভিতর হইতে চাপা-পড়া বাসন যাহার যাহা ছিল—সেগুলি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিল। এ সমস্ত কাজ ইহাদের মুখস্থ। গৃহের উপর দিয়া বিপর্যয় ইহাদের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। প্রবল বর্ষা হইলে ঘরগুলির জীর্ণ-আচ্ছাদন পড়িয়া যায়; নদীর বাঁধ ভাঙিলে বন্যায়

জল আসিয়া পাড়াটা ডুবাইয়া দিলে ব্যাপকভাবেই ঘরগুলি ধ্বসিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে জ্বালানির জন্য সংগৃহীত শুকনা পাতায় তামাকের আগুন ও জ্বলন্ত বিড়ির টুক্‌রা ফেলিয়া মদ্যবিভোর নিশীথে নিজেরাই আগুন লাগাইয়া ফেলে। বিপর্য্যয়ের পর সংসার গুছাইবার শিক্ষা এমনই করিয়া পুরুষানুক্রমেই ইহাদের হইয়া আসিতেছে। ঘর-দুয়ার পরিষ্কারের পর আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। গত সন্ধ্যার বাসি ভাতই ইহাদের সকালের খাদ্য, ছোট ছেলেদের মুড়ি দেওয়া হয়; কিন্তু ভাত বা মুড়ি সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ছোট বাচ্চাগুলা ইহার মধ্যে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে—কিন্তু তাহার আর উপায় নাই। দুই-একজন মাতা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলার পিঠে দুম্‌-দাম্‌ করিয়া কিল-চড় বসাইয়া দিল।—রাক্ষসের প্যাটে যেন আগুন লাগছে। মর্‌ মর্‌ তোরা, মর্‌।

ঘরদুয়ার পরিষ্কার হইয়া গেলে মনিব-বাড়ী যাইতে হইবে—তবে আহার্য্যের ব্যবস্থা হইবে। মনিবেরা এসব ক্ষেত্রে চিরকালই তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এ পাড়ার প্রায় সকলেই চাষীদের অধীনে খাটে। বাঁধা বাৎসরিক বেতনে বা উৎপন্ন ভাগের চুক্তিতে শ্রমিকের কাজ করে। কেহ কেহ পেটভাতায় বা মাসে ভাতের হিসাব মত ধান এবং ছোটরা বৎসরে চারখানা সাত হাত কাপড় লইয়া রাখালি করে। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মাসে আট আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা পায়—ধানের পরিমাণও তাহাদের বেশী। পূর্ণ জোয়ানদের অধিকাংশই উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ পাইবার চুক্তিতে চাষে শ্রমিকের কাজ করে। মনিব সমস্ত চাষের সময়টা ধান দিয়া ইহাদের সংসারের সংস্থান করিয়া দেয়—ফসল উঠিলে ভাগের সময় সুদ-সমেত ধান কাটিয়া লয়। সুদের হার প্রায় শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত। অজন্মার বৎসরে এই ঋণ শোধ

না হইলে আসল এবং সুদ এক করিয়া তাহার উপর আবার ঐ হারে সুদ টানা হয়। এই প্রথার মধ্যে অন্যায় কিছু ইহারা বোধ করে না—বরং সকৃতজ্ঞ আনুগত্যের ভাবই অন্তরে পোষণ করে। দায়-দৈবে মনিবেরা যে সাহায্য করেন—সেইটাই অতিরিক্ত করুণা। সেই করুণার ভরসায়ই আহার্য্যের চিন্তায় এমন ব্যাকুল তারায়া নয়। মেয়েরাও অবস্থাপন্ন চাষী-গৃহস্থদের ঘরে সকালে-বিকালে বাসন মাজে, আবর্জ্জনা ফেলিয়া পাট-কাজ করে। সেখান হইতেও কিছু পাওয়া যাইবে। এ ছাড়াও দুধের দাম কিছু কিছু পাওনা আছে। সে পাওনা কিন্তু গ্রামে নয়। চাষীর গ্রামে চাষীদের ঘরেই দুধ হয়। হরিজনেরা তাহাদের গরুর দুধ পাশের বড়লোকের গ্রাম কঙ্কণায় গিয়া বেচিয়া আসে। ঘুঁটেও সেখানে বিক্রয় হয়।

পাতুর কিন্তু এসব ভরসা নাই। সে জাতিতে বায়েন বা বাদ্যকর অর্থাৎ মুচি। তাহার কিছু চাকরান জমি আছে। গ্রামের সরকারী শিবতলা, কালীতলা এবং পাশের গ্রামের চণ্ডীতলায় নিত্য ঢাক বাজায়। সেই হেতু বৎসরে দেবোত্তর সম্পত্তির কিছু ধান সে পিতামহদের আমল হইতে পাইয়া থাকে। নিজের দুইটা হালী বলদ আছে—তদ্দ্বারা সে কঙ্কণার ভদ্রলোকের কিছু জমি ভাগে চাষ করে। এ ছাড়া ভাগাড়ের মরা গরু-মহিষের চামড়া ছাড়াইয়া পূর্ব্বে সে চামড়া-ব্যবসায়ী সেখেদের বিক্রয় করিত। আপদে-বিপদে তাহারাই দু'চারি টাকা দাদন-স্বরূপ দিত। কিন্তু সম্প্রতি জমিদার ভাগাড় বন্দোবস্ত করায় এ দিকের আয় তাহার অনেক কমিয়া গিয়াছে। নেহাৎ পারিশ্রমিক অর্থাৎ তিন-চার আনা মজুরি ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। ইহা লইয়া চামড়াওয়ালার সঙ্গে মনান্তরও হইয়াছে। সে কি আর এ সময় সাহায্য করিবে? যে ভদ্র লোকের জমি ভাগে চাষ করে, সে কিছু দিলেও দিতে পারে; কিন্তু ভদ্রলোক খৎ না লেখাইয়া কিছু দিবে

না। সেও অনেক হাঙ্গামার ব্যাপার। খৎকে পাতুর বড় ভয়। শেষ পর্য্যন্ত নালিশ করিয়া বাড়ীটা লইয়া বসিলে সে কোথায় যাইবে? পৃথিবীর মধ্যে তাহার সম্পত্তি এই বাড়ীটুকু।

আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে পাতু দ্রুতগতিতে ছাই জড় করিয়া চলিয়াছিল। ছিরুপালের কাছে সেদিন মার খাইয়া তাহার মনে যে উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—সে উত্তেজনা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সেই উত্তেজনাবশেই সেদিন অমরকুণ্ডার মাঠে দ্বারকা চৌধুরীর কাছে ছিরুপাল সম্পর্কে আপনার সহোদরা দুর্গার যে কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়াছিল, জমিদারের কাছেও সেই কথা প্রকাশ করিয়া নালিশ করিয়াছিল। তাহা লইয়া গত সন্ধ্যায় স্বজাতির মধ্যে তাহার যথেষ্ট লাঞ্ছনা হইয়াছে। স্বজাতিরা কথাটা লইয়া ঘোঁট পাকাইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—তুমি তো আপন মুখেই এই কেলেঙ্কারীর কথা চৌধুরী মশায়ের কাছে ব'লেছ, জমিদারের কাছারিতে বলেছ। ব'লেছ কি না?

—হ্যাঁ, বলেছি।

—তবে? তুমি পতিত হবে না কেন, তা বল!

কথাটা পাতুর ইহার পুর্ব্বে খেয়াল হয় নাই। সে চমকিয়া উঠিয়াছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে হন্ হন্ করিয়া বাড়ী গিয়া দুর্গার চুলের মুঠি ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া তাহাকে মজলিসের সম্মুখে হাজির করিয়াছিল। ধাক্কা দিয়া দুর্গাকে মাটির উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়াছিল—সে কথা এই হারামজাদী ছেনাল্‌কে শুদোও। ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী; আমি ওর সঙ্গে পেথকান্ন।

দুর্গার পিছনে পিছনে তাহার মা চীৎকার করিতে করিতে আসিয়াছিল; সকলের পিছনে পাতুর বিড়ালীর মত বউটাও গুন্ গুন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছিল। তারপর সে এক চরম অশ্লীল

বাক্‌-বিতণ্ডা। স্বৈরিণী দুর্গা উচ্চকণ্ঠে পাড়ার প্রত্যেক মেয়ের কু-কীর্ত্তির গুপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিয়া পাতুর মুখের ওপর সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছিল—ঘর আমার, আমি নিজের রোজকারে ক'রেছি, আমার খুসি যার ওপর হবে—সে-ই আমার বাড়ী আসবে। তোর কি? তাতে তোর কি? তু আমাকে খেতে দিস, না, দিবি? আপন পরিবারকে সাম্‌লাস তু।

পাতু আরও ঘা-কতক লাগাইয়া দিয়াছিল। পাতুর বউটি ঘোমটার ভিতর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ননদকে গাল দিতে সুরু করিয়াছিল। মজলিসের উত্তাপের মধ্যে উত্তেজিত কলরব হাতাহাতির সীমানায় বোধ করি গিয়া পৌঁছিয়াছিল—ঠিক এই সময়েই আগুন জ্বলিয়া উঠে।...

এই দুই দিনের উত্তেজনা, তাহার উপর এই অগ্নিদাহের ফলে গৃহহীনতার অপরিমেয় দুঃখ তাহাকে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির মত করিয়া তুলিয়াছিল। সে নীরবেই কাজ করিতেছিল, এমন সময় তাহার বউএর ছিচকান্না তাহার কানে গেল। সে এতক্ষণে ছাগল-গরুগুলিকে অদূরবর্ত্তী খেজুর-গাছগুলার গোড়ায় খোঁটা পুঁতিয়া বাঁধিয়া হাঁসগুলিকে নিকটবর্ত্তী পুকুরের জলে নামাইয়া দিয়া, স্বামীর কাজে সাহায্য করিতে আসিয়াছে। জড়-করা ছাই ঝুড়িতে পুরিয়া সে সার-গাদায় ফেলিতে আরম্ভ করিল। পাতু হিংস্র জানোয়ারের মত দাঁত বাহির করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল—এ্যাই দেখ, মিহি-গলায় আর ঢং ক'রে কঁদিস না ব'লছি। মেরে হাড় ভেঙে দোব—হাঁ।

ঘর পুড়িয়া যাওয়ার দুঃখে এবং সমস্ত রাত্রি কষ্টভোগের ফলে পাতুর বউয়ের মেজাজও খুব ভাল ছিল না, সে বনবিড়ালীর মত হিংস্র ভঙ্গিতে ফ্যাঁস্‌ করিয়া উঠিল—ক্যানে, ক্যানে আমার হাড় ভেঙে দিবি শুনি? বলে—'দরবারে হেরে, মাগকে মারে ধ'রে'—

সেই বিত্তান্ত। নিজের ছেনাল বোনকে কিছু ব'লবার ক্ষেমতা নাই—

পাতুর আর সহ্য হইল না, সে বাঘের মত লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া গলা টিপিয়া ধরিল। তাহার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান তখন লোপ পাইয়া গিয়াছে।

পাতুর ঘরের সম্মুখেই—একই উঠানের ওপাশে দুর্গা ও তাহার মায়ের ঘর। তাহারাও ঘরের ছাই পরিষ্কার করিতেছিল। বউয়ের কথা শুনিয়া দুর্গা দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু পাতুর নির্য্যাতন-ব্যবস্থা দেখিয়া বউকে শাসন করিল না, বিজ্ঞভাবে ভাইকেই বলিল—হ্যাঁ, বউকে একটুকুন শাসন কর, মাথায় তুলিস না!

সেই মুহূর্ত্তেই জগন ডাক্তারের ধরা-গলা শোনা গেল, সে হাঁ হাঁ করিয়া বলিল—ছাড়্ ছাড়্ হারামজাদা বায়েন, মরে যাবে যে।

কথা বলিতে বলিতে ডাক্তার আসিয়া পাতুর চুলের মুঠি ধরিয়া আকর্ষণ করিল। পাতু বউকে ছাড়িয়া দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—দেখেন দেখি হারামজাদীর আস্পদ্দা, ঘরে আগুন টাগুন লাগিয়ে—

—জল আন্, জল। জলদি, হারামজাদা গোঁয়ার—বলিয়া জগন হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল। বউটা অচেতন হইয়া অসাড়ের মত পড়িয়া আছে। ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া নাড়ী ধরিল।

পাতু এবার শঙ্কিত হইয়া ঝুঁকিয়া বউয়ের মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওগো, আমি বউকে মেরে ফেললাম গো।

পাতুর মা সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে বাবা, কি ক'রলি রে!

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওরে জল—জল, শীগ্‌গির জল আন্‌।

ছুটিয়া জল লইয়া আসিল দুর্গা। সে বউয়ের মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিয়া বুকে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল; ডাক্তার ছপাছপ জলের ছিটা দিয়া বলিল—কই, মুখে মুখ দিয়া ফুঁ দে দেখি দুগ্‌গা!

কিন্তু ফুঁ আর দিতে হইল না, বউ আপনিই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল। কিছুক্ষণ পর সে উঠিয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—আমাকে আর কারুর মেমতা করতে হবে না রে, সংসারে আমার কেউ নাই রে!....গলা তাহার ধরিয়া গিয়াছে, আওয়াজ বাহির হয় না, তবু সে প্রাণপণে চীৎকার আরম্ভ করিল।

* * * *

জগন ডাক্তার কতকগুলি ঘর পুড়িয়াছে গণনা করিয়া নোটবুকে লিখিয়া লইল; কতগুলি মানুষ বিপন্ন তাহাও লিখিয়া লইল। খবরের কাগজে পাঠাইতে হইবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা আবেদনের খসড়া সে ইতিমধ্যেই করিয়া ফেলিয়াছে। স্থানীয় চার-পাঁচখানা গ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া খড়, বাঁশ, চাল, পুরানো কাপড়, অর্থ সংগ্রহের জন্য একটা সাহায্য সমিতি গঠনের সঙ্কল্পও তাহার আছে। সকলকে ডাকিয়া ডাক্তার বলিল—সব আপন আপন মনিবের কাছে যা, গিয়ে বল—দু'টো করে বাঁশ, দশ গণ্ডা ক'রে খড়, পাঁচ-সাত দিনের মত খোরাকি আমাদের দিতে হবে। আর যা লাগবে—চেয়ে-চিন্তে আমি যোগাড় ক'রছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে একটা দরখাস্ত দিতে হবে—আমি লিখে রাখছি, ও-বেলায় গিয়ে সব টিপসই দিয়ে আসবি।

সকলে চুপ করিয়া রহিল, ম্যাজিস্ট্রেটের নামে তাহারা ভড়্‌কাইয়া গিয়াছে। সাহেব-সুবাকে ইহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বলিয়াই জানে।

কনেস্টবল-দারোগার উপরওয়ালা হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটের নামে পর্য্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠে। তাহার কাছে দরখাস্ত পাঠাইয়া আবার কোন্ ফ্যাসাদ বাধিবে কে জানে!

জগন বলিল—বুঝলি আমার কথা? চুপ ক'রে রইলি যে সব!

এবার সতীশ বাউড়ি বলিল—আজ্ঞে সায়েবের কাছে—

—হ্যাঁ, সায়েবের কাছে।

—শেষে আবার কি-না-কি ফ্যাসাদ হবে মশায়!

—ফ্যাসাদ কিসের রে? জেলার কর্ত্তা, প্রজার সুখদুঃখের ভার তাঁর ওপর। দুঃখের কথা জানালেই তাঁকে সাহায্য করতে হবে।

—আজ্ঞে, উ মশায়—

—উ আবার কি?

—আজ্ঞে, কনেস্টবল-দারোগা-থানা-পুলিশ টানা-হ্যাঁচড়-কৈফেৎ—সে মশায় হাজার হাঙ্গাম!

ডাক্তার এবার ভীষণ চটিয়া গেল, তাহার কথার প্রতিবাদ করিলে সে চটিয়া যায়। তাহার উপর এই লোক-হিতৈষণা উপলক্ষ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত পরিচিত হওয়ার একটা প্রবল বাসনা তাহার ছিল। স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার অনেক দিনের; কেবলমাত্র মান-মর্য্যাদা লাভের জন্যই নয়, দেশের কাজ করিবার আকাঙ্ক্ষাও তাহার আছে। কিন্তু কঙ্কণার বাবুরাই ইউনিয়ন বোর্ডের সমস্ত সভ্যপদগুলি দখল করিয়া রহিয়াছে! ইউনিয়নের সমস্ত গ্রামগুলিই কঙ্কণার বিভিন্ন বাবুদের জমিদারি। গতবার জগন ঘোষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়া মাত্র তিনটি ভোট পাইয়াছিল। সরকার তরফ হইতে মনোনীত সভ্যপদগুলিও কঙ্কণার বাবুদের একচেটিয়া। সাহেব-সুবা উহাদেরই চেনে, কঙ্কণাতেই তাঁহাদের যাওয়া-আসা; সভ্য-মনোনয়নের সময় তাঁহাদের দরখাস্ত-

গুলিই মঞ্জুর হইয়া যায়। এই কারণে এমন একটি পরিহিত-ব্রতের ছুতা লইয়া সাহেবের সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্পটি ডাক্তারের বহু আকাঙ্ক্ষিত এবং পরমকাম্য। সেই সঙ্কল্প-পূরণের পথে বাধা পাইয়া ডাক্তার ভীষণ চটিয়া উঠিল। বলিল—তবে মর্-গে তোরা, প'চে মর্ গে! হারামজাদা মুখ্যুর দল সব।

—কি, হ'ল কি ডাক্তার?—বলিয়া ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী পিছনের গাছপালার আড়াল অতিক্রম করিয়া সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চৌধুরী ইহাদের এই আকস্মিক বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আসিয়াছেন। এ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রবর্ত্তিত কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য চৌধুরী আজও যথাসাধ্য পালন করেন। ব্যবস্থাটার মধ্যে দয়ারই প্রাধান্য, কিন্তু প্রেমও খানিকটা আছে।

ডাক্তার, চৌধুরীকে দেখিয়া বলিল—দেখুন না, বেটাদের মুখ্যুমি। বলছি ম্যাজিস্ট্রেট সায়েবের কাছে একটা দরখাস্ত কর্। তা বলছে কি জানেন? বলছে—থানা-পুলিশ-দারোগা—বেজায় হাঙ্গামা।

চৌধুরী বলিলেন—এর জন্যে আর সায়েব-সুবো কেন ভাই? গাঁয়ের পাঁচ জনের কাছ থেকেই তো ওদের কাজ হয়ে যাবে। আমি ওদের প্রত্যেককে দু'গণ্ডা ক'রে খড় দোব, পাঁচটা বাঁশ দোব; এমনি ক'রে—

ডাক্তর আর শুনিল না, হন্ হন্ করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—যাস্ বেটারা এর পর আমার কাছে।....আরও কিছুদূর আসিয়া দাঁড়াইয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—কাল রাত্রে কে কোথায় ছিল রে? কাল রাত্রে?

চৌধুরী একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—তা' দরখাস্ত করতেই বা দোষ কি বাবা সতীশ? ডাক্তার বলছে। আর সায়েবের যদি দয়াই

হয়—সে তো তোমাদেরই মঙ্গল! তাই বরং তোমরা যেও ডাক্তারের কাছে।

সতীশ বলিল—হাঙ্গাম কিছু হবে না তো চৌধুরী মশায়? আমাদের সব সেই ভয় লাগছে কিনা।

ভয় কি?—হাঙ্গামা কিছু হবে ব'লে তো মনে নেয় না বাবা! না—না—হাঙ্গামা কিছু হবে না…

অপরাহ্ণে সকলে দল বাঁধিয়া ডাক্তারের কাছে হাজির হইল। আসিল না কেবল পাতু।

ডাক্তার খুসী হইয়া উঠিয়াছিল; সে বেশ করিয়া সকলকে দেখিয়া লইয়া বলিল—পাতু কই, পাতু?

সতীশ বলিল—পাতু আজ্ঞে আসবে না। সে মশাই গাঁয়েই থাকবে না ব'লছে।

—গাঁয়েই থাকবে না? কেন, এত রাগ কেন রে?

—সে মশায় সে-ই জানে। সে আপনার উ-পারে জংসনে গিয়ে থাকবে। বলে যেখেনে খাটব সেইখানেই ভাত!

—দেবোত্তরের জমি ভোগ করে যে!

—জমি ছেড়ে দেবে মশায়। বলে—ওতে পেটই ভরে না, তা উ কি হবেক! উ-সব বড়নোকের কথা ছেড়ে দেন। পাতু বায়েন আমাদের বড়নোক। উকিল-ব্যালেস্টারের সামিল।

—আহা তাই হোক্। সে বড়নোকই হোক্। তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক।….দলের পিছনে ছিল দুর্গা, সে ফোঁস্ করিয়া উঠিল। তারপর বলিল—সে যদি উঠেই যায় গাঁ থেকে, তাতে নোকের কি শুনি? উকিল ব্যালেস্টার—সাত-সতেরো ক্যানে শুনি? সে যদি চ'লেই যায়—তাতে তো ভাল হবে তোদেরই। ভিক্ষের ভাগ তোদের মোটা হবে।

জগন ডাক্তার ধমক দিয়া উঠিল—থাম্ থাম্ দুর্গা।

—ক্যানে, থামবে ক্যানে? কিসের লেগে? এত কথা কিসের?—বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া আপনার পাড়ার দিকে পথ ধরিল।

—ওই! এই দুর্গা, টিপ-সই দিয়ে যা!

—না।

—তা হ'লে কিন্তু সরকারী টাকার কিছুই পাবি না তুই।

এবার ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ মচ্‌কাইয়া বলিল—আমি টিপ-সই দিতে আসি নাই গো। তোমার তালগাছ বিক্রী আছে শুনে এসেছিলাম কিনতে। গতর থাকৃতে ভিখ মাঙ্‌ব ক্যানে? গলায় দড়ি···

সে আবার মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া আপন মনেই পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

পথে বাঁশ-জঙ্গলে ঘেরা পাল-পুকুরের কোণে আসিয়া দুর্গা দেখিল, বাঁশ-বনের আড়ালে শ্রীহরি পাল দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গা হাসিয়া দুই হাত দিয়া পরিমাণ দেখাইয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—টাকা চাই। এতগুলি! ঘর করব। বুঝ্‌ছ?

শ্রীহরি কথাটা গ্রাহ্য করিল না, প্রশ্ন করিল—কিসের দরখাস্ত হচ্ছে রে?

—ম্যাজিস্টের সায়েবের কাছে। ঘর পুড়ে গিয়েছে—তাই।

—তাই আমাকে সুবে ক'য়ে দরখাস্ত করেছে বুঝি শালা ডাক্তার? শালাকে।·· শ্রীহরির মুখখানা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল।

দুর্গা গম্ভীরমুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ছিরুর দিকে চাহিয়াই অপরাধীকে চিনিয়া ফেলিল; হ্যাঁ গা, তুমিইতো দিয়েছ আগুন!

—কে ব'ললে দিয়েছি। তুই দেখেছিস?

—ঠাকুর ঘরে কে-রে? না-আমি চুরি করি নাই! হ্যাঁ, দেখেছি বৈকি আমি।

—চুপ্ কর, এতগুলো টাকাই দোব আমি।

দুর্গা আর উত্তর করিল না। ঠোঁট বাঁকাইয়া বিচিত্র দৃষ্টিতে শ্রীহরির দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া দেখিয়া আপন পথে চলিয়া গেল। দন্তহীন মুখে হাসিয়া ছিরু তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

আট

দুর্গা বেশ সুশ্রী সুগঠন মেয়ে। তাহার দেহবর্ণ পর্য্যন্ত গৌর, যাহা তাহাদের স্বজাতির পক্ষে যেমন দুর্লভ, তেমনি আকস্মিক ইহার উপর দুর্গার রূপের মধ্যে এমন একটা সুলভ মাদকতা আছে, যাহা সাধারণতঃ মানুষের মনকে মুগ্ধ করে—দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করে।

পাতু নিজেই দ্বারকা চৌধুরীকে বলিয়াছিল—আমার মা-হারাম-জাদীকে তো জানেন? হারামজাদীর স্বভাব আর গেল না।....দুর্গার রূপের আকস্মিকতা পাতুর মায়ের সেই স্বভাবের জীবন্ত প্রমাণ।

এই স্বভাব দমনের জন্য কোন কঠোর শাস্তি বা পরিবর্ত্তনের জন্য কোন আদর্শের সংস্কার ইহাদের সমাজে নাই। অল্পস্বল্প উচ্ছৃঙ্খলতা স্বামীরা পর্য্যন্ত দেখিয়াও দেখে নাই। বিশেষ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত যদি উচ্চবর্ণের স্বচ্ছল অবস্থার পুরুষ জড়িত থাকে। কিন্তু দুর্গার উচ্ছৃঙ্খলতা সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সে দুরন্ত স্বেচ্ছাচারিণী—ঊর্দ্ধ অধঃর কোন সীমাকেই অতিক্রম করিতে তাহার দ্বিধা নাই। নিশীথ রাত্রে সে কঙ্কণার জমিদারের প্রমোদ-ভবনে যায়, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সে জানে; লোকে বলে দারোগা, হাকিম পর্য্যন্ত তাহার অপরিচিত নয়। সেদিন ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মুখার্জ্জী সাহেবের সহিত সে গভীর-

রাত্রে পরিচর্য্যা করিয়া আসিয়াছে, দফাদার শরীর রক্ষীর মত সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল। দুর্গা ইহাতে অহঙ্কার বোধ করে নিজেকে স্বজাতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে; নিজের কলঙ্ক সে গোপন করে না। এ স্বভাবের জন্ম লোকে দায়ী করে তাহার মাকে। তাহার মা নাকি কন্যাকে স্বামী পরিত্যাগ করাইয়া এই পথ দেখাইয়া দিয়াছে। কিন্তু দায়ী তাহার মা নয়। তাহার বিবাহ হইয়াছিল কঙ্কণায়। দুর্গার শাশুড়ী কঙ্কণার এক বাবুর বাড়ীতে ঝাড়ুদারণীর কাজ করিত। একদিন শাশুড়ীর অসুখ করিয়াছিল—দুর্গা গিয়াছিল শাশুড়ীর কাজে। বাবুর বাড়ীর চাকরটা সকল কাজের শেষে তাহাকে ধমক দিয়া বাবুর বাগান-বাড়ী ঝাঁট দিবার জন্য একটা নির্জ্জন ঘরে ঢুকাইয়া দিল। ঘরে ছিল বাবু; সন্ত্রস্ত হইয়া দুর্গা ঘোমটা টানিয়া দরজার দিকে ফিরিল, কিন্তু একি? এ যে—বাহির হইতে দরজা বন্ধ!…

ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ী ফিরিল সে—কাপড়ের খুঁটে বাঁধা পাঁচ টাকার একখানা নোট লইয়া। আতঙ্কে, অশান্তিতে ও গ্লানিতে এবং সেই সঙ্গে বাবুর দুর্লভ অনুগ্রহ ও অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে—সেই পথেই সে পলাইয়া আসিয়াছিল মায়ের কাছে। সব শুনিয়া মায়ের চোখে বিচিত্র দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—একটা উজ্জ্বল আলোকিত পথ সহসা যেন তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল,—সেই পথ সে কন্যাকে দেখাইয়া দিল। তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে।

ছিরু পালের সহিত দুর্গার একান্তভাবে ব্যবসায়ের সম্বন্ধ। তাহার প্রতি এতটুকু কোমলতা কোনদিন তাহার ছিল না। আজ তাহার প্রতি দুর্গার দারুণ ঘৃণা ও আক্রোশ জন্মিয়া গেল। পাতুর সহিত তাহার যতই বিরোধ থাক, জাতি-জ্ঞাতিদের যতই সে হীন ভাবুক—

আজ তাহাদের জন্ত সে মমতাই অনুভব করিল। সারাপথ সে কেবলি ভাবিতে লাগিল—ছিরু পালের মদের সঙ্গে গরু-মারা বিষ মিশাইয়া দিলে কেমন হয়?...

—ডাক্তার কি বল্‌লে, গাছ বেচবে?—প্রশ্ন করিল দুর্গার মা।.... চিন্তা করিতে করিতে দুর্গা কখন আসিয়া বাড়ী পৌঁছিয়াছে—খেয়াল ছিল না।

সচকিত হইয়া দুর্গা উত্তর দিল—না।

—বেচবে না?

—জিজ্ঞাসা করি নাই।

—মরণ! গেলি ক্যানে তবে ঢং করে?

দুর্গা একবার কেবল তীব্র তীর্য্যগ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল, কথার কোন জবাব দিল না।

কন্যার দেহবিক্রয়ের অর্থে মা এখন বাঁচিয়া আছে,—দুর্গার চোখের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি দেখিয়া মা সঙ্কুচিত হইয়া চুপ করিল; কিছুক্ষণ পর আবার সে বলিল—হামুদু শ্যাখ পাইকার এসেছিল।

দুর্গা এবারও কথার উত্তর দিল না।

মা আবার বলিল—আবার আসবে, ধর্ম্মরাজতলায় পাড়ার নোকের সঙ্গে কথা কইছে।

দুর্গা এবার বলিল—ক্যানে? কি দরকার তার? আমি বেচব না গরু-ছাগল।... দুর্গার একপাল ছাগল আছে, কয়েকটা গাই এবং একটা বলদ-বাছুরও আছে। অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া সেখ নিজেই ছুটিয়া এ-পাড়ায় আসিয়াছে। এই পাড়ায় সে ছাগল-গরু কেনে; প্রয়োজন হইলে চার আনা আট আনা হইতে দু'চার টাকা পর্য্যন্ত অগ্রিমও দেয়। পরে ছাগল-গরু লইয়া টাকাটা সুদ সমেত শোধ

লইয়া থাকে। আজও সে আসিয়াছে ছাগল-গরু কিনিতে, দু'একজনকে অগ্রিমও দিবে! এত বড় বিপদের এই দারুণ প্রয়োজনের সময়—হামদু কর্জ্জ করিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছে। দুর্গার পালিত বলদ-বাছুরটার জন্য হামদু অনেকবার তোষামোদ করিয়াছে, কিন্তু দুর্গা বেচে নাই। আজ সে আবার আসিয়াছে এবং দুর্গার মাকে গোপনে চার আনা পয়সাও দিয়াছে। সওদা হইলে, পশ্চিম মুখে দাঁড়াইয়া আরও চার আনা দিবার প্রতিশ্রুতি হামদু দিয়াছে। মেয়ের কথাটা মায়ের মোটেই ভাল লাগিল না—খানিকটা ঝাঁঝ দিয়া বলিল—বেচবি না তো, ঘর কিসে হবে শুনি?

—তোর বাবা টাকা দেবে, বুঝলি হারামজাদী! আমি আমার শাঁখাবাঁধা বেচব।....দুর্গা দুই-চারিখানা সোনার গহনাও গড়াইয়াছে; অত্যন্ত সামান্য অবশ্য, কিন্তু তাহাই ইহাদের পক্ষে স্বপ্ন-সাফল্যের কথা।

দুর্গার মা এবার বিস্ফোরক বস্তুর মত ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। কিন্তু দুর্গা তাহাতে দমিবার মেয়ে নয়, সে জিজ্ঞাসা করিল—ক'আনা নিয়েছিস হামদু স্যাখের কাছে? আমি কিছু বুঝি না মনে করেছিস? ধান-চালের ভাত আমি খাই না, লয়?

বিস্ফোরণের মুখেই দুর্গার মা প্রচণ্ড বর্ষণে যেন ভিজিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। সে অকস্মাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিল, প্যাটের মেয়ে হ'য়ে তু এতবড় কথা আমকে বললি!

দুর্গা গ্রাহ্য করিল না, বলিল—থাক্, ঢের হয়েছে। এখন দাদা কোথা গেল বল্‌তে পারিস্? বউটাই বা গেল কোথা?

মা আপন মনেই কাঁদিতে আরম্ভ করিল, দুর্গার প্রশ্নের উত্তর তাহারই মধ্যে ছিল—গভ্যে আমার আগুন ধরিয়া দিতে হয় রে! বেকনে আমার পাথর মারতে হয়! জ্যান্তে আমাকে দগ্ধে দগ্ধে

মারলে রে! যেমন বেটা, তেমুনি বিটী। বিটী বল্‌ছে চোর। আর বেটা হ'ল ছ্যাশের বার! ছ্যাশের লোকে তালপাতা কেটে আপন আপন ঘর ঢাকলে, আর আমার বেটা গাঁ ছেড়ে চললো। মরুক, মরুক ড্যাকরা—এই অঘ্রাণের শীতে সান্নিপাতিকে মরুক।

অত্যন্ত রূঢ়স্বরে দুর্গা বলিল—বলি, রান্না-বান্না করবি, না প্যান-প্যান ক'রে কাঁদবি? পিণ্ডি গিল্‌তে হবে না?

—না, মা, আর পিণ্ডি গিলব না মা, তার চেয়ে গলায় দড়ি দোব আমি!··· দুর্গার মা বিনাইয়া বিনাইয়া জবাব দিল।

দুর্গা মুখে কিছু বলিল না, উঠিয়া ঘরের ভিতর হইতে একগাছা গরু-বাঁধা দড়ি লইয়া মায়ের কোলের কাছে ফেলিয়া দিল গলায় দিবার জন্যই; তারপর সে পাড়ার মধ্যে চ'লিয়া গেল আগুনের সন্ধানে।

হরিজন-পল্লীর মজলিসের স্থান—ওই ধর্ম্মরাজের বকুলগাছতলা। বহুদিনের প্রাচীন বকুলগাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল; কাণ্ডটির অনেকাংশ শূন্যগর্ভ এবং বহুকাল পূর্ব্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অর্দ্ধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্ম্মরাজের আশ্চর্য্য মহিমা। এমন শায়িত অবস্থায় কোথায় কোন্ গাছকে কে জীবিত দেখিয়াছে? গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া; মানত করিয়া লোকে ধর্ম্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়। আশপাশের ছায়াবৃত স্থানটি পরিচ্ছন্ন তক্-তক্ করিতেছে। পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়; সেই মাড়ুলীগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া—গোটা স্থানটাই নিকানো হয়। হামদু সেখ সেইখানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরু-ছাগল সওদার দরদস্তর করিতেছিল; পাঁচ-সাতটা ছাগল—দুইটা গরু অদূরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; সেগুলি কিনা হইয়া গিয়াছে।

পুরুষেরা সকলেই গিয়াছে জগন ডাক্তারের ওখানে। হাম্‌দুর কারবার চলিতেছিল মেয়েদের সঙ্গে। মেয়েরা কেহ মাসী, কেহ পিসী, কেহ দিদি, কেহ চাচী, কেহ বা ভাবী! হাম্‌দু একটা খাসী লইয়া এক বাউড়ী ভাবীর সঙ্গে দর করিতেছিল—ইয়ার কি আছে, তুই বল্ ভাবী; সেরেফ্ খালটা আর হাড় ক'খানা। পাঁচ স্যার গোস্তও হবে না ইয়াতে। জোর স্যার তিনেক হবে। ইয়ার দাম পাঁচ সিকা বলেছি—কি অন্যায় বলেছি বল্? পাঁচজনা তো র'য়েছে —বলুক পাঁচজনায়। আর এই অসময়ে লিবে কে বল্? গরজ এখন তুর, না, গরজ পরের, তু বুঝ কেনে!...বলিতে বলিতেই সে চীৎকার করিয়া ডাকিল—ও দুগ্‌গা দিদি, শুন্ গো শুন্। তোর বাড়ী পাঁচবার গেলাম। শুন্—শুন্!

দুর্গা আগুনের সন্ধানে পাড়ায় বাহির হইয়াছিল, সে দূর হইতেই বলিল—বেচব না আমি।

—আরে না বেচিস, শুন্—শুন্। তুকে বেচতে আমি বলি নাই।

—কি বল্‌ছ বল?...দুর্গা ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

—আরে বাপ্‌রে! দিদি যে একেবারে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আলি গো।

—তাই বটে। ফিরে গিয়ে আমাকে রাঁধতে হবে। কি বলছ, বল?

—ভাল কথাই বলছি ভাই; বলছি ঘরে টিন দিবি? সন্ধানে আমার সস্তায় টিন আছে।

—টিন?

—হ্যাঁ গো! একরারে লতুন। কলওয়ালারা বেচবে, কিনবি? একেবারে নিশ্চিন্তি! দেখ্। গোটা চাল্লিশ টাকা।

দুর্গা কয়েক মুহূর্ত ভাবিল। মনশ্চক্ষে দেখিল—তাহার ঘরের

উপর টিনের আচ্ছাদন—রোদের ছটায় রূপার পাতের মত ঝকমক্‌ করিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—উঁহু! না।

—তুর টাকা না থাকে, আমাকে ইয়ার পরে দিস। ছ'মাস, এক বছর পরে দিস্‌!

দুর্গা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু! ও বলদের নামে তুমি হাত ধোও, হাম্‌দু ভাই। ও আমি এখন দু'বছর বেচব না।—বলিয়া দেহের একটা দোলা দিয়ে চলিয়া গেল।....

আগুন লইয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল—দড়িগাছটা সেইখানেই পড়িয়া আছে, মা সেটা স্পর্শও করে নাই। উনানে আগুন দিয়া এখন সে পাতুর সঙ্গে বচসায় নিযুক্ত। বড় দুই বোঝা তালপাতা উঠানে ফেলিয়া পাতু হাঁপাইতেছে এবং মায়ের দিকে ক্রুদ্ধ বাঘের মত চাহিয়া আছে। পাতুর বউ কাঠকুঠা কুড়াইয়া জড় করিতেছে, রান্না চড়াইবে!

দুর্গা বিনা ভূমিকায় বলিল—বউ, রান্না আর করতে হবে না। আমিই রাঁধছি, একসঙ্গেই খাব সব।

পাতু দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল—দেখ দুগ্‌গা, দেখ্‌! মায়ের মুখ দেখ্‌! যা মন রায় তাই বল্‌ছে! ভাল হবে না কিন্তুক!

—তা আমিই বা কি করব বল্‌? এতক্ষণ আমার সঙ্গেই হচ্ছিল। মা! গভ্ভো ধ'রেছে! তাড়িয়ে দিতে লারবি, খুন করতেও লারবি।

—একশো বার। তোর কথার কাটান্‌ নাই। কিন্তুক, ই গাঁয়ে থাকব কি সুখে—তুই বল্‌ দেখি?

—সত্যিই তু উঠে যাবি নাকি? হ্যাঁ দাদা? ভিটে ছেড়ে উঠে যাবি?

পাতু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—তাতেই তো আবার এই অবেলাতে তালপাতা কেটে আনলাম দুগ্‌গা! নইলে—জংসনের কাল কাজ, ঘর সব ঠিক ক'রে এসেছিলাম দুপুর বেলাতে।....

দু'হাত ছাদাছাদি করিয়া তাহারই মধ্যে মাথা গুঁজিয়া পাতু মাটির দিকে বসিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—ওঠ্। ওই দেখ, ক'খানা লম্বা বাঁশ রয়েছে আমার; ওই ক'খানা চাপিয়ে—তালপাতা দিয়ে ঘরখানা ঢাক। পিতি-পুরুষের ভিটে ছেড়ে কেউ কখনও যায় নাকি? তুই চালে উঠ্, আমি আর বউ দু'জনাতে তুলে দিচ্ছি সব।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পাতু উঠিল। দুর্গা কাপড়ের আঁচল কোমরে আঁট-সাট করিয়া বাঁধিয়া বলিল—ওই গাঁদা সতীশ! সতীশ বাউড়ী রে! মিনসে—জগন ডাক্তোর্‌কে বল্‌ছে—পাতু বায়েন বড় নোক, ব্যালেস্টার, উকীল! তা আমি বললাম—আহা, তোর মুখে ফুলচন্নন্ পড়ুক! বলে—বড় নোক। গাঁ ছেড়ে উঠে চ'লে যাবে। ওরা যায় তো, তোদিগে ভিটে দানপত্তর নিখে দিয়ে যাবে! তোরা ভোগ করবি!

বিড়ালীর মত হৃষ্টপুষ্ট পাতুর বউটা খাটিতে পারে খুব, খাটো পায়ে—দ্রুতগতিতে লাটিমের মত পাক দিয়ে ফেরে। সে ইহারই মধ্যে বাঁশগুলাকে টানিয়া আনিয়া উঠানে ফেলিয়াছে।

নয়

গোটা পাড়াটা পোড়াইয়া দিবার অভিপ্রায় শ্রীহরির ছিল না। কিন্তু যখন পুড়িয়া গেলই, তখন তাহাতেও বিশেষ আফশোস তাহার হইল না। পুড়িয়াছে—বেশ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে এমন ধারার বিপর্য্যয় ঘটিলে তবে ছোটলোকের দল সায়েস্তা হয়; ক্রমশই বেটাদের আস্পর্দ্ধা বাড়িয়া চলিতেছিল। হাতের মারে কিছু হয় না, ভাতের মার—অর্থাৎ ভাতে বঞ্চিত করিতে পারিলেই মানুষ জব্দ হয়। বাঘ যে বাঘ, তাহাকে খাঁচায় পুরিয়া অনাহারে রাখিয়া মানুষ তাহাকে পোষ মানায়।...

এ সব বিষয় তাহার গুরু ছিল দুর্গাপুরের স্বনামধন্য ত্রিপুরা সিং। দুর্গাপুর এখান হইতে ক্রোশ দশেক দূর। শ্রীহরির মাতামহের বাড়ী ওই দুর্গাপুর। তাহার মাতামহ ত্রিপুরা সিংয়ের চাষবাসের তদ্বিরকারক ছিল। বাল্যকালে শ্রীহরি মাতামহের ওখানে যখন যাইত, তখন সে ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়াছে। লম্বা চওড়া দশাশয়ী চেহারা। জাতিতে রাজপুত, প্রথম বয়সে ত্রিপুরা সিং সামান্য ব্যক্তি ছিল, সম্পত্তি ছিল মাত্র কয়েক বিঘা জমি। সেই জমিতে সে পরিশ্রম করিত অসুরের মত। আর স্থানীয় জমিদারের বাড়ীতে লগদীর কাজ করিত। আরও করিত তামাকের ব্যবসা। হাতে লাঠি ও মাথায় তামাকের বোঝা লইয়া গ্রাম-গ্রামান্তরে ফেরি করিয়া বেড়াইত; ক্রমে সুরু করে মহাজনী। সেই মহাজনী হইতে প্রথমত বিশিষ্ট জোতদার,—অবশেষে তাহার মনিব জমিদারের জমিদারির খানিকটা কিনিয়া ছোট-খাটো জমিদার পর্য্যন্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরা সিংয়ের দাড়ি ছিল বড় সখের দাড়ি, সেই দাড়িতে গালপাট্টা বাঁধিয়া গোঁফে পাক

দিতে দিতে সে বলিত,—শ্রীহরি নিজ কর্ণে শুনিয়াছে—এই গাঁ আমি তিনবার পুড়িয়েছি, তবে বেটারা আমাকে আমল দিয়েছে।

হা-হা করিয়া হাসিয়া সিং বলিত—এক একবার ঘর পুড়েছে, আর বেটারা কর্জ্জ নিয়েছে। যে বেটা প্রথম বারে কায়দা হয় নাই—সে দু'বারে হয়েছে, দু'বারেও যারা বাকী ছিল, তারা তিন বারের বার এসে গড়িয়ে পড়েছে....এই সব কথা বলিতে তাহার এতটুকু দ্বিধা হইত না। বলিত—বড় বড় জমিদারের কুষ্ঠি-ঠিকুজী নিয়ে এস, দেখবে সবাই ওই ক'রেছে। আমার ঠাকুরদা ছিল রত্নগড়ের জমিদার বাড়ীর পোষা ডাকাত। বাবুদের ডাকাতি ছিল ব্যবসা। সীতানগরের চাটুজ্জে বাবুরা সে দিন পর্য্যন্ত ডাকাতির বামাল-সামাল দিয়েছে।

সিং নিজে যে কথাগুলি বলে নাই অথবা সিংয়ের মুখ হইতে ইতিহাসের যে অংশ শুনিবার শ্রীহরির সুযোগ-সৌভাগ্য ঘটে নাই, সে অংশ শ্রীহরিকে শুনাইয়াছে তাহার মাতামহ। রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ নাতিকে সেই সব অতীতের কথা বলিত। ত্রিপুরা সিংয়ের শক্তির কাহিনী সে একেবারে রূপকথার মত;—ত্রিপুরা সিংয়ের জমির পাশেই ছিল বহুবল্লভ পালের একখানা আওউল জমি—কাঠা-দশেক তাহার পরিমাণ। সিং, ওই জমিটুকুর জন্য, একশো টাকা পর্য্যন্ত দাম দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বহুবল্লভের দুর্ম্মতি, অতিরিক্ত মায়া! সে কিছুতেই দেয় নাই! শেষ বর্ষার সময় একদিন রাত্রে সিং নিজে একা কোদাল চালাইয়া দুইখানা জমিকে কাটিয়া আকারে-প্রকারে এমন এক অখণ্ড বস্তু করিয়া তুলিল যে, পরদিন বহুবল্লভ নিজেই ধরিতে পারিল না, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোথায় কোন্‌খানে ছিল তাহার জমির সীমানার চারিটা কোণ। বহুবল্লভ মামলা করিয়াছিল। কিন্তু মামলাতে বহুবল্লভ তো পরাজিত হইলই —উপরন্তু কয়েকদিন পর বহুবল্লভের তরুণী-পত্নী ঘাটে জল আনিতে

গিয়া আর ফিরিল না। ঘাটের পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে কে বা কাহারা তাহাকে মুখে কাপড় বাঁধিয়া কাঁদে তুলিয়া লইয়া গেল।

বৃদ্ধ চুপি চুপি বলিত—মেয়েটা এখন বুড়ো হয়েছে, সিংজীর বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে। একটা নয়, এমন মেয়ে সিংজীর বাড়ীতে পাঁচ-সাতটা।

ত্রিপুরা সিংহের বিষয়বুদ্ধি, দূরদৃষ্টির বিষয়েও বৃদ্ধ আমলার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। বলিত—সিংজী লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ, বিষয়বুদ্ধি কি! জমিদারের বাড়ীতে লগ্দীগিরি করতে করতেই বুঝেছিল—এ বাড়ীর আর প্রতুল নাই। লাটের খাজনা মহল থেকে আসে; কিন্তু খাজনা দাখিলের সময় আর থাকে না। সিংজী তখন নিজে টাকা ধার দিতে লাগল। যখন যা দরকার হয়েছে, 'না' বলে নাই; নিজের কাছে না থাকলে আট আনা সুদে কর্জ্জ ক'রে এনে একটাকা সুদে বাবুদিগে দিয়েছে। তারপর সুদে-আসলে ধার হ্যাণ্ডনোট পাল্‌টে পাল্‌টে শেষে-মেশ যখন চেপে ধরলে টাকার লেগে, তখন বাবুদের জমিদারিই ঘরে ঢুকল। ক্ষণজন্মা লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ!...বলিয়া সে তাহার মনিবের উদ্দেশে প্রণাম করিল।...

শ্রীহরির বাপ ছিল কৃতী-চাষী। দৈহিক পরিশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পতিত জমি ভাঙিয়া উৎকৃষ্ট জমি তৈয়ারী করিয়াছিল। শ্রম ও সঞ্চয় করিয়া বাড়ীর উঠানটি ধানের মরাইয়ে মরাইয়ে একটি মনোরম শ্রীভবনে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল। বাপের মৃত্যুর পর শ্রীহরি যখন এই সম্পদ হাতে পাইল—তখন তাহার মনে পড়িল, মাতামহের স্বনামধন্য মনিব ত্রিপুরা সিংকে। মনে মনে তাহাকেই আদর্শ করিয়া সে জীবন-পথে যাত্রা সুরু করিল। পরিশ্রমে তাহার এতটুকু [illegible]ণ্য নাই; তাহার বিনিময়ে ফসলও প্রচুর [illegible] ফসল সে বাপের মত কেবল বাঁধিয়াই রাখে না, সুদে ধার দেয়।

শতকরা পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত সুদে ধানের কারবার। একমণ ধান ধার দিলে বৎসরান্তে একমন দশসের বা দেড়মণ হইয়া সে ধান ফিরিয়া আসে। অবশ্য এটা শ্রীহরির জুলুম নয়। সুদের এই হারই দেশে প্রচলিত। প্রচলনের অভ্যাসে খাতকও এ সুদকে অতিরিক্ত মনে করে না, বরং অসময়ে অভাবের অন্ন দেয় বলিয়া মহাজন শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রীহরিকেও লোকে খাতির করে না—এমন নয়; কিন্তু শ্রীহরি তাহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করে না। সে অনুভব করে, লোকে ওই মৌখিক শ্রদ্ধার অন্তরালে তাহাকে ঈর্ষা করে, তাহার ধ্বংস কামনা করে। তাই এক এক সময় তাহার মনে হয়, সমস্ত গ্রামখানাতেই সে আগুন লাগাইয়া লোকগুলাকে সর্ব্বহারা করিয়া দেয়। পথ চলিতে চলিতে জগন ডাক্তারের মত শত্রুর ঘর নজরে আসিলেই বিদ্যুচ্চমকের মত তাহার ওই দুরন্ত অবাধ্য ইচ্ছাটা জাগিয়া উঠে। কিন্তু ত্রিপুরা সিংয়ের মত দুর্দ্দান্ত সাহস তাহার নাই। সে আমলও যে নাই! ত্রিপুরা সিং যে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিতে পারিত, আমলের চাপে শ্রীহরিকে সে ইচ্ছা দমন করিতে হয়। তা ছাড়া শ্রীহরির অন্যায়-বোধ—কালের পার্থক্যে ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে কিছু বেশী।

এই অন্যায় বোধ, ত্রিপুরা সিংয়ের চেয়ে তাহার বেশী বলিয়াই সে বারবার আপনার মনেই গত রাত্রের কাণ্ডটার জন্যে নানা সাফাই গাহিতেছিল। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে অকস্মাৎ উঠিল। ওই ভস্মীভূত পাড়াটার দিকেই সে চলিল। যাইতে যাইতেও কিন্তু বারকয়েক সে ফিরিল। কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। অবশেষে সে নিজের রাখালটার বাড়ীটাকেই একমাত্র গন্তব্যস্থল স্থির করিয়া অগ্রসর হইল। তাহার বাড়ীর রাখাল, সে তাহার চাকর, এ বিপদে তাহার তল্লাস করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য। কার সাধ্য তাহাকে কিছু বলে! আপনার মনেই সে প্রকাশ্যভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাও!....

বোধ করি যে তাহাকে কিছু বলিবে—তাহাকে সে পূর্ব্ব হইতেই ধমকটা দিয়া রাখিল। আসলে সে তাহার মনের ওই অবাধ্য স্মৃতি-উদ্ভূত সঙ্কোচকে একটা ধমক দিল।

রাখালটা মনিবকে যমের মত ভয় করে। ছিরু আসিয়া দাঁড়াতেই সে ভাবিল—আজিকার গরুহাজিরের জন্যই পাল তাহার ঘাড়ে ধরিতে আসিয়াছে। ছেলেটা ডুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ঘর পুড়ে গেয়্‌ছে মশাই—তাতেই—

পুড়িয়া যাওয়ার পর এই গরীব পাড়াটার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া শ্রীহরি মনে মনে খানিকটা লজ্জা বোধ না করিয়া পারিল না। সে সস্নেহে ছেলেটাকে বলিল—তা কাঁদিস কেনে? দৈবের ওপর তো হাত নাই। কি করবি বল? কেউ তো আর লাগিয়ে দেয় নাই।

রাখালটার বাপ বলিল—তা কে আর দেবে মশাই? কেনেই বা দেবে? আমরা কার কি ক'রেছি বলেন—যে ঘরে আগুন দেবে।

শ্রীহরি চুপ করিয়া পোড়া ঘরগুলার দিকেই চাহিয়া রহিল।

রাখালটার বাপ আবার বলিল—ছোটনোকের কাণ্ড—শুকনো পাতাতে আগুন ধ'রে গেইছে—আর কি!

—এক কাজ কর্‌। যা খড় লাগে আমার বাড়ী থেকে নিয়ে আয়। বাঁশ-কাঠ যা লাগে লিবি আমার কাছে; ঘর তুলে ফেল··· তারপর রাখালটার দিকে চাহিয়া বলিল—বাড়ীতে গিয়ে চাল নিয়ে আয় দশসের। কাল বরং ধান নিবি, বুঝলি!

রাখালটার বাপ এবার শ্রীহরির পায়ে একরকম গড়াইয়া পড়িল।

ইহারাই মধ্যে আরও জন দুয়েক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; একজন হাত-জোড় করিয়া বলিল—আমাদিগে যদি কিছু ক'রে ধান দিতেন ঘোষ মশায়—

—ধান?

—আজ্ঞে, তা না হ'লে তো উপোস ক'রে মরতে হবে মশায়।

—আচ্ছা, পাঁচসের ক'রে চাল আজ ঘর-পিছু আমি দেব। সে আর শোধ দিতে হবে না। আর ধানও অল্প অল্প দোব কাল। কাল বার আছে ধানের। আর—

—আজ্ঞে?

—দশগণ্ডা ক'রে খড়ও আমি দোব প্রত্যেককে। ব'লে দিস পাড়াতে।

জয় হবে মশায়, আপনার জয় জয়কার হবে। ধনে-পুতে লক্ষ্মীলাভ হবে আপনার।....শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া লোকটা ছুটিয়া চলিয়া গেল পাড়ার ভিতর। সংবাদটা সে প্রত্যেকের ঘরে প্রচার করিবার জন্ম অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।

দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষগুলি যেমন শ্রীহরির দাক্ষিণ্যে অভিভূত হইয়া গেল, শ্রীহরিও তেমনি অভিভূত হইয়া গেল ইহাদের সরল অকপট কৃতজ্ঞতার গদগদ প্রকাশে। এক মুহূর্ত্তে ওই সামান্ত দানের ভারে মানুষগুলা পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিশেষ করিয়া শ্রীহরির মনে হইল—যে-অপরাধ সে গত রাত্রে করিয়াছে, সে অপরাধ যেন উহাদেরই ওই কৃতজ্ঞতায় সজল চোখের অশ্রু-প্রবাহে মুহূর্ত্তে ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষিত হইয়া গেল। ভাবাবেগে শ্রীহরিরও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল—যাস্, সব যাস্। চাল-খড়-ধান নিয়ে আসবি। অনেকখানি লঘু পবিত্র চিত্ত লইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিবার পথে সে অনেক কল্পনা করিল।

গ্রীষ্মকালে জলের অভাবে লোকের কষ্টের আর অবধি থাকে না। পানীয় জলের জন্ম মেয়েদের ওই নদীর ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে হয়।

যাহারা ইজ্জতের জন্য যায় না—তাহারা খায় পচা পুকুরের দুর্গন্ধময় কাদা-ঘোলা জল। এবার একটা কুয়া সে কাটাইয়া দিবে।

গ্রামের পাঠশালার আসবাবের জন্য সেবার লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষাতে পাঁচটা টাকাও সংগৃহীত হয় নাই; সে পঞ্চাশ টাকা পাঠশালার আসবাবের জন্য দান করিবে।

আরও অনেক কিছু। গ্রামের পথটা কাঁকর ঢালিয়া পাকা করিয়া দিবে।

চণ্ডীমণ্ডপটার মাটি মেঝেটা বাঁধাইয়া দিবে, সিমেণ্ট-করা মেঝের উপর খুদিয়া লিখিয়া দিবে—শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীহরি ঘোষ। যেমন কঙ্কণার চণ্ডীতলায় মার্ব্বেল-বাঁধানো বারান্দার মেঝের উপর সাদা মার্ব্বেলের মধ্যে কালো হরফে লেখা আছে কঙ্কণার বাবুদের নাম।

সে কল্পনা করে, অতঃপর গ্রামের লোক সসম্ভ্রমে সকৃতজ্ঞচিত্তে মহাশয় ব্যক্তি বলিয়া নমস্কার করিয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে।

আজ নূতন একটা অভিজ্ঞতা লাভের ফলে শ্রীহরির অন্তরে এক নূতন মন কোন অজ্ঞাত-নিক্ষিপ্ত বীজের অঙ্কুর-শীর্ষের মত মাথা ঠেলিয়া জাগিয়া উঠিল। কল্পনা করিতে করিতে সে গ্রামের মাঠে মাঠে কিছুক্ষণ ঘুরিয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই দেখিল, বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে দরিদ্রের দল অপরাধীর মত। আর তাহার মা নির্ম্মম কটু ভাষায় গালিগালাজ করিতেছে। শুধু ওই হতভাগ্যদিগকেই নয়—তাহার উপরেও গালিগালাজ বর্ষণ করিতে মায়ের কার্পণ্য ছিল না ক্রুদ্ধ-চিত্তেই সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। মা তাহাকে দেখিয়া দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া উঠিয়া গালিগালাজ আরম্ভ করিল—ওরে ও হতচ্ছাড়া বাঁশবুকো, বলি দাতাকর্ণ-সেন হলি কবে থেকে? ওই যে পঙ্গপাল এসে দাঁড়িয়েছে, ব'লছে—

শ্রীহরির নগ্ন প্রকৃতির একটা অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গি আছে ; তখন সে চীৎকার করে না, নীরবে ভয়াবহ মুখভঙ্গি লইয়া অতি স্থিরভাবে মানুষকে বা পশুকে নির্য্যাতন করে—যেমন শীতের স্বচ্ছ জল মানুষের হাত-পা হিম করিয়া জমাইয়া দিয়া শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করে। সেই ভঙ্গিতে সে অগ্রসর হইয়া আসিতেই তাহার মা দ্রুতপদে খিড়কির দরজা দিয়া পলাইয়া গেল।

শ্রীহরি নিজেই নীরবে প্রত্যেককে চাল দিয়া বলিল—খড় আর ধান কাল নিবি সব।···সর্ব্বশেষে বলিল—মায়ের কথায় তোরা কিছু মনে করিস না যেন, বুঝ্‌লি ?

তাহার পায়ের ধূলা লইয়া একজন বলিল—আজ্ঞে, দেখেন দেখি, তাই কি পারি ?····তারপর রহস্য করিয়া ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার অভিপ্রায়েই সাধ্যমত বুদ্ধি খরচ করিয়া সে বলিল—মা আমাদের ক্ষ্যাপা মা গো ! রাগ্‌লে আর রক্ষে নাই।

শ্রীহরি উত্তর দিল না। সে আপন মনেই চিন্তা করিতেছিল—ওই মা হারামজাদীই কিছু করিতে দিবে না। তাহার আজিকার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে এত টাকা খরচ করিলে ওই হারাম-জাদী নিশ্চয়ই একটা বীভৎস কাণ্ড করিয়া তুলিবে ! আজ পর্য্যন্ত বড় কাঠের সিন্দুকটার চাবী ওই বেটী বুকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। টাকা বাহির করিতে গেলেই বিপদ বাধিবে। টাকার জন্য অবশ্য কোন ভাবনা নাই ; কয়েকটা বড় খাতকের কাছে সুদ আদায় করিলেই ওই কাজ কয়টা হইয়া যাইবে।

হ্যাঁ, তাই সে করিবে।····

আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি যেন বটবৃক্ষের অতিক্ষুদ্র একটি বীজকণার সঙ্গে তুলনীয় ; কিন্তু সেই এক কণার মধ্যেই লুকাইয়া

আছে এক বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনার প্রারম্ভেই শ্রীহরি যেন তাহার এতকালের বদ্ধ-অন্ধকার-দুর্গন্ধময় জীবন-সৌধের প্রতিটি কক্ষে—দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে—প্রতিটি সন্ধিতে এক বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করিতেছে। সৌধখানি বোধ হয় ফাটিয়া চৌচির হইয়া যাইবে।

দশ

ভূপাল চৌকীদার ইউনিয়ন বোর্ডের মোহর-দেওয়া একখানা নোটিশ হাতে করিয়া চলিয়াছিল, আগে-আগে ডুগ্-ডুগ্ শব্দে ঢোল বজাইয়া চলিতেছিল পাতু।

"এক সপ্তাহের মধ্যে আষাঢ়, আশ্বিন দুই কিস্তির বাকী ট্যাক্স আদায় না দিলে, জরিমানা সমেত—দেড়গুণ ট্যাক্স অস্থাবর ক্রোক করিয়া আদায় করা হইবেক।"

জগন ডাক্তার একেবারে আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল।

—কি? কি? কি করা হবে?

ভূপাল সভয়ে হাতের নোটিশখানি আগাইয়া দিয়া বলিল—আজ্ঞে, এই দেখেন কেনে!

জগন কঠিনদৃষ্টিতে ভূপালের দিকে চাহিয়া বলিল—সরকারী উর্দ্দি গায়ে দিয়ে মাথা নোয়াতেও ভুলে গেলি যে!

অপ্রস্তুত হইয়া ভূপাল তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পায়ের ধূলা কপালে মুখে লইয়া বলিল—আজ্ঞে দেখেন দেখি, তাই ভোলে! আপনকারাই আমদের মা-বাপ!

পাতুর বলিল—লিচ্চয়!

জগন নোটিশখানি দেখিয়া একেবারে গর্জ্জন করিয়া উঠিল—

এয়ার্কি নাকি। এ সব কি পৈত্রিক জমিদারী পেয়েছে সব! লোকের মাঠের ধান মাঠে রইল, বাবুরা একেবারে অস্থাবরের নোটিশ বার ক'রে দিলেন! মানুষকে উৎখাত ক'রে ট্যাক্স আদায় ক'রতে ব'লেছে গবর্ণমেণ্ট? আজই দরখাস্ত ক'রব আমি।

ভূপাল হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমরা চাকর, আমাদিগে যেমন ব'লেছে তেমনি—।

—তোদের দোষ কি? তোরা কি ক'রবি? তোরা ঢোল দিয়ে যা।

পাতু ঢোলটায় গোটা কয়েক কাঠির আঘাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে ডাক্তার বাবু, 'লবান্ন' হবে বাইশে তারিখ।

—নবান্ন? বাইশে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর সব লোককে বল গিয়ে। গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই। আমি নবান্ন ক'রব—আমার যে দিন খুসী।

পাতু আর কোন উত্তর না দিয়া পথে অগ্রসর হইল, ডাক্তার ক্রুদ্ধ গাম্ভীর্য্যে থমথমে মুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—এই পেতো, শোন্!

—আজ্ঞে!·· পাতু ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

—সেদিন দরখাস্তে টিপ-সই দিতে এলি না যে বড়? খুব বড়লোক হ'য়েছিস, না? সহরে গিয়ে বাড়ী ক'রবি, এ গাঁয়েই আর থাকবি না শুনছি!

বিরক্তিতে পাতুর ভ্রূ কুঁচকাইয়া উঠিল। কিন্তু কোন উত্তর দিল না। ডাক্তার ঘরে ঢুকিয়া দরখাস্তখানা বাহির করিয়া আনিয়া সস্নেহ শাসনের সুরে বলিল—দে, টিপছাপ দে! তোর জন্যেই আমি ছাড়ি নাই দরখাস্ত।

পাতু এবার বিনা আপত্তিতেই টিপছাপ দিল। সেদিন যে সে আসে নাই, সমস্ত দিনটাই গ্রামত্যাগের সঙ্কল্প লইয়া জংসন সহর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিয়াছে—সে সমস্তই সাময়িক একটা উত্তেজনার বশে; আজও যে সে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে ডাক্তারের কথায় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াছে—সেও ডাক্তারের কথার কটুত্বের জন্য। নতুবা সাহায্য বা ভিক্ষা লইতে তাহার আপত্তি নাই। গভীর কৃতজ্ঞতার সহিতই সে টিপছাপ দিল। টিপছাপ দিয়া বুড়া আঙুলের কালি মাথায় মুছিতে মুছিতে কৃতজ্ঞভাবে আবার হাসিয়া বলিল—ডাক্তারবাবুর মতন গরীবগুর্ব্বোর উপকার কেউ করে না।···ডাক্তারের জুতার ধূলা আঙুলের ডগায় লইয়া তাহা মুখে ও মাথায় বুলাইয়া লইল। ভূপাল চৌকিদারও তাহার অনুসরণ করিল।

ডাক্তার ইহারই মধ্যে কিছু যেন চিন্তা করিতেছিল, চিন্তা-শেষে বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—দাঁড়া! আরও একটা কাগজে টিপ-ছাপ দিয়ে যা।

—আজ্ঞে?····পাতু সভয়ে প্রশ্ন করিল। অর্থাৎ, আবার টিপছাপ কেন? টিপছাপকে ইহাদের বড় ভয়।

—এই ট্যাক্স আদায়ের বিরুদ্ধে একটা দরখাস্ত দোব! তাদের ঘর পুড়ে গিয়েছে, চাষীদের ধান এখনও মাঠে, এই অসময় অস্থাবরের নোটিশ এ কি মগের মুলুক নাকি?

এবার ভয়ে পাতুর মুখ শুকাইয়া গেল। ইউনিয়ন-বোর্ডের হাকিমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত! সে ভূপাল চৌকিদারের দিকে চাহিল—ভূপালও বিব্রত হইয়া উঠিয়াছে! ডাক্তার তাগিদ দিয়া বলিল—দে, টিপছাপ দে!

—আজ্ঞে না মশায়। উ আমি দিতে লারব!····পাতু এবার হন্ হন্ করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল। পিছনে পিছনে ভূপাল পলাইয়া

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভূপাল ভাবিতেছিল—খবরটা আবার 'পেসিডেন' বাবুকে গিয়া দিতে হইবে। নহিলে হয়ত সন্দেহ আসিবে—তাহারও ইহার সহিত যোগসাজস আছে।

ডাক্তার ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া পলায়নপর পাতু ও ভূপালের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে ফাটিয়া পড়িল—হারামজাদার জাত, তোদের উপকার যে করে সে গাধা!....বলিয়াই সে দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।

—ছিঁড়ো না, ডাক্তার, ছিঁড়ো না।...বাধা দিল পাঠশালার পণ্ডিত দেবু ঘোষ। সে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সবই দেখিয়াছিল। এ-সব ব্যাপারে তাহারও আন্তরিক সহানুভূতি আছে।

দেবু ঘোষ একটু বিচিত্র ধরণের মানুষ; এ গ্রামের পাঁচজনের একজন হইয়াও সে যেন সকল হইতে একটু পৃথক। তাহার মতামত-গুলিও সাধারণ মানুষ হইতে পৃথক। আপনাদের দুর্দ্দশার প্রতিকারের জন্য কাহারও সাহায্য-ভিক্ষা করিতে সে চায় না; অনিরুদ্ধকে, ছিরুকে শাসন করিতে জমিদারের দ্বারস্থ হইতে সে নারাজ। কিন্তু পঞ্চায়েতী মজলিসের আয়োজনে সেই প্রধান উদ্যোক্তা। তবু আজ সে জগন ডাক্তারকে দরখাস্ত ছিঁড়িতে বাধা দিল।

ডাক্তার দেবনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—ছিঁড়তে বারণ ক'রছ? ওই বেটাদের উপকার ক'রতে ব'লছ? দেখলে তো সব!

দেবু হাসিয়া বলিল—তা' দেখলাম। ওদের ওপর রাগ করে কি ক'রবে বল! দাও তোমার ট্যাক্সের দরখাস্ত, আমি সই ক'রছি, আর দশজনার সইও যোগাড় করে দিচ্ছি।

ডাক্তার একটা বিড়ি ও দেশলাই পণ্ডিতকে দিয়া বলিল—ব'স।.... তারপর বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—মিনু, দু কাপ চা!

মিনু ডাক্তারের মেয়ে।

ডাক্তার আবার আরম্ভ করিল—লোক ভাবে কি জান, পণ্ডিত? ভাবে—এ সবের মধ্যে আমার বুঝি কোন স্বার্থ আছে। অন্যায় অত্যাচারের প্রতিকার হ'লে বাঁচবে সবাই, কিন্তু রাজা হ'য়ে যাব আমি!

বিড়ি ধরাইয় দেশলাইটা ডাক্তারের হাতে দিয়া একটু হাসিয়া বলিল—তা' স্বার্থ আছে বৈ কি ডাক্তার।

স্বার্থ?....ডাক্তার রুক্ষ অথচ বিস্মিত দৃষ্টিতে পণ্ডিতের দিকে চাহিল।

পণ্ডিত হাতের বিড়িটার আগুনের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতেই সহজভাবে বলিল—স্বার্থ আছে বৈ কি! দশজনের কাছে গণ্যমান্য হবে তুমি, দু'দিন বাদে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারও হ'তে পার; স্বার্থ নেই? আমার মনে হয় সংসারে স্বার্থ-চিন্তা ছাড়া মানুষ টিঁকতেই পারে না।

ডাক্তারের কপাল কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল—ওটা যদি স্বার্থই হয়, তবে তো সাধু-সন্ন্যাসীদের ভগবানের তপস্যা করার মধ্যেও স্বার্থ আছে। বশিষ্ঠ-বুদ্ধদেবও স্বার্থপর!

—স্বার্থ কথাটাকে ছোট ক'রে না দেখলে—ও-কথা নিশ্চয় সত্য। পরমার্থ-ও তো অর্থ ছাড়া নয়।....দেবু তেমনি হাসিয়াই বলিল।

ডাক্তার বলিল—ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার আমি হ'তে চাই, আলবৎ হ'তে চাই। সে হ'তে চাই দশজনের সেবা ক'রবার জন্যে। পরলোক-ফরলোক জপতপ ও-সবে আমার বিশ্বাস নাই। ওই ছিরু পাল—চুরি ক'রবে—ব্যভিচার ক'রবে, আর ঘরে ব'সে জপতপ ক'রবে—ঘটা ক'রে কালীপুজো ক'রবে, ও-রকম ধর্ম্মের মাথায় মারি আমি পাঁচ ঝাড়ু!

অতঃপর ডাক্তার আরম্ভ করিল এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা।...মনুষ্য-জীবন ধন্য করিতে কে না চায় এ সংসারে? কেহ জপ তপ করিয়া ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন ধন্য করিতে চায়; কেহ মানুষের সেবা করিয়া ধন্য হইতে চায়, ইত্যাদি—ইত্যাদি।...বক্তৃতার উত্তরে দেবু ঘোষ বক্তৃতা দিতে পারিত, কিন্তু সে তাহা দিল না, কেবল বলিল—দশজনের ভাল ক'রতে চাও—গাঁয়ের মঙ্গল ক'রতে চাও, খুব ভাল কথা, ডাক্তার। কিন্তু গাঁয়ের লোককে কেন ছোট ভাব তুমি? আজ ব'ললে—গাঁয়ের লোকের সঙ্গে নবান্ন ক'রবে না তুমি! ক'দিন আগে দু দু'টো মজলিস হ'ল গাঁয়ে, তুমি ত' গেলেই না, উল্টে কামারকে তুমি উস্কে দিলে।

—কখনও না। গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে আমি কাউকে উস্কে দিই নাই। অনিরুদ্ধের জমির ধান কেটে নিলে—আমি তাকে ছিরের নামে ডাইরি ক'রতে ব'লেছি এই পর্য্যন্ত!

—বেশ কথা! মজলিসে গেলে না কেন?

—মজলিস? যে-মজলিসে ছিরু পাল টাকার জোরে মাতব্বর—সেখানে আমি যাই না।

—তার মাতব্বরি ভেঙে দাও তুমি। মজলিসে গিয়ে আপনার জোরে ভাঙ। ঘরে ব'সে থাকলে—তার মাতব্বরি তো আরও বেড়ে যাবে।

জগন এবার চুপ করিয়া রহিল!

—ভাল। নবান্ন ক'রবে না কেন তুমি গাঁয়ের লোকের সঙ্গে?

এবার ডক্তার কাবু হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—ক'রব না, এমন প্রতিজ্ঞা আমি করি নাই।

দেবু ঘোষ এবার খুসী হইয়া বলিল—হ্যাঁ। 'দশে মিলে করি কাজ হারি-জিতি নাহি লাজ'। যা ক'রবে, দশজনে এক হয়ে কর।

দেখ না, তিন দিনে সব ঢিট হ'য়ে যাবে। অনিরুদ্ধ কামার, গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত, পেতো মুচি—এমন কি তোমার ছিরেকেও নাকে-কানে খৎ দিইয়ে ছাড়ব।

ডাক্তার বলিল—বেশ। কোনও আপত্তি নাই আমার। তবে এক হ'তে হ'লে সব কাজেই এক হ'তে হবে। গাঁয়ের গরজের সময় জগন ডাক্তার আর দেবু পণ্ডিত; আর ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটের সময় কঙ্কণার বাবুরা, ছিরে পাল—

বাধা দিয়া দেবু ঘোষ বলিল—এবার তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে তুমি আর আমি দাড়াব। কেমন?

*　　　　*　　　　*

দেবনাথ ঘোষ—দেবু পণ্ডিত একটু স্বতন্ত্র মানুষ। আপনার বুদ্ধি-বিদ্যার উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাহার এই বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতনার সহিত খানিকটা কল্পনা—খানিকটা স্বার্থপরতাও মিশানো আছে। বিদ্যা অবশ্য বেশী নহে, কিন্তু দেবু সেইটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে। এ গ্রামে তাহার সমকক্ষ বিদ্বান্ ব্যক্তি কাহাকেও তো সে দেখিতে পায় না। জগন ডাক্তার পর্য্যন্ত তাহার তুলনায় কম-শিক্ষিত। কঙ্কণার হাই-স্কুলে জগন ফোর্থক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া, পড়া ছাড়িয়া বাপের কাছে ডাক্তারি শিখিয়াছে। দেবু পড়িয়াছে ফার্ষ্ট ক্লাস পর্য্যন্ত। পড়াশুনাতে সে ভালই ছিল, পড়িলে সে যে ম্যাট্রিক পাশ করিত—ভালভাবেই পাশ করিত, এ-কথা আজও কঙ্কণার মাষ্টারেরা স্বীকার করে। দেবু নিজে জানে—পড়িতে পাইলে সে বৃত্তি লইয়া পাশ করিত। তাহার পর আই-এ, বি-এ,—দেবনাথের কল্পনা সুদূর-প্রসারী। সঙ্গে সঙ্গে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আপনার দুর্ভাগ্যের জন্যে।

হঠাৎ তাহার বাপ মারা গেল। চাষবাস, সংসার দেখবার দ্বিতীয় পুরুষ বাড়ীতে ছিল না। তাহার মা অন্য গ্রাম্য মেয়েদের মত মাঠে

মাঠে ঘুরিয়া, পাঁচ জনের সঙ্গে পুরুষের মত ঝগড়া করিয়া ফিরিবে—এও দেবুর কল্পনায় ছিল অসহ্য। তাই সে পড়াশুনা ছাড়িয়া চাষ ও সংসারের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু সন্তুষ্টচিত্তে নয়, অসন্তোষ অহরহই তাহার মনে জাগিয়া থাকিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য পাঠশালার ভার ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড গ্রহণ করিবার পর হইতে সে চাষবাস ছাড়িয়া ঐ স্কুলে পণ্ডিত হইয়া বসিয়াছে। বেতন—মাসে বারো টাকা; চাষ-বাস ভাগে-ঠিকায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছে। লোকে এইবার তাহাকে বলিল—পণ্ডিত; খানিকটা সম্মানও করিল। কিন্তু তাহাতেও তাহার পরিতৃপ্তি হইল না।

(তাহার ধারণা, গ্রামের শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তি সে। শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিত্বের সম্মান তাহার প্রাপ্য। অরণ্যানীর শিশু-শাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায়, তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা অখণ্ড আলোক ভোগের জন্যই ঊর্দ্ধলোকে উঠিতে চায় না; নীচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহার সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে চলুক—এই তাহার আকাঙ্ক্ষা! ছিরুপালের অর্থসম্পদ এবং বর্ব্বর পশুত্বকে সে করে আন্তরিক ঘৃণা। জগনের নকল দেশপ্রীতি ও আভিজাত্যের আস্ফালন তাহার নিকট যেমন হাস্যকর, তেমনি অসহ্য। বংশানুক্রমিক দাবিতে হরিশ মণ্ডলের গ্রামের মণ্ডলত্ব-দাবিকেও সে স্বীকার করিতে চায় না। ভবেশ ও মুকুন্দ বয়সের প্রাচীনত্ব লইয়া বিজ্ঞতার ভাণে কথা কয়,—সে তাহাও সহ্য করিতে পারে না।

দেবুর উপেক্ষা অবশ্য অহৈতুক অথবা একমাত্র আত্মপ্রাধান্য হইতে উদ্ভূত নয়। আপনার গ্রামখানিকে সে প্রাণের সহিত ভালবাসে। সে যে চোখের উপর গ্রামখানিকে দিন দিন অবনতির পথে গড়াইয়া যাইতে দেখিতেছে। অর্থবলে এবং দৈহিক শক্তিতে ছিরু যথেচ্ছাচার

করিতেছে। শুধু ছিরু কেন—গ্রামের কেহই কাহাকেও মানে না, সামাজিক আচার-ব্যবহার লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষ মরিলে সহজে মড়া বাহির হয় না, সামাজিক ভোজনে—একই পঙ্‌ক্তিতে ধনী-দরিদ্রের ভেদ দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি কামার, ছুতার, বায়েন কাজ ছাড়িল; দাই, নাপিত সনাতন বিধান লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। যাহার মাসে পাঁচ টাকা আয়—সে দশ টাকা খরচ করিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়াছে। ঋণের দায়ে জমি বিকাইয়া যাইতেছে, ঘটি-বাটি বেচিতেছে,—তবু জামা চাই, জুতা চাই, সৌখীন-পাড় কাপড় চাই, ঘরে ঘরে হ্যারিকেন লণ্ঠন চাই। ছোকরাদের পকেটে বিড়ি-দেশলাই ঢুকিতেছে, জংসন-সহরে গেলেই সবাই দু'এক পয়সার সিগারেট্ না কিনিয়া ছাড়ে না,—তামাক-চকমকি একেবারে বাতিল হইয়া গেল। এ-সবের প্রতিকার করিবার সাধ্য যাহাদের নাই, তাহারা প্রধান হইতে চায় কেন, কিসের জোরে?

দেবু পণ্ডিত পাঠশালায় ছেলেদের পড়াইতে পড়াইতে অনেক কিছু ভাবে! গ্রামের সকলজন হইতে নিজেকে কতটা পৃথক রাখিয়া—আপনার চিন্তাকে বিকীর্ণ, সঙ্গে সঙ্গে আপন ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করে—অক্লান্তভাবে—অবিরাম অধ্যবসায়ের সহিত। সামান্য সুযোগও সে কখনও ত্যাগ করে না।

তাই জগন ডাক্তার যখন ইউনিয়ন বোর্ডের কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল—তখন ডাক্তারের আভিজাত্যের আস্ফালনের প্রতি ঘৃণা সত্ত্বেও তাহার সহিত মিলিত হইতে সে দ্বিধাবোধ করিল না।

দেবনাথ ও জগন ডাক্তার দুইজনে মিলিত উৎসাহে কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। দরখাস্ত পাঠানো হইয়া গিয়াছে। নবান্নের দিনে দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল। সন্ধ্যায়

চণ্ডীমণ্ডপে মনসার ভাসান গান হইবে; ভাসান গানের দলকে এখানে ‘বেহুলার দল’ বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে; সেই দলের গান হইবে। চাঁদা করিয়া চাল তুলিয়া উহাদের মদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে—তাহাতেই দলের লোকের মহা আনন্দ। এই ভাসান গানের ব্যবস্থার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য আছে। নবান্নের দিন ছিরু পালের বাড়ীতে অন্নপূর্ণা পূজা হইয়া থাকে; সেই উপলক্ষে সন্ধ্যায় গ্রামের সমস্ত লোকই গিয়া জমায়েত হয় ছিরুর বাড়ীতে। তামাক খায়, গালগল্প করে, খোল বাজাইয়া অল্প অল্প কীর্ত্তন-গানও হয়। এবার আবার ছিরু নাকি বিশেষ সমারোহের আয়োজন করিয়াছে। রাত্রে লোকজন খাওয়াইবে—একদল কৃষ্ণযাত্রাও নাকি বায়না করিয়াছে। শ্রীহরির মায়ের নিত্যকার গালিগালাজের মধ্য হইতে অন্তত দুইটি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক যাহাতে ছিরুর বাড়ী না যায়—জগন ডাক্তার এবং দেবনাথ তাহার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি করিয়াছে। গ্রামকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টায় জগন ও দেবনাথের এইটি প্রথম আয়োজন বা ভূমিকা।

চাষীর গ্রামে নবান্নের সমারোহ কিছু বেশী, সত্যকারের সার্ব্বজনীন উৎসব। চাষের প্রধান শস্য হৈমন্তী ধান মাঠে পাকিয়া উঠিয়াছে; এইবার সে ধান কাটিয়া ঘরে তোলা হইবে। কার্ত্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা ধান কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে। এইবার লঘু ধানের চাল হইতে নানা উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের আজ্ঞ ভোগ দেওয়া হইবে। ঘরে ঘরে হইবে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা। ছেলেমেয়েরা সকাল-বেলায়ই স্নান সারিয়া ফেলিয়াছে। অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহে শীত বেশ পড়িয়াছে; তবুও নবান্নের উৎসাহে ছেলেরা পুকুরের জল ঘোলা করিয়া তবে উঠিয়াছে। তাহারা সব এখন চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় রোদে দাঁড়াইয়া

খোঁড়া পুরোহিতের কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে লইয়া কলরব করিতেছে। বুড়ো শিব এবং ভাঙা কালীর মন্দীরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজা চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া নতুন বাটিতে নতুন ধানের আতপ চাল, চিনি, মণ্ডা, দুধ, কলা, আখের টিকলি, আদাকুচি, মূলাকুচি সাজাইয়া মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে। যাহাদের বাড়ীতে কুমারী মেয়ে নাই, তাহাদের প্রবীণারা ভোগসামগ্রী লইয়া আসিতেছে। গ্রামের পুরোহিত— খোঁড়া চক্রবর্তী বসিয়া সামগ্রীগুলি লইয়া দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দিতেছে। মধ্যে মধ্যে ধমক দিতেছে ওই ছেলেগুলিকে—এ্যাই— এ্যাই! এ্যাই ছেলেগুলো! এতো ভারী বদ! যাস্ না কাছে, চাট ছোঁড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে!

অর্থাৎ ওই ঘোড়াটা। ঘোড়াটা পিছনের পা ছুঁড়িলে প্লীহা ফাটিয়া যাইবে। খোঁড়া চক্রবর্ত্তী গ্রাম-গ্রামান্তরে ওই ঘোড়ার উপর সওয়ার হইয়া যজমান সাধিয়া ফেরে। ফিরিবার সময় ঘোড়ার উপর থাকে সে—তাহার মাথায় থাকে চাল-কলা ইত্যাদির বোঝা। ঘোড়া খুব শিক্ষিত, চক্রবর্ত্তী প্রায়ই লাগাম না ধরিয়া দুই হাতে বোঝা ধরিয়া অনায়াসে চলে; অবশ্য ইচ্ছা করিলে চক্রবর্ত্তী মাটিতে পা নামাইয়া দিতে পারে! মাটি হইতে বড় জোর ফুটখানেক উপরে তাহার পা দুইটা ঝুলিতে ঝুলিতে যায়।

ছেলেগুলি দূর হইতে ঢেলা ছুঁড়িয়া ঘোড়াটাকে ক্রমাগত মারিতেছিল। পুরোহিত ভয়ানক চটিয়া উঠিল। কিন্তু কোন উপায় সে খুঁজিয়া পাইল না। একটি প্রৌঢ়া বিধবা ভোগের সামগ্রী লইয়া আসিয়াছিল—সে-ই পুরোহিতের উপায় করিয়া দিল; সে বলিল— এঁ্যা—তোরা সব ঘোড়া ছুলি? বলি—ওরে ও মেলেচ্ছার দল। যা, সব আবার চান করুগে যা।

পুরোহিত বলিল—দেখ বাছা দেখ, বজ্জাত ছেলেদের কাণ্ড দেখ। চাট ছোঁড়ে তো পিলে ফাটিয়ে দেবে। তখন নাম-দোষ হবে আমার!

বিধবা কিন্তু একথাটা মানিল না, সে বলিল—ও-কথা আর ব'ল না ঠাকুর। ওই ছাগলের মত ঘোড়া—ও নাকি পিলে ফাটিয়ে দেবে! তুমিও যেমন। ছেলেদের বল্‌ছি কেন, তোমারও তো বাপু আচার-বিচের কিছু নাই। সামনের দুটো পায়ে বেঁধে ছেড়ে দাও, রাজ্যের আস্তাকুঁড়, পাতা, ময়লা মাড়িয়ে চরে' বেড়ায়। সে-দিন আমাদের গাঁয়ে এসে নতুন পুকুরের পাড়ে—মা-গোঃ, মনে ক'রলেও বমি আসে—চান ক'রতে হয়—সেইখানে দেখি ঘাস খাচ্ছে। আর তুমি ওই ঘোড়াতে চেপে এসে দেবতার পুজো কর?

পুরোহিত বলিল—গঙ্গাজল দি মোড়ল পিসী, রোজ সন্ধ্যেবেলা বাড়ী ফিরলে গঙ্গাজল দিয়ে তবে ওকে ঘরে বাঁধি। আমি তো গঙ্গাজল-স্পর্শ করিই।

—ও সব তোমার মিছে কথা!

—ঈশ্বরের দিব্যি! পৈতে ছুঁয়ে ব'লছি আমি। গঙ্গাজল না দিলে ও কিছুতেই বাড়ী ঢোকে না। বাইরে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকবে আর চি হি চি হি ক'রে চেঁচাবে।

মোড়ল পিসী কি বলিতে গিয়া শশব্যস্ত হইয়া সম্মুখের দিকে খানিকটা সরিয়া গিয়া ফিরাইয়া দাঁড়াইল—কে লা? হন হন ক'রে আসছে দেখ!....পিছন দিক হইতে কোন আগন্তুকের দীর্ঘচ্ছায়ার অগ্রভাগটা তাহার পায়ের উপর পড়িতেই মোড়ল পিসী সংস্পর্শের ভয়ে সরিয়া গিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

একটি বধূ, দীর্ঘাঙ্গী—অবগুণ্ঠনাবৃত মুখ; সে উত্তর করিল না, নীরবে ভোগ-সামগ্রীর পাত্রখানি পুরোহিতের সম্মুখে নামাইয়া দিল।

—অ! আমাদের কামার বউ! আমি বলি কে-না কে!

এই মুহূর্ত্তেই ডাক্তার ও পণ্ডিত আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিল। দেবনাথ বিনা ভূমিকায় বলিল—ঠাকুর, কামারের পূজো গাঁয়ের সামিলে আপনি ক'রবেন না, সে হ'তে আমরা দোব না!

জগন ও দেবু এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষা করিয়া নিকটেই কোথায় দাঁড়াইয়া ছিল, পদ্মকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারাও আসিয়া হাজির হইয়াছে।

ঠাকুর কিছুক্ষণ পণ্ডিতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—সে আবার কি রকম? গাঁ-সামিলে পূজো না-হ'লে কি ক'রে পূজো হবে?

—সে আমরা জানি না, কর্ম্মকার বুঝে ক'রবে! সে যখন গাঁয়েব নিয়ম লঙ্ঘন ক'রেছে, তখন আমরাই বা তাকে গাঁয়ের সমিলে ক্রিয়াকর্ম্মে নোব কেন?

পদ্ম তেমনি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না। ঠাকুর তাহার দিকে চাহিয়া নিতান্ত নিরুপায়ভাবে বলিল—তাহ'লে আর আমি কি ক'রব মা।

দেবনাথ পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—পূজো তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, বলগে কর্ম্মকারকে, পূজো দিতে দিলে না গাঁয়ের লোকে।

পদ্ম এবার ধীরে ধীরে চলিয়া গেল, কিন্তু পূজোর পাত্র তুলিয়া লইল না, সেটা সেইখানেই পড়িয়া রহিল।

পুরোহিত বিব্রত হইয়া বলিল—ওগো বাছা, পুজোর ঠাঁইটা; নিয়ে যাও! ও বাছা, কামার-বউ!

দেবু এবার বলিল—থাক না। কামার তো এখুনি আসবেই! যা হোক, একটা মীমাংসা আজ হবেই।....দেবু ঘোষের গোপনতম অন্তরে কর্ম্মকারের উপর একটু সহানুভূতি এখনও আছে। অনিরুদ্ধ তাহার সহপাঠি, তা' ছাড়া অন্যায় অনিরুদ্ধেরই একার নয় এবং অনিরুদ্ধই

প্রথমে অন্যায় করে নাই। গ্রামের লোকই অন্যায় করিয়াছে প্রথম। সে কথাটাও তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল।

পুরোহিত ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার ব্যগ্রতাও তাহার ছিল না! উপস্থিত একবাড়ীর আতপতণ্ডুল দুধ-মণ্ডা প্রভৃতি পূজোর সামগ্রী বাদ পড়িয়া যাইতেছে—সেই চিন্তাটাই তাহার বড়। তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল—হ্যাঁহে, ডাক্তার ও পণ্ডিত—

জগন বাধা দিয়া দৃঢ় আদেশের ভঙ্গিতে তাহাকে বলিল—গিরীশ ছুতোর, তারা নাপিত এদের পূজোও হবে না ঠাকুর, বলে রাখছি আপনাকে। আমরা অবিশ্যি একজন-না-একজন শেষ পর্য্যন্ত থাকব, তবে যদি না থাকি—সেইজন্যে আগে থেকে ব'লে রাখছি আপনাকে।

ঠিক এই সময়ে ছিরুপাল আসিয়া ডাকিল—ঠাকুর!…ছিরুর পরণে আজ গরদের কাপড়, গায়ে একখানি রেশমী চাদর; ভাবে-ভঙ্গিতে ছিরু পাল আজ একটি স্বতন্ত্র মানুষ!

পুরোহিত চক্রবর্ত্তী ব্যস্ত হইয়া বলিল—এই যাই বাবা। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা। ও পণ্ডিত, ও ডাক্তার, কই হে, সব আসছে না কেন?

গম্ভীরভাবে জগন ডাক্তার বলিল—এত তাড়াতাড়ি ক'রলে তো হবে না, ঠাকুর! আসছে সব, একে একে আসছে। একঘর যজমানের জন্য দশজনকে ব্যতিব্যস্ত কারতে গেলে তো চ'লবে না।

ছিরু বলিল—বেশ—বেশ! দশের কাজ সেরেই আসুন ঠাকুর! আমি একবার তাগাদা দিয়ে গেলাম।…তারপর ছিরু তাহার প্রকাণ্ড বিশ্রী মুখখানাকে যথাসাধ্য কোমল এবং বিনীত করিয়া বলিল—ডাক্তার, একবার যাবেন গো দয়া ক'রে। দেবু খুড়ো, দেখে শুনে দিয়ে এস, বাবা—

কথা তাহার শেষ হইল না, অনিরুদ্ধের প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ চীৎকারে চণ্ডীমণ্ডপটা যেন অতর্কিতে চমকিয়া উঠিল।

—কে? কার ঘাড়ে দশটা মাথা? কোন্ নবাব-বাদশা আমার পূজো বন্ধ ক'রেছে শুনি?

অনিরুদ্ধের সে মূর্ত্তি যেন রুদ্র-মূর্ত্তি!

চক্রবর্ত্তী হতভম্ব হইয়া গেল, দেবনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইল, জগন ডাক্তার বিজ্ঞ সান্ত্বনা-দাতার মত একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিল; ছিরু পাল কিন্তু আজ অচঞ্চল স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিল—থাম্, থাম্, চীৎকার করিস না, অনিরুদ্ধ!

ব্যঙ্গভরা ঘৃণিত দৃষ্টিতে চকিতে একবার ডাক্তারের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ মন্দিরের দাওয়া হইতে পদ্মের পরিত্যক্ত পূজোর পাত্রটা তুলিয়া লইল। পাত্রটা সে দুই হাতে তুলিয়া যেন দেবতাকে দেখাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—হে বাবা শিব, হে মা কালী—খাও বাবা, খাও মা, খাও! আর বিচার ক'র, তোমারা বিচার ক'র!....বলিয়াই সে ফিরিল।

ডাক্তারের চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল, কিন্তু অনিরুদ্ধকে ধরিয়া নির্য্যাতন করিবার কোন উপায় ছিল না।

অনিরুদ্ধ ফিরিয়াই দেখিল দেবু ঘোষ ও জগন ডাক্তারের অল্প দূরে দাঁড়াইয়া আছে ছিরু পাল। তাহার ক্রোধ মুহূর্ত্তে যেন উন্মাত্ততায় পরিণত হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল—বড়লোকের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, বিদ্বেনের মাথায় আমি ঝাড়ু মারি, আমি কোন শালাকে মানি না, গ্রাহ্য করি না। দেখি—কোন শালা আমার কি ক'রতে পারে।

মুহূর্ত্তের জন্য সে ছিরুর দিকে ফিরিয়া যেন তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

খোঁড়া পুরোহিত, মোড়ল পিসী একটা বিপর্য্যয় আশঙ্কা করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইহার পরই অনিরুদ্ধের উপর ছিরু পালের বাঘের মত লাফাইয়া পড়ার কথা; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, ছিরুপাল হাসিয়া অনিরুদ্ধকে বলিল—আমাকে মিছিমিছি জড়াচ্ছ, কর্ম্মকার, আমি এ-সবের মধ্যে নাই। আমি এসেছিলুম পুরুত ডাকৃতে।

অনিরুদ্ধ আর দাঁড়াইল না, যেমন হন্ হন্ করিয়া আসিয়াছিল, তেমনি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতেও সে বলিতেছিল—সব শালাকে আমি জানি। ধার্ম্মিক—রাতারাতি সব ধার্ম্মিক হ'য়ে উঠেছে।

ছিরু অবিচলিত ধৈর্য্যে স্থির প্রশান্তভাবেই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া বড়ীর পথ ধরিল। ছিরুর চরিত্রের এই একটি বৈশিষ্ট্য। যখন সে ইষ্ট স্মরণ করে, কোন ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা পূজা-পার্ব্বণে রত থাকে—সে তখন স্বতন্ত্র মানুষ হইয়া যায়। সেদিন সে কাহারও সহিত বিরোধ করে না, কাহারও অনিষ্ট করে না, পৃথিবী ও বস্তু-বিষয়ক সমস্ত কিছুর সহিত সংস্রবহীন হইয়া এক ভিন্ন জগতের মানুষ হইয়া উঠে। অবশ্য সমগ্র হিন্দুসমাজের জীবনই আজ এমনই দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে; কর্ম্মজীবন এবং ধর্ম্মজীবন একেবারে স্বতন্ত্র—দুইটার মধ্যে যেন কোন সম্বন্ধ নাই। ইষ্ট স্মরণ করিতে করিতে যাহার চোখে অকপট অশ্রু উদ্গত হয়, সেই মানুষই ইষ্টস্মরণ-শেষে চোখের জল মুছিতে মুছিতে বিষয়ের আসনে বসিয়া জাল-জালিয়াতি সুরু করে। শুধু হিন্দু সমাজই বা কেন?—পৃথিবীর সকল দেশে—সকল সমাজেই জীবন-ধারা অল্পবিস্তর এমনই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর কথা থাকুক, ছিরুর জীবনে এই বিভাগটা বড় প্রকট—অতি মাত্রায় পরিস্ফুট। আজিকার ছিরু স্বতন্ত্র, এই ছিরু যে কেমন করিয়া ব্যভিচারী পাষণ্ড ছিরুর প্রচণ্ড ভার ঠেলিয়া দেবপূজাকে উপলক্ষ করিয়া

বাহির হইয়া আসে—সে অতি বিচিত্র সংঘটন। (পাবণ্ড ছিরুর অন্যায় বা পাপে কোন ভয় নাই, দেবসেবক ছিরুরও সে পাপখণ্ডনের জন্য কোন ব্যগ্রতা নাই।) আছে কেবল পরমলোক-প্রাপ্তির জন্য একটি নিষ্ঠাভরা তপস্যা এবং অকপট বিশ্বাস। দিন ও রাত্রির মত পরস্পরের সঙ্গে এই দুই বিরোধী ছিরুর কখনও মুখোমুখি দেখা হয় না, কিন্তু কোন বিরোধেও নাই। কিন্তু ছিরুর দিনগুলি অর্থাৎ জীবনের আলোকিত অংশটুকু শীতমণ্ডলের শীতের দিনের মত—অতি সংক্ষিপ্ত তাহার আয়ু।

আজ কিন্তু আরও একটু নূতনত্ব ছিল ছিরুর ব্যবহারে। আজিকার কথাগুলি শুধু মিষ্টই নয়—খানিকটা অভিজাতজনোচিত, ভদ্র, সাধু। বিগত কালের দেবসেবক ছিরু হইতেও আজিকার দেবসেবক ছিরু আরো স্বতন্ত্র, আরও নূতন। উত্তেজনার মুখে সেটা কেহ লক্ষ্য করিল না।

কিছুক্ষণ পরই চণ্ডীমণ্ডপের সামনের রাস্তা দিয়া বাউড়ী, ডোম, মুচীদের ছেলেরা মেয়েরা সারি বাঁধিয়া কোথায় চলিয়াছিল। জগন ডাক্তার প্রশ্ন করিল—কোথায় যাবিরে সব দল বেঁধে?

—আজ্ঞে, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী গো, অন্নপূন্নোর পেসাদ নিতে ডেকেছেন।

—কে? ছিরু? ছিরে পাল আবার ঘোষ কবে থেকে হ'ল?

অশ্লীল ভাষায়—ছিরুকে গাল দিয়া ডাক্তার বলিল—ওঃ, বেজায় সাধু—মাতব্বর হ'য়ে উঠল দেখছি!

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল।

এগারো

দেবু স্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল অনেক কথা।...

চণ্ডীমণ্ডপেই গ্রাম্য পাঠশালা বসে; পাঠশালার প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন হইতে চণ্ডীমণ্ডপই পাঠশালার নির্দ্দিষ্ট স্থান। সেকালে কালী ও শিবের নিত্য-পূজার ব্যবস্থা ছিল এবং ওই পূজক ব্রাহ্মণই তখন ছিল পাঠশালার পণ্ডিত। পরবর্ত্তীকালে পূজকের দেবোত্তর জমি কেমন করিয়া কোথায় উবিয়া গেল কে জানে। লোকে বলে—জমিদারের পূর্ব্ববর্ত্তী এক গোমস্তা দেবোত্তর জমিকে নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া নিজের জোতের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছে; এমন কৌশলে লইয়াছে যে, সে আর উদ্ধারের উপায় নাই। এমন কি, চিহ্নিত জমিগুলাকে কাটিয়া এমনি রূপান্তরিত করিয়াছে যে, সে জমি পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করা দুঃসাধ্য। তাহার পরও অনেক দিন এক ব্রাহ্মণ গ্রাম্য-পৌরোহিত্য, দেব সেবা এবং পাঠশালাকে অবলম্বন করিয়া এখানে ছিল; আজ বৎসর দশেক আগে সে-ও চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। শিক্ষা-বিভাগের নূতন নিয়মানুযায়ী অযোগ্যতা হেতু তাহাকে বরখাস্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। সম্প্রতি বছর তিনেক দেবুর হাতে পাঠশালার ভার পড়িয়াছে।

সেকালে দেবুও এই পাঠশালায় সেই পুরোহিত-পণ্ডিতের কাছে পড়িয়াছে। পণ্ডিত একদিকে পূজা করিত 'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী'—অকস্মাৎ মন্ত্র বন্ধ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত—এ্যাই—এ্যাই চণ্ডে, পাঁচ তেরম পঁচাত্তর নয়, পাঁচ তেরম পঁয়ষট্টি। ছয় তেরম আটাত্তোর। হ্যাঁ।....

ওই অনিরুদ্ধ তাহার সঙ্গে পড়িত। পণ্ডিত তাহাকে বলিত—এ

দেশের লোহাতে চেকন কাজ হয় না বাবা, কর্ম্মকার, তুমি 'বিলাত' যাও। বিলাতে কল-কারখানার কারবার, আলপিন-স্চ তৈরী হয় লোহা থেকে। বিলাতী পণ্ডিত না হ'লে তোমাকে পড়ানো আমার কর্ম্ম নয়।....

ছিরু তাহার জ্ঞাতি, সম্বন্ধে ভাইপো, কিন্তু বয়সে অনেক বড়। সে প্রথমে তাহার কয়েক ক্লাস উপরে পড়িত ; শেষে এক এক ক্লাসে দুই-তিন বৎসর করিয়া বিশ্রাম লইতে লইতে যেদিন দেবুকে সহপাঠিরূপে দেখিতে পাইল, সেইদিনই সে পাঠশালার মোহ জন্মের মত বিসর্জ্জন দিল। তারপরই সে বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে—ক্রমে বিষয়-বুদ্ধিতে পাঁচখানা গ্রামের লোককে বিস্মিত করিয়া দিয়াছে। সে আজ গণ্য-মান্য ব্যক্তি, গ্রামের মাতব্বর।

অনিরুদ্ধ এবং এই ছিরু পাল—এই দুইজনেই গ্রামখানার সমস্ত শৃঙ্খলা ভাঙিয়া দিল। ওই সঙ্গে গিরীশ ছুতার, তারা নাপিতও আছে। দেবু আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছিল—অনিরুদ্ধ ওই যে দম্ভভরে সামাজিক নিয়ম উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ভোগ উঠাইয়া লইয়া গেল, অথচ সমাজের কেহ তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিল না! সে নিজে কয়েকদিন লোকের দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়াছে, গ্রামের লোকে তাহাকে ভালবাসে, অনেকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু এক্ষেত্রে সকলেই বলিয়াছে এক কথা—এর আর ক'রবে কি? উপায় কি? যা হয় তুমি কর! তবে বুঝছ কি না—উ হবে না! কি সমাজ সমাজ ক'রছ? সমাজ কই?

নাই। দেবু নিজেই বুঝিয়াছে, নাই। সেকালে যে-সব মানুষ এই সমাজ গড়িয়াছিল, এই সমাজ শাসন করিত—সে ধরণের মানুষই আর নাই। এ-সব মানুষ আর এক জাতীয় মানুষ। মানুষের নামে অমানুষ।

জগন ডাক্তার সেদিন বলিয়াছিল—ধ’রে এনে বেটাচ্ছেলে কামারকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লাগাক্ ঘা-কতক।

জগনের ও-প্রস্তাবে দেবু সায় দিতে পারে নাই। ছি! মানুষকে শিক্ষা দিবার অধিকার আছে, ক্ষেত্র বিশেষে মনুষ্যোচিত শাসন করিবার অধিকারও সে স্বীকার করে; কিন্তু অত্যাচারই একমাত্র শাসন নয়। জীবনে তাহার আকাঙ্ক্ষা আছে, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য হীন কৌশল, অত্যাচার ও অন্যায়কে অবলম্বন করিতে সে চায় না। জীবনে তাহার একটি আদর্শ-বোধও আছে। পাঠ্যাবস্থায় আপনার ভাবী জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠার কামনায় সযত্নে সেই বোধটিকে দেবু গড়িয়া তুলিয়াছিল। মহাপুরুষদের দৃষ্টান্তের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া নিজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গঠিত সেই আদর্শবোধ। বাল্যজীবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে কয়েকটি ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইয়া আছে। বারংবার নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি-শাণিত যুক্তির আঘাত দিয়াও সে-ধারণাগুলি আজও তাহার খণ্ডিত হয় নাই।

জমিদারকে, ধনী মহাজনকে সে ঘৃণা করে। তাহাদের প্রতিটি কর্ম্মের মধ্যে অন্যায়ের সন্ধান করা তাহার স্বভাবের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদের অতি-উদার দান-ধ্যান-পুণ্যকর্ম্মকেও সে মনে করে কোন গুপ্ত গো-বধের স্বেচ্ছাকৃত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া। তাহার অবশ্য কারণ আছে।

তাহার বাল্যকালে জমিদারবাবুরা বাকী খাজনা আদায়ের জন্য একবার তাহার বাবাকে সমস্ত দিন কাছারিতে আটক রাখিয়াছিল। আতঙ্কিত দেবু তিনবার বাবুদের কাছারিতে গিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিয়াছিল; দুইবার চাপরাশীর ধমক খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল। শেষবার বাবু তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিল—এবার

যদি আসবি, ছোঁড়া, তবে কয়েদখানায় বন্ধ ক'য়ে রেখে দেব। চাপরাশীটা তাহাকে টানিয়া আনিয়া একটা অন্ধকার ঘরও দেখাইয়া দিয়াছিল। বাবুদের অবশ্য কয়েদখানায় জন্য স্বর্গধাম কি বৈকুণ্ঠ-জাতীয় কোন মহল বা ঘর কোনদিনই ছিল না। নিতান্তই ছোট জমিদার তাঁহারা, দেবুকে নিছক ভয় দেখাইবার জন্যই ও-কথাটা বলা হইয়াছিল—সেটা দেবু আজ বোঝে। কিন্তু জমিদার অত্যাচারী—এ ধারণা তাহাতে একবিন্দু ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

জমিদারের ওই বাকী খাজনা শোধের জন্য তাহার বাপ কঙ্কণার মুখুজ্জে বাবুদের কাছে ঋণ করিয়াছিল। তাহারা তিন বৎসর অন্তে হ্যাণ্ডনোটের নালিশ করিয়া অস্থাবর ক্রোকী পরোয়ানা আনিয়া, গাই-বাছুর-থালা-গেলাস ও অন্যান্য জিনিষপত্র টানিয়া রাস্তায় যেদিন বাহির করিয়াছিল—সেদিনের সেই লাঞ্ছনা-বিভীষিকা দেবু কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তাহার পর অবশ্য ডিক্রীর টাকা আসল করিয়া তমস্সুক্ লিখিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিলে বাবুরা অস্থাবর ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে-টাকা তাহার বাবার মৃত্যুর পর সে শোধ করিয়াছে। এই বাবুরা অবশ্য বে-আইনী কখনও কিছু করে না, হিসাবের বাহিরে একটি পয়সা অতিরিক্ত লয় না। লোকে বলে—মুখুজ্জে বাবুদের মত মহাজন বিরল। টাকা আদায়ের জন্য জোর জুলুম নাই, অপমান নাই, সুদ শোধ করিয়া গেলে নালিশ কখনও করিবে না; লোকের সম্পত্তির উপরে তাহাদের প্রলোভন নাই। নীলাম করিয়া লওয়ার পরও টাকা দিলেই বাবুরা সম্পত্তি ফেরৎ দেয়। ইহার একবিন্দু অতিরঞ্জন নয়। তবু দেবু মহাজনকে ক্ষমা করিতে পারে না।

এ-সবের উপর আরও তিক্ত অভিজ্ঞতা তাহার মনে অক্ষয় হইয়া আছে। স্কুলে সে ছিল সর্বাপেক্ষা দুইটি ভাল ছেলের একটি। তাহার তিন ক্লাশ নীচে পড়িত মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র

বিশ্বনাথ,—সে ছিল দ্বিতীয় জন। শিক্ষকেরা প্রত্যাশা করিতেন—এই ছেলে দুইটি স্কুলের মুখোজ্জ্বল করিবে। কিন্তু দেবু আজও ভুলিতে পারে না যে, সে ছিল শিক্ষকদের সস্নেহ করুণার পাত্র; ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথ পাইত স্নেহের সহিত শ্রদ্ধা; আর কঙ্কণার বাবুদের মধ্যম মেধার কয়েকটি ছাত্র পাইত স্নেহের সহিত সম্মান। এমন কি, এই ছিরুকেও স্কুলের হেডপণ্ডিত তোষামোদ করিতেন,—প্রয়োজনমত ছিরুর বাপের কাছে কখনও তালগাছ, কখনও জামগাছ ক্রিয়াকর্ম্মে দশ-পনেরো-সের মাছ চাহিয়া লইতেন। ইহা ছাড়া ঘি, চাল, ডাল, গুড় প্রভৃতি তো নিয়মিত উপহার পাইতেন।

ওই পণ্ডিতটির নির্লজ্জ লোভের কথা মনে করিলে দেবুর সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠে। বিশ বৎসর বয়সে ছিরু স্কুলের ফিফ্‌থক্লাস হইতে বিদায় লইলে, পণ্ডিত ছিরুর বাপকে বলিয়াছিল—ছেলেকে সংস্কৃত পড়াও মোড়ল।

ছিরুর বাপ ব্রজবল্লভ ছিল শক্তিশালী চাষী—নিজের পরিশ্রমের সাধনায় সে ঘরে লক্ষ্মীর কৃপা আয়ত্ত করিয়াছিল, কিন্তু নিজে ছিল মূর্খ। তাই বড় সাধ ছিল ছেলেটি তাহার পণ্ডিত হয়। ছিরু বিশ বৎসর বয়সে—পশু-স্বভাবসম্পন্ন হইয়া উঠায় বেচারার মনস্তাপের সীমা ছিল না। পণ্ডিতের কথায় সে ছেলেকে পণ্ডিতের ছাত্র করিয়া দিল। ছিরু প্রথমটা আপত্তি করে নাই। পণ্ডিত পড়াইতে আসিয়া গল্প বলিতেন। বিশেষ করিয়া বয়স্ক বিবাহিত ছাত্রের কাছে—তিনি আদিরসাশ্রিত সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া এবং ঐ ধরণের গল্প বলিয়া বৎসর চারেক নিয়মিতভাবেই বেতন লইয়াছিলেন। চারি বৎসর পর ছিরু আবার বিদ্রোহ করিল। ছিরুর বাপ কিন্তু নাছোড়-বান্দা। ছিরু তখন পণ্ডিতের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ধরিল—সংস্কৃত পড়িয়া কি হইবে? পড়িতে হইলে সে ইংরাজীই পড়িবে।

ইংরাজী পড়াইবার গৃহশিক্ষক কিন্তু পণ্ডিতের ডবল বেতন দাবী করিল। ছিরু তখন ধরিল—সে স্কুলেই পড়িবে। চব্বিশ বৎসর বয়সে সে আবার আসিয়া ফিফ্‌থ্‌ক্লাসে বসিল। দেবুও তখন ফিফ্‌থ্‌ ক্লাসে উঠিয়াছে। হঠাৎ ছিরুর নজর পড়িল দেবুর উপর। দেবুর পাশে অনি-কামার। স্কুলে পড়িবার কথা যখন সে বলিয়াছিল—তখন এই কথাটা ছিরুর মনে হয় নাই। তাহার কল্পনা ছিল অন্য রকম। স্কুলে পড়িবার নাম করিয়া সে কঙ্কণা অথবা স্বগ্রামের নীচ জাতীয়দের পল্লীতে দিনটা কাটাইয়া আসিবে। কিন্তু দেবুকে এবং অনিরুদ্ধকে ক্লাশে দেখিয়া সে আর মাথা ঠিক রাখিতে পারিল না। সঙ্গে সঙ্গেই সে বই-খাতা লইয়া উঠিয়া চলিয়া আসিল। বাড়ী চলিয়া আসিল না। সেই পথে-পথেই সে গিয়া উঠিল তাহার মাতামহের বাড়ী। সেখানে গিয়াই তাহার জীবনের আদর্শ গুরু ত্রিপুরা সিংকে পাইয়া ছিল। জীবনে পথ দেখায় যে—সে-ই মানুষের গুরু; মাতামহের মনিব ত্রিপুরা সিংকে দেখিয়া ছিরু তাহাকেই মনে মনে গুরু পদে বরণ করিয়া নিজের কর্ম্ম-জীবন-যাত্রা সুরু করিল। কিন্তু চব্বিশ বৎসর বয়সে ছিরু যেদিন ক্লাশে আসিয়া বসিয়াছিল—সেদিনও পণ্ডিত আসিয়া বলিয়াছিলেন—খবরদার, ছিরুকে দেখে কেউ হেসো না। তাঁহার মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল না—ছিল খাতির।...সে কথা দেবুর আজও মনে আছে।

স্কুলের মধ্যে সকলের চেয়ে সম্মানের পাত্র ছিল কঙ্কণার মুখুজ্জেদের মূর্খ ছেলেটা। তিন-তিনজন গৃহশিক্ষক সত্ত্বেও কোনও বিষয়ে তাহার পরীক্ষার নম্বর চল্লিশের কোঠাও পৌছিত না। একবার সে সঙ্গীদের মধ্যে রহস্য করিয়া বলিয়াছিল—গাধা পিটে কখনও ঘোড়া হয় না। কথাটা ছেলেটার কানে উঠিতেই সে সোরগোল তুলিয়া ফেলিল; সেই সোরগোলে একেবারে শিক্ষকমণ্ডলী পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিলেন।

আপিসে ডাকাইয়া আনিয়া হেড্‌মাষ্টার তাহাকে ক্ষমা চহিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। একজন শিক্ষক বলিয়াছিলেন—গাধা নয় রে গাধা নয়, হাত্তী—হাতীর বাচ্চা। গজেন্দ্রগমন একটু ধীরই বটে। আজ বুঝবি না বড় হ'লে বুঝবি।....

সে-কথাটা এখন সে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছে। বাবুদের সেই ছেলেটি বারদু'য়েক ফেল করার পর শেষে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আজ লোকালবোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। প্রতিমাসে দেবুকে ইউনিয়ন-বোর্ডে গিয়া পাঠশালার সাহায্যের জন্য তাহার সম্মুখে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। ছিরু পালও সম্প্রতি ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে সে-ও আসিয়া জিজ্ঞাসা করে—কি গো, পাঠশালা চ'লছে কেমন?

দেবুর মাথার মধ্যে আগুন উঠে।....

সেদিন একখানা ছেলেদের বইয়ে একটা ছড়া দেখিল—"লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" দেবু সে লাইনটি বার বার কলম চালাইয়া কাটিয়া দিল। তারপর বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিয়া দিল—লেখাপড়া করে যেই—মহামানী হয় সেই।

তারপর আরম্ভ করিল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প।

মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, সে যদি ইউনিয়ন বোর্ডের ওই প্রেসিডেণ্টের আসনে বসিতে পারিত, তবে সে দেখাইয়া দিত ওই আসনের মর্য্যাদা কত! কত—কত—কত কাজ সে করিত! সে কল্পনা করিত—অসংখ্য পাকা রাস্তা! প্রতিগ্রাম হইতে লাল কাঁকরের সোজা রাস্তা বাহির হইয়া মিলিত হইয়াছে এই ইউনিয়নের প্রধান গ্রামে—একটি কেন্দ্রে; সেখান হইতে একটি প্রশস্ত রাজপথ চলিয়া

গিয়াছে জংসন সহরে। ওই রাস্তা দিয়া চলিয়াছে সারি সারি ধান-চালে বোঝাই গাড়ী, লোকে ফিরিতেছে পণ্য-বিক্রয়ের টাকা লইয়া, ছেলেরা স্কুলে চলিয়াছে ওই পথ ধরিয়া। সমস্ত গ্রামের জঙ্গল সাফ হইয়া—ডোবা বন্ধ হইয়া একটি পরিচ্ছন্নতায় চারিদিক ভরিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত স্থানগুলিতে ছড়াইয়া দিয়াছে দোপাটি ফুলের বীজ; দোপাটি শেষ হইলে গাঁদার বীজ। ফুলে ফুলে গ্রামগুলি আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিগ্রামের প্রতিপল্লীতে একটি করিয়া পাকা ইঁদারা খোঁড়া হইয়াছে। কোন পুকুরে এক কণা আবর্জ্জনা নাই, কালো জল টলটল করিতেছে—পাশে-পাশে ফুটিয়া আছে শালুক ও পানাড়ীর ফুল। কোর্ট-বেঞ্চের সুবিচারে সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের প্রতিবিধান হইয়াছে—কঠিন-হস্তে সে মুছিয়া দিতেছে উৎপীড়ন ও অবিচার।...এই সমস্তই সে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে; সুযোগ পাইলে সে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে; সুযোগ পাইলে সে প্রমাণ করিয়া দিতে পারে যে, স্থুলকায় মন্থরগতি চতুষ্পদ হইলেই সে হাতী নয়, সোনার ক্ষুর-বাঁধানো হৃষ্টপুষ্ট সে গর্দ্দভ মাত্র।

ঈর্ষার উত্তেজনায়, কর্ম্মের প্রেরণায় সে অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, দ্রুতপদে ঘুরিয়া বেড়ায়, মধ্যে মধ্যে হাতখানা ভাঁজিয়া অতি দৃঢ় মুঠা বাঁধিয়া পেশী ফুলাইয়া কঠিন কঠোর করিয়া তোলে। সকল দেহমন ভরিয়া সে যেন শক্তির আলোড়ন অনুভব করে।

তাহার স্ত্রীটি বড় ভাল মেয়ে। ধব্‌ধবে রঙ, থ্যাদা-নাক, মুখখানি কোমল—অতি মিষ্টি তাহার চোখের দৃষ্টি; আকারে ছোটখাটো, মাথায় একপিঠ চুল—সরল সুন্দর তাহার মন। তাহার উপরে দেবুর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বামীর সংস্পর্শে আসিয়া আপনাকে সে একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দেবুর এই মূর্ত্তি দেখিয়া সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—ও কি হচ্ছে গো? আপনার মনে—!

দেবু হাসিয়া বলে—ভাবছি আমি যদি রাজা হ'তাম।

—রাজা হ'তে!

—হ্যাঁ। তা হ'লে তুমি হতে রাণী।

—হ্যাঁ?...তাহার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না।

—কিন্তু রাণী হ'লেও তোমার গয়না থাকত না।

অভিভূতা হইয়া বধূটি স্তব্ধ হইয়া থাকে।

দেবু হাসিয়া বলে—এ রাজার রাজ্য আছে, কিন্তু খাজনা পায় না। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট—বুঝেছ?...

অন্তরে শুভ আকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চ-কল্পনা থাকিলেই সংসারে তাহা পূর্ণ হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই পৃথিবীতে বড় শক্তি। বার বার চেষ্টা করিয়া দেবু সেটা উপলব্ধি করিয়াছে। শীতকালে বর্ষা নামিলেও ধানের চাষ অসম্ভব। বর্ষার সময় খুব উঁচু জমি দেখিয়া দেবু একবার আলুর চাষ করিয়াছিল; কিন্তু আলুর বীজ অঙ্কুরিত হইয়াই মরিয়া গিয়াছে। যে দুই-চারিটা গাছ হইয়াছিল—তাহাতে যে আলু ধরিয়াছিল, মটর কলাইয়ের মত তাহার আকার। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে রুদ্ধ রাখিয়া সে নীরবে পাঠশালার কাজ করিয়া যায়। তাহার গ্রামখানির ভবিষ্যৎ রূপকে মাতৃগর্ভের ভ্রূণের মত বিধাতার কল্পনায় গঠন করিবার চেষ্টা করে। গ্রামের ছোট-খাটো সকল আন্দোলন হইতে সে নিজে যথাসাধ্য পৃথক থাকিতে চায়। কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাহার আকাঙ্ক্ষা-কল্পনা এমনি ধারার আন্দোলন উত্তেজনার স্পর্শ পাইবামাত্র নাচিয়া বাহির হইয়া আসে।

গ্রামখানির অভাব-অভিযোগ, ত্রুটি-বিশৃঙ্খলা তাহার নখদর্পণে। গ্রামের সামাজিক ইতিহাস সে আবিষ্কারকের মত সংগ্রহ করিয়াছে। গ্রামের কামার, ছুতার, নাপিত, পুরোহিত, দাই, চৌকিদার, ধোপা

প্রভৃতির কাহার কি কাজ, কি বৃত্তি, কোথায় ছিল তাহাদের চাকরাণ জমি, সমস্তই সে যেমন জানে—এমনটি আর কেহ জানে না। বিগত পাঁচ পুরুষের কালের মধ্যে গ্রামের পঞ্চায়েৎ-মণ্ডলীর কীর্ত্তি-অপকীর্ত্তির আমূল ইতিহাস তাহার কণ্ঠস্থ।

(চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে দেবু ঘোষ চণ্ডীমণ্ডপটির কথা ভাবে। এই চণ্ডীমণ্ডপটি একদিন ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, জীবনী-শক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজাপার্ব্বণ, আনন্দ, উৎসব, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—সব অনুষ্ঠিত হইত এইখানে। অন্যায়-অবিচার-উৎপীড়ন, বিশৃঙ্খলা-ব্যভিচার-পাপ গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে, এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসিত পঞ্চায়েৎ। এই আসরে বসিয়া বিচার চলিত, শাসন করিয়া সে সমস্ত দূর করা হইত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর হইতে সে ডাক শোনা যায়,—সে ডাক উপেক্ষা করিবার কাহারও সামর্থ ছিল না। তাহার আজও মনে আছে, চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়া সেকালে যে যতবার যাইত প্রণাম করিয়া যাইত। আজকাল আর মানুষ প্রণামও করে না। মধ্যে মধ্যে তাহার মনে হয়, দেবতাকে—ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াই তাহারা এই পরিণতির পথে চলিয়াছে। দেবু নিত্য-নিয়মিত তিন সন্ধ্যা এখানে প্রণাম করে। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম' নীরবে সে পরকে শিখাইতে চায়।)

(নাস্তিকতার পরিণাম সম্পর্কে একটি ঘটনার কাহিনী তাহার অন্তরে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। তাহার অবশ্য শোনা কথা, তাহার জীবনকালে ঘটিলেও সে তখন ছিল নিতান্তই শিশু। তাহার বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথ মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্নের পৌত্র। বিশ্বনাথের পিতা পণ্ডিত শশীশেখরের কাহিনী। পণ্ডিত শশীশেখর তাহার পিতা ওই ঋষিতুল্য ন্যায়রত্নের অমতে ইংরাজী শিখিয়া নাস্তিক

হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ দেশে ব্রাহ্মণসভার অধিবেশনের তিনিই ছিলেন উদ্যোক্তা। সে অধিবেশনে তিনি সর্ব্বাগ্রে নারায়ণশিলা স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা না করার জন্য ন্যায়রত্ন শিহরিয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করেন। নাস্তিক শশীশেখর নাস্তিকতা-বাদের যুক্তিতে পিতার সহিত তর্ক করেন। ফলে সভা পণ্ড হয়। শুধু তাই নয়, উদ্‌ভ্রান্ত শশীশেখরের মৃত্যু হয় অপঘাতে; রেল এঞ্জিনের তলায় স্বেচ্ছায় কাটা পড়েন। ঘটনার সংঘটন তাই বটে, কিন্তু দেবু ঘোষ তাহার মধ্যে দেখিতে পায় কর্ম্মফলের অলঙ্ঘ্য বিধান। দেবুর সব চেয়ে দুঃখ—পিতার এই পরিণতি জানিয়াও ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথও নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে। সে এখন কলিকাতায় এম-এ পড়ে। যখন আসে তখন দেবুর সঙ্গে দেখা করে। এম-এ ক্লাশের ছাত্র হইয়াও কিন্তু বিশ্বনাথ এখনও তাহার বন্ধুই আছে। বয়সে সে দেবুর চেয়ে পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট হইলেও দেবুর বন্ধু সে; স্কুলে ভাল ছেলে বলিয়া তাহাদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তখন বিশ্বনাথ তাহাকে দেবু-দা বলিত। বয়সের সঙ্গে দেবু আপনার ও বিশ্বনাথের সামাজিক পার্থক্য বুঝিয়া বলিয়াছিল—তুমি আমাকে দাদা ব'ল না কিন্তু ভাই, আমার ওতে অপরাধ হয়!···বিশু তখন হইতে দেবুকে বলে দেবু-ভাই। এখন তাহারা বন্ধু—সত্যকারের বন্ধু। কখনও শ্রেষ্ঠত্বের একবিন্দু তীক্ষ্ণাগ্র কণ্টক-স্পর্শ সে তাহার সান্নিধ্যে অনুভব করে না। বিশ্বনাথ সন্ধ্যাহ্নিক করে না, এই চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়াও কখনও দেবতাকে প্রণাম করে না।

দেবু কিছুদিন আগে এই চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধে তাহার চিন্তার কথা বিশ্বনাথকে বলিয়াছিল; কি করিয়া এই চণ্ডীমণ্ডপটির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করা যায়, সে-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিল। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিয়াছিল—সে আর হবে না, দেবু ভাই। চণ্ডীমণ্ডপটা বুড়ো হয়েছে, ও ম'রবে এইবার।

—বুড়ো হ'য়েছে ? ম'রবে ? মানে ?

—মানে, বয়স হ'লেই মানুষ যেমন বুড়ো হয়, তেমনি চণ্ডীমণ্ডপটা কতকালের বলতো ? বুড়ো হবে না ?

চাল-কাঠামোর দিকে চাহিয়া দেবু বলিয়াছিল—ভেঙে নতুন ক'রে ক'রতে ব'লছ ?

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল ; বলিয়াছিল—রঙিন পেনী-ফ্রক পরালেই বুড়ো খোকা হয় না, দেবু ভাই। এ যুগে ও চণ্ডীমণ্ডপ আর চ'লবে না। কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ক'রতে পার ? কর-না ওই ঘরটাতে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, দেখবে দিনরাত লোক আসবে এইখানে। ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকবে।)

তারপর সে অনেক যুক্তিতর্ক দিয়া দেবুকে বুঝাইতে চাহিয়াছিল—টাকাই সব। সেকালের ধর্ম্মসম্মত সামাজিক ব্যবস্থার ভিতরেও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে নাকি ওই টাকাটাই ছিল ভিত্তি। ভিত্তির সেই টাকার ভাণ্ডারটা আজ শূন্য হইয়া যাওয়াতেই এই অবস্থা।

দেবু বারবার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিল—না—না—না।

বিশ্বনাথ হাসিয়াছিল।

দেবু প্রতিবাদ করিয়া তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছিল—ছি—ছি—ছি, বিশু ভাই। তুমি ঠাকুর মশায়ের নাতি, তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না। তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।

বিশ্বনাথ আরও কিছুক্ষণ হাসিয়া অবশেষে বলিয়াছিল—আমি কতকগুলো বই পাঠিয়ে দেব, দেবু ভাই, তুমি পড়ে' দেখ।

—না। ওই সব বই ছুঁলে পাপ। ও-সব বই তুমি পাঠিয়ো না।

(সে প্রাণপণে আপন সংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। তাহাকে সে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। তাই নবান্নের দিনে অনিরুদ্ধকে এই চণ্ডীমণ্ডপে পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে সামাজিক

শাস্তি দিবার জন্য জগনের সহিত মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।) কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, প্রতিবাদ না করিলেও অন্য একজনও কেহ তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল না। অনিরুদ্ধও বিনা দ্বিধায় অবলীলাক্রমে ভোগ পূজার থালা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধের পিতৃ-পিতামহের এ সাধ্য ছিল না।

দেবু দিশাহারা হইয়া কয়দিন ধরিয়াই ভাবিতেছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়, হয়তো দেবতা একদিন আপন মহিমায় জাগ্রত হইবেন—অন্যায়কে ধ্বংস করিবেন, ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। শাস্ত্রোক্ত বাণীগুলি সে স্মরণ করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, কিছুক্ষণ পরেই সে হতাশায় অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পাতু মুচী সেই একটি দিন চাহিয়াই বাঁচিয়া আছে। সেই ভরসায় সে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের বোঝা মাথায় লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সে যে তাহাদের মত কোনমতেই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না!

* * * *

(পাঠশালার ছুটি দিয়াও দেবু একা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। পথ হইতে কে ডাকিল—পণ্ডিতমশায় গো!

—কে?

—ওরে বাস্‌রে! ব'সে ব'সে কি এত ভাবছ গো?·· মুচীদের দুর্গা দুধ বেচিতে যাইতেছিল, পথ হইতে দেবুকে ডাকিয়া সে-ই কথা বলিল।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—সে খবরে তোর দরকার কি রে?

মেয়েটাকে সে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না; সে স্বৈরিণী—সে ভ্রষ্টা—সে পাপিনী; বিশেষ করিয়া সে ওই ছিরুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তাহাকে সে ঘৃণা করে।)

দুর্গা হাসিয়া বলিল—খবরে আমার দরকার নাই, দরকার তোমার বউয়ের। পথের পানে চোখ চেয়ে বিলু দিদি দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

—তাই তো!···দেবুর এতক্ষণে চমক ভাঙিল, সে তাড়াতাড়ি উঠিল। ওঃ বেলা অনেক হ'য়েছে!·সে হন্-হন্ করিয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। ভালমানুষ বউটি বলিল—রান্না হ'য়ে গিয়েছে, চান কর!·(দেবুর জীবনে এই এক পরম সম্পদ। ঘরে তাহার কোন দ্বন্দ্ব নাই, অশান্তি নাই। তাই বোধ হয়, তাহার বাহিরে বাহিরে সমগ্র গ্রামখানির মধ্যে দ্বন্দ্ব-অশান্তি সন্ধান করিয়া ফিরিয়াও তাহার ক্লান্তি আসে না।)

(দেবু চলিয়া গেলেও দুর্গা অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল; দেবু যে পথে গেল, সেই পথ-পানে চাহিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। পণ্ডিতকে তাহার ভাল লাগে—খুব ভাল লাগে। ছিরুকে সে এখন ঘৃণা করে; সেই আগুন লাগানোর সংবাদ সে কাহাকেও বলে নাই; ঘৃণায় তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ছিরুর সহিত যখন তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল—তখনও তাহার পণ্ডিতকে ভাল লাগিত; ছিরু অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল লাগিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই দুই ভাল-লাগার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না। আজ পণ্ডিতকে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আরও বেশী ভাল লাগিল।)

বারো

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে 'ইতুলক্ষ্মী'-পর্ব্ব আসিয়া গেল।

অন্যান্য প্রদেশে—বাংলাদেশের বিশেষ অঞ্চলে কার্ত্তিক-সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মিত্র-ব্রত আরম্ভ হয়, শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবিশস্যের কল্যাণ-কামনা করিয়া সূর্য্য-দেবতার উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উদ্ভব। দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া রবি-দেবের আরাধনার প্রচলন নাই। এ দেশে রবিশস্যের চাষেরও বিশেষ প্রসার

নাই; ধান-চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকর্ম। ইতু-পর্ব্বকে এখানে ইতুলক্ষ্মী-পর্ব্ব বলা হয়। হৈমন্তীধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ-প্রারম্ভের পর্ব্ব এটি। চাষীদের আপন আপন খামারে ইহার অনুষ্ঠান হয়। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত একটি বাঁশের খুঁটা পুঁতিয়া সেই খুঁটার তলায় আল্পনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মীর পূজা-ভোগ হয়। ধান মাড়াইয়ের সময় ওই খুঁটিটির চারিদিকেই ধানশুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু-মহিষগুলি ওই খুটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে পোয়ালের উপর পাক দিয়া ফিরিবে। তাহাদের পায়ের পেষণে খড় হইতে ধান ঝরিয়া যাইবে।

এ-পর্ব্বের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের সম্বন্ধ বিশেষ নাই! তবে মেয়েরা প্রাতঃকালে স্নান করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করিয়া লক্ষ্মী পাতিবে না। পূর্ব্বকালে আরও খানিকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দেবুর মনে আছে, পনেরো বৎসর পূর্ব্বেও লক্ষ্মীপূজার শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা আসিয়া এইখানে সমবেত হইয়া সুপারী হাতে ব্রত-কথা শুনিতে বসিত। গ্রামের প্রবীণা কেহ ব্রত-কথা বলিতেন। আজকাল সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে। এখন দুই-তিন বাড়ীর মেয়েরা কোন এক বাড়ীতে একত্রিত হইয়া ব্রতকথা শুনিয়া লয়। দেবুর বাড়ীতেও এই ব্রতকথার আসর বসে।...আজ দেবু পাঠশালায় পড়াইতে পড়াইতে ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। তাহার মনে সেদিন হইতে সমস্ত প্রেরণা-শক্তি ক্ষুব্ধ আহত হইয়া অহরহ তাহাকে পীড়িত করিতেছে। যে-কোন সুযোগ পাইলেই তাহা অবলম্বন করিয়া আবার সে খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে চায়। জগন ডাক্তারের সহিত যোগাযোগ আবার স্বাভাবিক নিয়মের বশে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। জগন ডাক্তারের ওই দরখাস্ত করার পন্থাটাকে সে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে পারে না। দরখাস্তের কথায় তাহার হাসি আসে; অন্তর জ্বলিয়া উঠে।...

সে সাহিত্য পড়াইতেছিল—

"অট্টালিকা নাহি মোর নাহি দাস-দাসী,
ক্ষতি নাই, নহি আমি সে সুখ-প্রয়াসী।
আমি চাই ছোট ঘরে বড় মন লয়ে,
নিজের দুঃখের অন্ন খাই সুখী হয়ে।
পরের সঞ্চিত ধনে হ'য়ে ধনবান,
আমি কি থাকিতে পারি পশুর সমান?"

সহসা তাহার নজরে পড়িল—একটি দীর্ঘাঙ্গী অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে পথের ধার হইতেই চণ্ডীমণ্ডপের দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিল। চণ্ডীমণ্ডপে সে বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই উঠিল না; কারণ তাহার পদক্ষেপে কোন ব্যস্ততার লক্ষণ দেখা গেল না। দেবু তাহাকে চিনিল, —অনিরুদ্ধের স্ত্রী। বুঝিল, নবান্নের দিনের সেই ঘটনার জন্যই অনিরুদ্ধের স্ত্রী চণ্ডীমণ্ডপের উপরে উঠিল না। (মুহূর্তে দেবুর মন খারাপ হইয়া গেল। অনিরুদ্ধের স্ত্রী ওই-যে নীরবে পথের উপর হইতে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, তাহার প্রতিটি ভঙ্গি যেন রুদ্ধ-বেদনায় ব্যথিত বিষণ্ণ বলিয়া তাহার মনে হইল। একা আসিয়া একা চলিয়া গেল; যেন বলিয়া গেল—একা আমিই কি দোষী?···দেবু অনিরুদ্ধের স্ত্রীর গমন-পথের দিকেই চাহিয়া রহিল; মেয়েটির ধীর পদক্ষেপ যেন ক্লান্ত বলিয়া তাহার মনে হইল। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া পারিল না। কাজটা সত্যই অন্যায় হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তটিতে তাহার বিচারবুদ্ধির ভ্রান্তি স্বীকার না করিয়া পারিল না।) অনিরুদ্ধের অন্যায়ের চেয়ে গ্রামের লোক যে অনিরুদ্ধের প্রতি অন্যায় করিয়াছে বেশী! ধান না দেওয়ার জন্যই অনিরুদ্ধ কাজ বন্ধ করিয়াছে। মজলিসে ছিরু আগে অপমান করিয়াছে, তবে অনিরুদ্ধ উঠিয়া গিয়াছিল। অনিরুদ্ধের চার বিঘা বাকুড়ির ধান কাটিয়া

লওয়ার প্রতিকার যখন কেহ করিতে পারে নাই, তখন অনিরুদ্ধকে শাস্তি দিবার অধিকারই বা কাহার আছে ? অকস্মাৎ সে বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিল, মনের চিন্তা-ধারায় একটা ছেদ পড়িয়া গেল।.... একি ! (অনিরুদ্ধের স্ত্রী তাহার বাড়ীর দিকেই যাইতেছ কেন ?...)

পাঠশালার ছেলেগুলা পণ্ডিতের স্তব্ধতার অবকাশ পাইয়া উস্‌খুস্‌ করিতে সুরু করিয়াছিল। একটি ছেলে বলিল—আজ ইতুলক্ষ্মী, মাস্টার মহাশয়, আজ আমাদের হাপ্‌-ইস্কুল হয়। ন'টা বেজে গিয়েছে ঘড়িতে।

দেবুর সম্মুখেই থাকে একটা টাইমপিস্‌। দেবু ঘড়িটার দিকে চাহিয়া আবার পড়াইতে সুরু করিল—

"শৈশব না যেতে ক্ষেতে শিখিয়াছি কাজ,
সেই তো গৌরব মোর তা'তে কিবা লাজ ?"

ধীরে ধীরে সমস্ত কবিতাটি শেষ করিয়া দেবু বলিল—কালকে এই পদ্যটির মানে লিখে আনবে সবাই। মানে ব'লতে কথার মানে নয়, কে কি বুঝেছ লিখে আনবে।...

পাঠশালার ছুটি দিয়া সে আজ সঙ্গে-সঙ্গেই আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। বাড়ীর উঠানে তখন তাহার স্ত্রীর সম্মুখে বসিয়া আছে পদ্ম, অদূরে বসিয়া আছে দুর্গা ; তাহার স্ত্রী ইতুলক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতেছে। দেবুর স্ত্রী বড় ভাল কথা বলিতে পারে, এ পাড়ায় ব্রত-কথার আসর তাহার ঘরেই বসে। সে আসর শেষ হইয়া গিয়াছে। এ বোধ হয় দ্বিতীয় দফা। (দেবুর শিশু-পুত্রটিকে কোলে লইয়া পদ্ম বসিয়াছিল, দেবুকে দেখিয়া সে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল। দেবুর স্ত্রীও ঘোমটা অল্প একটু টানিয়া হাসিল। দুর্গা কাপড়চোপড় সামলাইয়া গুছাইয়া বেশ একটু বিন্যাস করিয়া বসিল। তাহারও মুখে ফুটিয়া উঠিল মৃদু-হাসি।) কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করিবার মত মনের অবস্থা দেবুর ছিল না। (ব্রতকথা

তাহার স্ত্রী ভাল বলে—চমৎকার বলে, তাহাদের পাড়ার সকলেই প্রায় ব্রতকথা শুনিতে তাহার বাড়ীতে আসে; কিন্তু আজ কামার বউয়ের তাহার বাড়ীতে আসাটা যেমন অস্বাভাবিক—তেমনি বিস্ময়কর।

নবান্নের দিন দেবু ওই বধূটিকে কঠোরভাবে ভোগ ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিল। কিছুক্ষণ আগেই পদ্ম পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপের দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছে, চণ্ডীমণ্ডপে উঠে নাই, অথচ তাহারই বাড়ীতে ব্রতকথা শুনিতে আসিয়াছে,—এ ব্যাপারটা সত্যই বিস্ময়কর। দেবু থমকিয়া দাঁড়াইল, পদ্মকে কোন কথা বলিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল দুর্গাকে—কি রে দুর্গা ?

দুর্গার মুখে মৃদু হাসি বিকশিত হইয়া উঠিল, হাসিয়া সে বলিল—কথা শুনতে এসেছি দিদির কাছে। এমন কথা কেউ ব'লতে পারে না, বাপু। হাজার হোক পণ্ডিত-গিন্নী তো ?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দেবু বলিল—দিদি ?....কথাটা তাহাকে পীড়া দিয়াছিল।

—হ্যাঁ গো। দিদি! তোমার গিন্নীর সঙ্গে দিদি পাতিয়েছি; তুমি আমার জামাইবাবু।

দেবুর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল; কঠোরস্বরেই বলিল—মানে? ও দিদি কি ক'রে হ'ল তোর।

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—হেই মা! আমার মামার বাড়ী যে তোমার শ্বশুরের গাঁয়ে গো! মামারা দিদিদের বাপের বাড়ীর খেয়ে মানুষ—পুরানো চাকর! দিদি যে আমার মামাকে কাকা বলে; তা হ'লে আমার দিদি নয় ?

ভাল না লাগিলেও প্রসঙ্গটা সম্পর্কে তাহাকে নীরব হইতে হইল। শুধু বলিল—হুঁ।....তারপর স্ত্রীকে বলিল—উটি আমাদের কর্ম্মকারের, মানে অনিরুদ্ধের স্ত্রী নয় ?

দীর্ঘ অবগুণ্ঠন পদ্ম আরও একটু বাড়াইয়া দিল। দেবুর স্ত্রী চাপা-গলায় বলিল—হ্যাঁ।

দুর্গা সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল—কামার-বউয়ের কথা শোনা হয় নাই। ওদের বাড়ী গেলাম তো দেখলাম—ভাম হ'য়ে ব'সে ভাবছে। উ পাড়ার কথা হয় ওই পালের বাড়ীতে—ছিরু পালের বাড়ীতে। ওদের বাড়ী যায় না কামার-বউ; তাতেই বল্লাম—এসো, আমার দিদির বাড়ীতে এস।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—কামার-বউ ভয় ক'রছিল, পণ্ডিতমশায় যদি কিছু বলে। সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে তুমি নাকি বলেছিলে—

মধ্যপথেই বাধা দিয়া দেবু বলিল—অনিরুদ্ধ যে মহা অন্যায় ক'রেছে।

অকুণ্ঠিতস্বরে অভিযোগ করিয়া দুর্গা বলিল—তোমার মত লোকের যুগ্যি কথা হ'ল না, পণ্ডিতমশায়। অন্যায় কি একা কর্ম্মকারের? বল তুমি?

দেবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা বটে! বুঝতে আমার ভুল খানিকটা হ'য়েছিল।....সুযোগ পাইয়া বিনা দ্বিধায় সে ওই দুর্গার কাছেও কথাটা স্বীকার করিয়া ভারমুক্ত হইতে চাহিল।

দেবুর স্ত্রী চাপা গলাতেই ব্যস্ত হইয়া বলিল—কেঁদ না ভাই, কামার-বউ, কেঁদ না।

পদ্ম ঘোমটার কাপড় দিয়া বারবার চোখ মুছিতেছিল, সেটা সে লক্ষ্য করিয়াছিল।

দেবু ব্যস্ত হইয়া বলিল—না, তুমি কেঁদ না। অনিরুদ্ধ আমার ছেলেবেলার বন্ধু; একসঙ্গে পাঠশালায় পড়েছি। তাকে ব'ল, আমি যাব—আমি নিজেই যাব তার কাছে।

দুর্গা পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল—আমি তোমাকে বলেছিলাম তো কামার-বউ, ওই জগন ডাক্তারের মোড়লির পাল্লায় প'ড়ে জামাই আমাদের এ কাজ ক'রেছে।

—না, না, মিছে পরকে দোষ দিস্‌নে দুর্গা। ভুল—আমারই বুঝবার ভুল!....এমন আন্তরিকতা-মাখা কণ্ঠে অকপট স্বীকারোক্তি সে করিল যে দুর্গা পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল।

দেবুই আবার বলিল—ওগো, অনিরুদ্ধের বউকে জল খাইয়ে তবে ছেড়ে দিও।

(—আর আমি?....দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।—ওঃ আমি বুঝি বাদ যাব? বেশ জামাই দাদা যা' হোক।/

স্বৈরিণী মেয়েটার কথা বলার ভঙ্গি, আত্মীয়তার সুর এমন মিষ্ট, মন-কাড়া যে, কিছুতেই রাগ করা যায় না তাহার উপর। তাহার কথায় দেবুর বউ হাসিল, পদ্ম হাসিল; দেবু না হাসিয়া পারিল না। হাসিয়া দেবু বলিল—তোর জন্য ভাবনা তো আমার নয়, সে ভাবনা ভাববে তোর দিদি। আপনার জন থাকতে কি পরের আদর ভাল লাগে রে?)

—টাকার চেয়ে টাকার সুদ মিষ্টি গো; দিদির চেয়ে দিদির বরের আদর মিষ্টি। তা' আমার কপাল!

দেবু হাসিয়াই বলিল—নে, আর ন্যাকামি ক'রতে হবে না, এখন কথা শোন্।....বলিয়া সে ভারমুক্ত লঘুহৃদয়ে ঘরে ঢুকিল।)

* * * *

"দরিদ্র ব্রাহ্মণের পিঠে খাবার সাধ হয়েছে।"

দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা বলিতেছিল। "ব্রাহ্মণ মনে মনেই ভাবেন—চালের পিঠে, সরুচাকলি, মুগের পিঠে, নারকেল পুরের পিঠে, রাঙা-আলুর পিঠে; ভাবেন আর তাঁর জিভে জল আসে।"

ঘরের ভিতর বসিয়া দেবু আপন মনেই হাসিল। জল তাহারও জিভে আসিতেছে; বোধ করি ব্রতকথার কথক ঠাকুরুণ—মায় শ্রোতাদের জিহ্বা পর্য্যন্তও সজল হইয়া উঠিয়াছে।

"কিন্তু সাধ হ'লেই তো হয় না, সাধ্যি থাকা চাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, জমি নাই, জেরাত নাই, চাকরি নাই, যজমান নাই—আজ খেতে কাল জোটে না—চাল, কলাই, নারকেল, গুড়, রাঙাআলু আসে কোথা থেকে? ব্রাহ্মণ হ'য়ে চুরি ক'রতে তো পারেন না!"

দেবু ব্রাহ্মণের সততার তারিফ না করিয়া পারিল না।

"কিন্তু ব্রাহ্মণের বুদ্ধি তো! তিনি এক ফন্দী বের ক'রলেন। তখন অগ্রহায়ণ মাসের শেষ; মাঠ থেকে গেরস্তের গাড়ী গাড়ী ধান আসছে, কলাই আস্‌ছে, গুড় আস্‌ছে, আলু আস্‌ছে, গাড়ীর চাকায় চাকায় পথের মাটি গুঁড়ো হ'য়ে এক হাঁটু ক'রে ধূলো হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ বুদ্ধি ক'রে সন্ধ্যের পর বাড়ীর সামনেই পথের ধূলোর ওপর আর খানিকটা কেটে গর্ত্ত ক'রলেন—তারপর ঢাললেন ঘড়া ঘড়া জল। পরের দিন যত গাড়ী আসে, সব পড়ে ওই কাদার গর্ত্তে। ব্রাহ্মণ সেই গাড়ী তুলতে সাহায্য করেন আর চাষীদের কাছে আদায় করেন—ধানের গাড়ীর থেকে ধান, কলাইয়ের গাড়ী থেকে কলাই, গুড়ের নাগরি থেকে গুড়। এমনি ক'রে ধান, কলাই, গুড়, আলু যোগাড় ক'রে ঘরে তুললেন; তারপর ব্রাহ্মণীকে ব'ললেন—তৈরী কর পিঠে।"

দেবু এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার হাসিতে ব্রতকথা বন্ধ হইয়া গেল। বাহির হইতে দুর্গা প্রশ্ন করিল—পণ্ডিতমশায় হাসছেন ক্যানে গো আপুনি?

দেবু বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—ব্রাহ্মণের বুদ্ধির কথা শুনে।

দেবুর স্ত্রী মৃদু হাসিয়া ঘোমটা আরও একটু বাড়াইয়া দিল। বলিল—কথাটা শেষ ক'রতে দাও, বাপু।

—আচ্ছা—আচ্ছা।....বলিতে বলিতে দেবু বাহির হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

পরিতুষ্ট লঘু-মন লইয়া দেবু বাহিরে আসিয়া পথের ধারে দাঁড়াইল। পল্লীগ্রামে জলখাবার বেলা হইয়াছে। মাঠ হইতে চাষীরা বাড়ী ফিরিতেছে। চাষী-শ্রমিকেরা মাঠেই জল খায়, তাহাদের জলখাবার লইয়া মেয়েরা চলিয়াছে মাঠে; মাথায় তাহাদের গামছায় বাঁধা জলখাবারের পাত্র—কাঁকালে ঝুড়ি, হাতে জলের ঘটি। পুরুষদের জলখাবার খাওয়াইয়া, এই ধান কাটার সময় তাহারা ধানের শীষ সংগ্রহ করিবে, বনজঙ্গল হইতে শুকনা কাঠ ভাঙিয়া জ্বালানি সংগ্রহ করিবে।

দুই-চারিখানা ধান বোঝাই গাড়ীও মাঠ হইতে ফিরিতেছে। অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি—ইহারই মধ্যে গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা ময়দার মত ধূলায় ভরিয়া উঠিয়াছে; হেমন্তের শেষ দিন—রৌদ্রের রঙে বৃদ্ধের পাংশু দেহবর্ণের মত শীতের পীতাভ আমেজ। গাড়ীর চাকায় উৎক্ষিপ্ত ধূলায় সে রৌদ্রও ধূলি-ধূসর। চণ্ডীমণ্ডপের একপ্রান্তে ষষ্ঠীতলার বুড়া বকুল গাছটার গাঢ় সবুজ পাতাগুলার উপর ইহারই মধ্যে একটা ধূলার প্রলেপ পড়িয়া গিয়াছে। দেবু অন্যমনস্কভাবে আবার আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিল। চণ্ডীমণ্ডপটারও সর্ব্বাঙ্গে ধূলায় আস্তরণ। এই স্থানটির সঙ্গে তাহার একটি নিবিড় যোগাযোগ আছে যেন।

—হ্যাঁ হে নাতি, বলি, পাঠশালা ভাঙল তোমার? সাড়া-শব্দ কিছু নাই যেন লাগ্‌ছে? জরা-জীর্ণ নারীকণ্ঠের সাড়া আসিল পথ হইতে।

—এস এস, রাঙাদিদি, এস। আজ ইতু-লক্ষ্মী, হাফ স্কুল।....দেবু সাগ্রহে তাহাকে একটু অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল।

এক বৃদ্ধা—এ গ্রামের রাঙাদিদি, প্রবীণদের ভাল-পিসি। তেল মাখিয়া একগাছি ঝাঁটা হাতে আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উঠিল। বৃদ্ধা এই গ্রামেরই মেয়ে, সন্তানহীনা; শুধু সন্তানহীনাই নয়—আপনার জনও তাহার কেহ নাই। চোখে এখন ভাল দেখিতে পায় না, কানেও খাটো হইয়াছে; কিন্তু দেহে বেশ সামর্থ্য আছে। এই সত্তরের উপর বয়সেও সে বেশ খাড়া আছে। রাঙাদিদির নাম তাহার নিরর্থক নয়; এখনও তাহার দেহবর্ণ গৌর এবং তাহাতে বেশ একটা চিক্কণতা আছে। লোকে বলে—বুড়ী তেল-হলুদে তাহার দেহটাকে পাকাইয়া তুলিয়াছে; দুই বেলায় পোয়াটাক্ তেল সে সর্ব্বাঙ্গে মাখে, মধ্যে মধ্যে আবার হলুদও মাখে। সে বলে—তোরা সাবাং মাখিস—আমি হলুদ মাখব না?...রোজ স্নানের পূর্ব্বে বুড়ী চণ্ডীমণ্ডপে ঝাঁটা বুলাইয়া পরিষ্কার করিয়া যায়। এটি তাহার নিত্যকর্ম্ম।

—ইতুলক্ষ্মীতে হাপ্ স্কুল বুঝি? তা বেশ ক'রেছিস।....বুড়ী অবিলম্বে ঝাড়ু দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।—কত গান শুনেছি এখানে, ভাই নাতি—নীলকণ্ঠ, নটবর, যোগীন্দ; মতিরায়ও একবার এসেছিল। বড় যাত্রার দল! কেত্তন, পাঁচালী, কত হত ভাই! কি আর দেখলি বল্? সে রামও নাই—সে অযুধ্যেও নাই। চণ্ডীমণ্ডপ নিকুবার জন্যে তখন মাইনে-করা নোক ছিল, দিনরাত তক্-তক্ ঝক্-ঝক্ ক'রত।...

বুড়ী আপন মনেই বকিয়া যায়। জীবনের যত সমারোহের সুখস্মৃতি—সে সমস্তই সে আহরণ করিয়াছে এই স্থানটি হইতে। এইখানে আসিয়া তাহার সব কথা মনে পড়িয়া যায়। রোজ সে এই কথাগুলি বলে।—কত বড় বড় মজলিস ভাই, গাঁয়ের মাতব্বররা এসে

ব'সত, বিচার হ'ত; ভালমন্দতে পরামর্শ হ'ত। তখন কিন্তুক মেয়েদের পা বাড়াবার যো থাকৃত না। ওরে বাস্‌রে, মোড়লদের সে হাঁকাড়ি কি?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি ম'লেই দিদি, চণ্ডীমণ্ডপে আর ঝাঁট পড়বে না।

বুড়ির ঝাঁটা মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গেল, উদাসকণ্ঠে বলিল—মা কালী—বাবা বুড়ো আপনার কাজের ব্যবস্থা ক'রে নেবে রে ভাই।

আবার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বুড়ী বলিল—ম'রবার সময় যেন তোরা ধরাধরি ক'রে এইখানে এনে বুড়ীকে শুইয়ে দিস, ভাই!

দেবু বলিল—তা দোব। তুমি কিন্তু তোমার কিছু পোঁতা টাকা আমাদের দিয়ে যেও—চণ্ডীমণ্ডপটা মেরামত করাব।

(অন্য কেহ এ কথা বলিলে বুড়ী আর বাকী রাখিত না, তাহাকে গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে কাঁদিতে বসিত। কিন্তু দেবু যেন এ গ্রামের অন্য সকল হইতে পৃথক মানুষ। বুড়ী তাহাকে গালিগালাজ না দিয়া বলিল—হঁ্যা নাতি, তুইও শেষে এই কথা বল্‌লি, ভাই? গোবর কুড়িয়ে, ঘুটে বেচে, দুধ বেচে একটা পেটে খেয়ে টাকা জমানো যায়? তুইই বল্ ক্যানে!)

বুড়ী এবার খস্ খস্ করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে ঝাঁটা চালাইতে আরম্ভ করিল। টাকার কথাটা সে আর বাড়াইতে চায় না। টাকার কথা হইলেই বুড়ীর ভয় হয়—হয়তো কেহ কোনদিন রাত্রে তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া পলাইবে। বুড়ীর টাকা কিছু আছে সত্য,—তুই তিন জায়গায় মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। সর্ব্বসমেত দশ কুড়ি পাঁচ টাকা।

* * * * *

মন্থরগতি—উত্তেজনাহীন পল্লীজীবন। ইহারই মধ্যে রাস্তায় মানুষ চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল দুই-একখানা গরুর গাড়ীতে মাঠ হইতে ধান আসিতেছে। কাঁচ্-কোঁচ্-কেঁ্যা—একঘেয়ে করুণ শব্দ উঠিতেছে। কর্ম্মহীন দেবুও অলসভাবে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ছিল। পৌষমাস গেলে—মাঠের ধান ঘরে আসিলে, এ গাড়ী কয়খানাও আর যাওয়া-আসা করিবে না। সেবার বিশুভাই একটা কথা বলিয়াছিল—দেবুর মনে পড়িয়া গেল। বিশ্বনাথ বলিয়াছিল —'আমাদের গ্রামের সেই গরুর গাড়ী চ'ড়ে জীবন-যাত্রা আর বদলাল না। গ্রামগুলো গরুর গাড়ী চ'ড়ে চলে ব'লেই এমন পিছিয়ে আছে, জীবনটাই হ'য়ে গেছে 'ঢিমে তেতালা।' অন্যদেশে চাষের কাজে এখন চল্‌ছে কলের লাঙল, মোটর-ট্রাক্টর।'

দেবু অবশ্য বিশ্বনাথের কথা স্বীকার করে না; কিন্তু গরুর গাড়ী চড়িয়া এখানে যে জীবন চলিয়াছে সে কথা বড় মিথ্যা নয়। ঢিমা-ঢিলা চালে কোনমতে গড়াইয়া চলিয়াছে—ওই চাকার কেঁ্যা-কেঁ্যা শব্দের মত কাতরাইতে কাতরাইতে।...

ভূপাল বাগ্দী চৌকিদার আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—পেনাম পণ্ডিতমশায়!...ভূপালের পিছনে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়ে, হাতে একটি হাঁড়ি।

দেবু অন্যমনস্কভাবেই হাসিয়া বলিল—ভূপাল?

—আজ্ঞে হঁ্যা। একবার নিকিয়ে-চুকিয়ে দিয়ে যাই চণ্ডীমণ্ডপটি। লে গো, লে, সেই উ-পাশ থেকে আরম্ভ কর্‌।

মেয়েটার হাতের হাঁড়িতে ছিল গোবর-মাটির গোলা, সে নিকাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। ভূপাল—সরকারী চৌকিদার, আবার জমিদারের লগদীও বটে; আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র—এই তিন কিস্তির

প্রারম্ভে তিনবার চণ্ডীমণ্ডপ তাহাকে গোলা দিয়া নিকাইতে হয়। লগদীর পাঁচটা কর্ত্তব্যের মধ্যে এটাও একটা।

দেবু এবার সচেতন হইয়া হাসিয়া বলিল—এ যে হরিঠাকুরের পূজো করা হ'চ্ছে ভূপাল। হরিঠাকুর পূজো করে—পাঁচখানা গাঁয়ে, একদিন এক গাঁয়ে গিয়ে একেবারে পাঁচদিনের পূজো ক'রে দিয়ে আসে। আবার পাঁচদিন পরে যায়। পৌষ-কিস্তির যে এখনও অনেক দেরি হে!

পণ্ডিতের কথায় ভূপাল না হাসিয়া পারিল না, বলিল—আজ্ঞে আমাদের যুধিষ্ঠির থানাদারও (চৌকীদার) তাই করে; সন্ঝে-বেলায় বার হয়, রাত্রে তিনবার হাঁক দেবার কথা—ও একেবারেই তিনবার ক'রে হাঁক দিয়ে ঘরে এসে শোয়।

দেবু সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ভূপাল বলিল—আমি সেটি করি না,—পণ্ডিতমশায়। গোমস্তা-মশায় এসে গিয়েছেন আজ।

—এসে গিয়েছেন? এত সকালে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, এবার সকাল-সকালই বটে। সেটেল্‌মেণ্টার এসেছে কিনা।

সেট্‌লমেণ্ট ক্যাম্প?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ধূমধাম কত, তাঁবুটাবু নিয়ে সে বিশ-পঁচিশখানা গাড়ী। শুনছি 'খানাপুরী' আরম্ভ হবে ৭ই পৌষ হ'তে। আজই সন্‌ঝেতে বোধ হয় ঢোল-সহরত হবে। খেয়েই আমাকে যেতে হবে।

—সেটল্‌মেণ্টের খানাপুরী?....সমস্ত মাঠ জুড়িয়া পাকাধান—সেই ধানের উপর লোহার শিকল টানিয়া—বুটজুতায় ধান মাড়াইয়া—খানাপুরী?

ভূপাল বলিল—ধান এবার মাঠেই ঝাড়াই হবে পণ্ডিতমশায়।

দেবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।....এ যে অন্যায়! এ যে অবিচার!

তেরো

"যিনি করেন 'ইতুলক্ষ্মী' তাঁর ভাগ্যি হয় ব্রতকথার 'ঈশ্‌নে'—মানে 'ইশানীর' মত। ধান, কলাই, ছোলা, মুগ, গম, যব, সরষে, তিসি, নানান ফসলে থৈ থৈ করে ক্ষেত; খামারে মরাই বেঁধে ফুরোয় না, একমুঠো তুলতে দুমুঠো হয়। তার ক্ষেতে-খামারে ভাঁড়ারে মা-লক্ষ্মী অচলা হ'য়ে বাস করেন। সন্তান-সন্ততিতে ঘর ভ'রে যায়, গোয়াল ভ'রে ওঠে গরুতে-বাছুরে; গাছ-ভরা ফল—পুকুর-ভরা মাছ, লক্ষ্মীর হাঁড়িতে কড়ি, আট অঙ্গ সোনা-রূপোয় ঝল্ ঝল্ করে। বউ-বেটা আশে, নাতি-নাৎনী পাশে, শুয়ে স্বামীর কোলে—মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে।"

ব্রতকথা শেষ করিয়া 'উলু উলু' হুলুধ্বনি দিয়া দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা শেষ করিয়া প্রণাম করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা এবং পদ্মও হুলুধ্বনি দিয়া প্রণাম করিল। দুর্গার কণ্ঠস্বর যেমন তীক্ষ্ণ, তাহার জিভখানিও তেমনি লঘু চাপল্যে চঞ্চল,—তাহার হুলুধ্বনিতে সমস্ত বাড়ীটা হইয়া উঠিল মুখরিত। প্রণাম করিয়া সুপারীটি দেবুর স্ত্রীর সম্মুখে রাখিয়া সে সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—বিলু দিদি, ভাই কামারবউ মরণ-কালে তোমরা কেউ স্বামী ধার দিয়ো ভাই কিন্তুক!

দেবুর স্ত্রীর নাম বিল্ববাসিনী—ডাক-নাম বিলু। বিলু হাসিল। তাহার স্বামীকে সে জানে, সে রাগ করিল না। অন্য কেহ হইলে এই কথা লইয়া একটা ঝগড়াই বাধাইয়া দিত। এই সুরূপা স্বৈরিণী

মেয়েটা যখন মৃদু বাঁকা হাসি হাসিতে হাসিতে পথে বাহির হয়, তখন এ অঞ্চলের প্রতিটি বধূই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। লজ্জা নাই—ভয় নাই—পুরুষ দেখিলেই তাহার সহিত দুই-চারিটা রসিকতা করিয়া সর্ব্বাঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যায়।

পদ্মও রাগ করিল না। কয়েকদিন হইতেই দুর্গা তাহার বাড়ী আসা-যাওয়া সুরু করিয়াছে। অনিরুদ্ধকে সে একখানা দা' গড়িতে দিয়াছে, সেই তাগাদায় সে এখন দুই বেলা যায় আসে—অনিরুদ্ধের সঙ্গে রঙ্গ-রহস্য করে—হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে পদ্মের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু খরিদ্দারকে কিছু বলা চলে না। তাহা ছাড়াও, ইদানীং পদ্ম যেন অকস্মাৎ পাল্টাইয়া অন্য মানুষ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ যেন তাহার জীবনে একটা সকরুণ উদাসীনতা আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; ঘর ভাল লাগে না, কাজ ভাল লাগে না, অনিরুদ্ধ সম্পর্কেও তাহার সেই সর্ব্বগ্রাসী আসক্তিও যেন হতচেতন বহুবন্ধনের মত ক্রমশ এলাইয়া পড়িয়াছে। অনিরুদ্ধ-দুর্গার রহস্য-লীলা সে চোখে দেখিয়াও কিছু বলে না, বলিতে তাহার ইচ্ছা হয় না। আজও সে রাগ করিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবুর শিশু-পুত্রটিকে আপনার কোল হইতে বিলুর কোলে তুলিয়া দিয়া বলিল—আমার তো ভাই ওইটুকুই পুঁজি! বাদবাকী গরু-বাছুর-বউ-বেটা—বলে "শির নেই তার শিরঃপীড়া!"—নাতি-নাতনী!—বলিয়া সে একটু হাসিল, হাসিয়া বলিল—তাও না-হয় তুই নিস।...তারপর সে উঠিয়া বলিল—চলি ভাই, পণ্ডিতগিন্নী!

বিলু তাহার হাত ধরিয়া বলিল—জল খাবার নেমন্তন্ন দিয়ে গিয়েছে—তোমার বরের বন্ধু। দাঁড়াও একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে যাও!

বিলুর কোলের শিশুটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বার বার চুমা খাইয়া

পদ্ম বলিল—খোকনমণির 'হামি' খেয়ে পেট ভ'রে গিয়েছে। এর চেয়ে মিষ্টি আর কিছু হয় নাকি ?

—না, তা' হবে না !

—তবে দাও ভাই, খুঁটে বেঁধে নিয়ে যাই। ইতুর পেসাদ মুখে না দিয়ে খাই কি ক'রে বল ? পণ্ডিত না হয় এ সব জানে না, পণ্ডিত-গিন্নীকে তো আর ব'লে দিতে হবে না !

পথে বাহির হইয়া দুর্গা বলিল—বিলুদিদি আমার ভারী ভাল মানুষ। যেমন পণ্ডিত, তেমনি বিলুদিদি।

পদ্ম বলিল—আমাকে ভাই ছিরু পালের বাড়ীর সামনেটা পার ক'রে দাও।

—মরণ ! এত ভয় কিসের ? দিনের বেলায় ধ'রে খেয়ে নেবে নাকি ?....দুর্গা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল। কথাটা বলিয়াও দুর্গা কিন্তু পদ্মের সঙ্গে সঙ্গে চলিল !

পদ্ম বলিল—ওকেই বলি ভাগ্যিমানী। বড়লোক না হোক 'ছচল-বচল' সংসার, তেমনি স্বামী আর ছেলেটি—! আহা, যেন পদ্মফুল ! যেমন নরম, তেমনি কি গা-ঠাণ্ডা ! কোলে নিলাম—তা' শরীর আমার যেন জুড়িয়ে গেল।

—মা সোন্দর, তার ওপর বাপ কেমন সোন্দর, ছেলে সোন্দর হবে না !

পদ্ম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—কোনো কথা সে বলিল না। পথে একটা বছর ছয়-সাতের ছোট ছেলে বরবর আনন্দে পথের ধুলার উপর বসিয়া, মুঠা মুঠা ময়দার মত ধূলা আপন মাথায় চাপাইয়া পরমানন্দে হাসিতেছিল। দুর্গা বলিল—এই দেখ, যেমন কপাল—তেমনি গোপাল। যেমন লক্ষ্মীছাড়া বাপ-মা—তেমনি ছেলের রীতকরণ।

ছেলেটি সদ্‌গোপবংশীয় তারিণীচরণের। তারিণীচরণ সর্ব্বস্বান্ত

া, যথাসর্ব্বস্ব তাহার নীলাম হইয়া গিয়াছে। সে এখন বাউড়ী, ডোম প্রভৃতি শ্রমিকদের মত দিন মজুর খাটিয়া খায়। তারিণীর স্ত্রীও উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী, প্রায় সমস্ত দিনটাই ওই বাউড়ী-ডোমের মেয়েদের মত ঝুড়ি লইয়া গ্রামের বনে-বাদাড়ে-বাগানে কাঠ সংগ্রহ করে, শাক টিয়া আনে, ডোবার পাঁক ঘাঁটিয়া মাছ ধরে। ওগুলা কিন্তু তারিণীর স্ত্রীর বাহ্যাড়ম্বর; ওই অজুহাতে সে চুরি করিয়া ফেরে; আম-কাঠাল শসা-কলা-লাউ-কুমড়া কোথায় কাহার ঘরে আছে—সে-সব তাহার নখদর্পণে। শাক-কাঠ সংগ্রহের অছিলায় সে শুধু সুযোগের প্রত্যাশায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আর ওই শিশুটা এমনি করিয়া পথে সিয়া ধূলা মাখে, কাঁদে। কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া আপনিই ঘুমাইয়া পড়ে—আপনাদের ঘরের অনাচ্ছাদিত দাওয়ায় অথবা কোন গাছের তলায়। কোন কোন দিন দূর-দূরান্তেও গিয়া পড়ে; বাপ মায়ে খোঁজে না, চিন্তিত হয় না। ছেলেটা আপনিই আবার ফিরিয়া আসে!

(—সর্ রে, ছেলেটা সর্। ধুলো দিস না, বাপু, কাল ধোয়া কাপড় পরেছি।....দুর্গা রূঢ় তিরস্কারে ছেলেটাকে সাবধান করিয়া দিল।

—ইঃ!...বলিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া ছেলেটা একমুঠা ধূলা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—দোব ছেলের কষা নিঙ্ড়ে।....দুর্গা কঠোরস্বরে শাসাইয়া দিল। ধোয়া কাপড়ে ধূলার ছিটা কোনমতেই তাহার সহ্য হইবে না।

—মিষ্টি দোব, বাবা, মিষ্টি খাবে?...পদ্ম ছেলেটিকে সাদরে সম্ভাষণ করিল।)

ধূলার মুঠা নামাইয়া ছেলেটা বলিল—মিছে কথা।

আপনার খুঁট খুলিয়া পদ্ম বিলুর দেওয়া মিষ্টিটি বাহির করিয়া বলিল—এইবার ধুলো ফেলে দাও, লক্ষ্মীটি।

—তু আগে ওইখানে ফেলে দে!

—ছি, ধুলো লাগবে। হাতে হাতে নাও।

—হিঁ! তু ধ'রে মারবি।

—না, মারব ক্যানে?

—তু ফেলে দে।

—দাও গো, তাই ফেলে দাও। ধুলো! বলে—আঁস্তাকুড়ের পাতা কুড়িয়ে খায়। ধুলো!...দুর্গা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

পদ্ম কিন্তু ফেলিয়া দিতে পারিল না, একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। তারপর নীরবেই পথে অগ্রসর হইল।

—কামার-বউ!...সকৌতুকে দুর্গা তাহাকে ডাকিল।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া মাটির উপর চোখ রাখিয়া পথে-চলা অভ্যাস, সে তেমনিই চলিতেছিল। মুখ না তুলিয়াই সে উত্তর দিল—কি?

—ওই দেখ।

—কি? কোথা?

—সামনে।...দুর্গা খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাথার ঘোমটা খানিকটা সরাইয়া মাথা তুলিয়া চারিদিকে চাহিয়াই সে আবার তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল। সম্মুখেই ছিরুপালের খামার বাড়ীর দরজার মুখে মোড়া পাতিয়া বসিয়া আছে —ছিরুপাল ও আর একটা লোক; মোটা গোল চোখ ও প্রকাণ্ড গোঁফ লোকটার। তাহারা দু'জনেই তাহাদেরই দিকে চাহিয়া আছে। ও-লোকটাকেও পদ্ম চেনে—লোকটা জমিদারের গোমস্তা। দ্রুতপদে পদ্ম স্থানটা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। দুর্গার কিন্তু সেই মন্থর গতি-ভঙ্গিমা!

গোমস্তা একবার দুর্গার দিকে চাহিল—তারপর ফিরিয়া তাকাইল শ্রীহরির দিকে। তারপর প্রশ্ন করিল—দুর্গার সঙ্গে কে হে পাল ?

—অনিরুদ্ধের পরিবার।

—হুঁ। দুর্গার সঙ্গে জোট বেঁধে বেড়াচ্ছে ক্যানে হে ?

—পরচিত্ত অন্ধকার, কি ক'রে জানব বলুন !

—দুর্গা কি বলে ? খায় ?

(শ্রীহরি গম্ভীরভাবে বলিল—আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি, দাশ মশায় ; দুর্গার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলি না।)

সবিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাস বলিল—বল কি হে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—হঠাৎ ? ব্যাপার কি ?

(—নাঃ। ও নীচ-সংসর্গ ভাল নয় দাসজী। সমাজে ঘেন্না করে, ছোট-লোকে হাসে। নিজের মান-মর্য্যাদাও থাকে না।)

হাসিয়া দাস বলিল—বেশ তো, কামারণী তো আর নীচ-সংসর্গ নয়। বেটাকে যখন জব্দই ক'রবে—তখন ঘরের হাঁড়িশুদ্ধ এঁটো ক'রে দাও না।)

(শ্রীহরি চুপ করিয়া রহিল। এ নিরুদ্ধ কামনাটা তাহার বুকে রুদ্ধমুখ আগ্নেয়গিরির অগ্নিপ্রবাহের মতই চাপা আছে। নাড়া খাইয়া সেই প্রচ্ছন্ন অগ্নিশিখা প্রবল হইয়া উঠে।)

দাস ক্যা-ক্যা করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

(শ্রীহরির উগ্র চোখ দুইটি যেন জ্বলিয়া উঠিল। ওই উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী বধূটির প্রতি তাহার অন্তরের নগ্ন-কামনার একটি প্রগাঢ় আসক্তি আছে। তাহার মনে পড়ে, ডোবার ঘাটে দণ্ডায়মানা পদ্মের অবগুণ্ঠিত মুখ ;—বড় বড় চোখ, ছোট কপাল ঘিরিয়া ঘন কালো এক রাশি চুল, ঈষৎ বাঁকা নাক, গালের পাশে বড় একটি

ছিল,—তাহার হাতে শানিত দা, নিষ্ঠুর কৌতুকের মৃদু-হাসিতে বিকশিত ছোট-ছোট সুন্দর দাঁতের সারিটি পর্য্যন্ত তাহার মনে পড়িল।

দাস হাসি থামাইয়া বলিল—ভাগ্যিমান লোক তুমি, তুমি যদি ভোগ না কর তো ভোগ ক'রবে কি রামা-শ্যামা ?

বহুক্ষণ পরে অজগরের মত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শ্রীহরি বলিল—ছাড়ান্ দেন, দাসজী, ওসব কথা। এখন আমি যা ব'ল্লাম তার কি ক'র্ছেন বলুন।

—তার আর কি, 'পাল' কেটে 'ঘোষ' ক'রতে আর কতক্ষণ? তবে জান তো—জমিদারী সেরেস্তার—'ফেল কড়ি মাথ তেল', কিছু কিছু ছাড়। আর আমাদের পাওনা, তা ছাড়া খাওয়া একটা—।.... শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দাস বলিল—হ্যাঁ হে, মদও ছেড়েছ নাকি? যে রকম গতিক তোমার?....দাস একটু বাঁকা হাসি হাসিল।

শ্রীহরি হাসিয়া বলিল—না, না, সে হবে বৈকি! তবে কথা হ'চ্ছে, ওসব আর ঢাক পিটিয়ে হৈ-হৈ ক'রে কিছু ক'রব না। গোপনে আপনার ঘরে ব'সে যা হয় একটু—মাঝে-সাঝে—!

—নিশ্চয়! ভদ্রলোকের মত!....দাসজী বারবার ঘাড় নাড়িয়া শ্রীহরির যুক্তি স্বীকার করিয়া বলিল—একশোবার। আমি কতবার তোমাকে বারণ করিনি আগে, 'পাল, এ রকম ধারা-ধরণ তোমাকে শোভা পায় না।' যাক, তুমি যে বুঝে সাম্‌লেছ—এও ভাল।

দাসজীর কথা শ্রীহরিও স্বীকার করিয়া বলিল—হ্যাঁ, সে আমি বুঝে দেখলাম দাসজী, মান-সম্মান আপনার ও-রকম ক'রে হয় না, সে-কাল এখন আর নাই।

জমিদারী সেরেস্তার বহুদর্শী বিচক্ষণ কর্ম্মচারী দাসজী, সে হাসিয়া বলিল—কোনকালেই হয় না, বাবা, কোনকালেই হয় না। ত্রিপুরা

সিংয়ের কথা বল তুমি—তাকে লোকে আজও বলে ডাকাত। সেইটা কি মান-সম্মান নাকি? এই দেখ, এই কঙ্কণার মুখুজ্জেবাবুদের কথা দেখ—বড়লোক হ'ল—তাতেও লোকে বাবু ব'লত না। তারপর স্কুল দিলে, হাসপাতাল দিলে, ঠাকুর পিতিষ্ঠে ক'রলে—অমনি লোকে ধন্যি-ধন্যি ক'রলে, বাবু তো বাবু একেবারে বড়বাবু—বড়বাড়ীর বড়বাবু খেতাব হ'য়ে গেল।

—চণ্ডীমণ্ডপটা এবার আমি বাঁধিয়ে পাকা ক'বে দেব, দাসজী। আর চণ্ডীমণ্ডপের পাশে একটা কুয়ো।

—বাস্, বাস্, পাকা ক'রে খুদে লিখে দাও কুয়োর গায়ে—চণ্ডীমণ্ডপের মেঝেতে—সেবক শ্রীশ্রীহরি ঘোষ প্রতিষ্ঠিত; তারপর তোমার ঘোষ খেতাব একেবারে পাকা হ'য়ে যাবে।

—আপনি কিন্তু ওটা ক'রে দেন, সেটেলমেণ্টের পরচাতেও ঘোষ লেখাব আমি।

—কাল—কাল—কালই ক'রে নাও-না তুমি।

শ্রীহরিদের বংশ-প্রচলিত উপাধি পাল। শ্রীহরি উপাধিটা পাল্টাইতে চায়। অনেকদিন হইতেই সে নিজে লেখে ঘোষ; কিন্তু আদালতে ঘোষ চলে না। তাই জমিদারী সেরেস্তায় তাহার নামের জমাগুলিতে পাল কাটাইয়া ঘোষ করিতে চায়। ওদিকে গভর্ণমেণ্ট হইতে নূতন সার্ভে হইতেছে; রেকর্ড অব রাইট্সের দপ্তরেও ঘোষ উপাধি তাহার পাকা হইয়া যাইবে। পাল উপাধিটা অসম্মানজনক; যাহারা নিজের হাতে চাষ করে, তাহাদের—অর্থাৎ চাষাদের ঐ উপাধি!

দাসজী আবার বলিল—আর সে-কথাটার কি ক'রছ?

—কোন্ কথা? কামারের বউটা—?

হো হো করিয়া হাসিয়া দাসজী বলিল—সে তো হবেই হে। সে কথা আবার শুধোয় নাকি? আমি ব'লছিলাম গোমস্তাগিরির কথাটা।

শ্রীহরি লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; অপ্রস্তুতের মতই বলিল—আচ্ছা ভেবে দেখি!

ঠিক এই মুহূর্ত্তেই ক্ষুর-ভাঁড় বগলে করিয়া আসিয়া হাজির হইল তারাচরণ পরামানিক। গভীর ভক্তির সহিত একটি নমস্কার করিয়া মোলায়েম হাসি হাসিয়া সম্ভাষণ জানাইল—পেনাম আজ্ঞে।

কপালের উপরে দৃষ্টি টানিয়া তুলিয়া তারাচরণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাসজী বলিল—এস, বাপধন এস। কি সংবাদ?

মাথা চুলকাইয়া তারাচরণ বলিল···গিয়েছিলাম কঙ্কণায়। বাড়ী এসেই শুনলাম, মা বললে—গোমস্তামশাই এসেছেন,—শুনেই, জোর-পায়ে আজ্ঞে আসছি ····সে অকারণে হাসিতে লাগিল।

তারাচরণের এই হাসিটি তাহার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা এবং বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত। যাহারই ডাকে সে সর্ব্বাগ্রে না যায়—সে-ই চটিয়া উঠে। তাই তারাচরণ মনস্তুষ্টির জন্য এই মিষ্টি হাসিটি হাসে, শ্লেষে তিরস্কারেও সে এমনি করিয়া হাসে। আরও একটি সত্য সে আবিষ্কার করিয়াছে—সেটিকেও সে কাজে লাগায়। প্রতিবাসীর গোপন তথ্য জানিবার জন্য মানুষের অতি ব্যগ্র কৌতূহল! সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত সে গ্রামে গ্রামান্তরের নানা-জনের বাড়ীতে যায়। রামের বাড়ীর খবর সে শ্যামকে বলে, শ্যামের সংবাদ যদুকে বলে; আবার যদুর কথা মধুকে নিবেদন করিতে করিতে তাহার বিরক্তি অপনোদন করিয়া তাহাকে খুসী করিয়া তুলে। সেই অবসরে আবার তাহাদের বাড়ীরও দুই-চারিটা গোপন সংবাদ জানিয়া লয়!

গাড়ু হইতে বাটিতে জল ঢালিয়া লইয়া সে আরম্ভ করিল—কঙ্কণাতে হৈ হৈ কাণ্ড। আজ্ঞে, বুঝলেন কিনা! তাঁবু প'ড়েছে আট-দশটা,—গাড়ী গাড়ী কাগজ জড়ো হয়েছে!

—হুঁ—সেট্‌লমেণ্ট্ ক্যাম্প ব'সেছে।

কৌশলী তারাচরণ বুঝিল—এ সংবাদে গোমস্তার চিত্ত সরস হইবে না। চকিত-দৃষ্টিতে শ্রীহরির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—শ্রীহরির মুখও গম্ভীর। মুহূর্ত্তে সে প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া বলিল—এবার পোয়া বারো হ'ল দুর্গা-টুর্গার। দু'হাতে টাকা লুটবে। টেরিকাটা আমিনের দল যা দেখলাম! বুঝলে হে, পাল মশাই!

গোমস্তা ধমক দিল—পাল কি রে, পাল বলিস কেন? 'বুঝলেন' ব'লতে পারিস না?

—আজ্ঞে?

—ঘোষমশায় ব'লবি। পাল হ'ল যারা—নিজের হাতে চাষ করে। এ গাঁয়ের মাথার ব্যক্তি হ'লেন শ্রীহরি।

তারাচরণ নীরবে সব শুনিতে আরম্ভ করিল। অনেক কথাই সে শুনিল—মায় এ গ্রামের গোমস্তাগিরিও যে শ্রীহরি ঘোষ মহাশয় লইতেছেন, সে কথাটাও আভাসে সে অনুমান করিয়া লইল। তৎক্ষণাৎ বলিল—একশোবার হাজারবার, ঘোষমহাশয়ের তুল্য ব্যক্তি এ ক'খানা গাঁয়ে কে আছে বলুন?....গোমস্তার গালের উপর ক্ষুরের একটা টান দিয়া সে চাপা গলায় বলিল—উনি ইচ্ছে ক'রলে দুর্গার মত বিশটা বাঁদী রাখতে পারেন!

হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে ক্ষুর চালাইতে নিষেধ করিয়া দাসজী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—অনিরুদ্ধ কামারের বউটা দুর্গার সঙ্গে জোট বেঁধে বেড়ায় কেন রে? ব্যাপার কি বল্ তো?

—তাই নাকি? আজই খোঁজ নিচ্ছি দাঁড়ান। তবে কর্ম্মকারের সঙ্গে দুর্গার আজকাল একটুকু—তারাচরণ হাসিল।

—নাকি?

—হ্যাঁ!

শ্রীহরি চুপ করিয়া বসিয়াছিল। পদ্মকে লইয়া এমনভাবে

আলোচনা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। । ওই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির প্রতি তাহার প্রচণ্ড আসক্তি—প্রগাঢ় কমনা; তাহাকে একান্তভাবে একক, নিতান্ত নিজস্ব করিয়া সে আয়ত্ত করিতে চায়; এক জনশূন্য লোকে—সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মত; অন্ধকার গুহার নিস্তব্ধতম আবেষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিণীর মত—শতপাকের নাগপাশের বন্ধনের মধ্যে।)

* * *

পদ্মের বাড়ী আসিয়া দুর্গা দেখিল—পদ্ম আবার স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। পদ্ম দ্রুতপদে আসিবার কিছুক্ষণ পর দুর্গা কিছুক্ষণ একটা গলির আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোমস্তাটিকে সে ভাল করিয়াই জানে। শ্রীহরির তো নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত তাহার নখদর্পণে। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্যই সে লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। গোমস্তার কথা শুনিয়া সে হাসিল; শ্রীহরির কথাবার্ত্তার ধরণে সে অনুভব করিল বিস্ময়। তারাচরণ আসিতেই সে চলিয়া আসিয়াছে। গামছা কাঁধে ফেলিয়া পদ্ম তখন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল। দুর্গা প্রশ্ন করিল—এ কি? আবার চান?

—হ্যাঁ।

—ছোঁয়াচ পড়লো বুঝি? যে পাঁচ হাত 'সান' তোমার! কিছু ছোঁয়াটা আর আশ্চয্যি কি!

অপ্রস্তুতের মত হাসিয়া পদ্ম বলিল—না—মাড়াই নাই কিছু।

—তবে?

—ছেলেতে ময়লা ক'রে দিলে কাপড়।

—তোমার ওই এক বাতিক, ছেলে দেখলেই কোলে নেবে। নিজের নাই, পরের নিয়ে এত ঝঞ্ঝাট বাড়াও ক্যানে বলতো? এর মধ্যে আবার কার ছেলে নিতে গেলে?

পদ্ম এবার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া একটু হাসিল,—ছিরু পালের ছেলে।

দুর্গা অবাক হইয়া গেল।

পদ্ম বলিল—গলির মুখে বউটি দাঁড়িয়ে কাঁদছিল; কোলে ছোটটা ঘ্যান-ঘ্যান্ করছে, পায়ের কাছে বড়টা কোলে চাপবার জন্যে মায়ের কাপড় ধ'রে টেনে ছিঁড়ে একাকার ক'রছে আর চেঁচাচ্ছে; বাড়ীর ভেতর শাশুড়ী গাল পাড়ছে—বিয়েন্‌খাগী, সব খেয়েছিস, আর ও দু'টো ক্যানে? ও দু'টোকেও খা, খেয়ে তুইও যা; আমি বাঁচি।···· তাই ছোটটাকে একবার নিলাম—মা তখন বড়টাকে নিয়ে চুপ করায়। ····কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—পালের বউটি কিন্তুক বড় ভাল মেয়ে, বড় ভাল! তাহার মনে পড়িয়া গেল সেই সেদিনের কথা।

শ্রীহরির স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্গারও কোন অভিযোগ নাই, বরং তাহার নিজেরই একটি গোপন অপরাধ-বোধ আছে। এ গ্রামের বধূদের সকলেই তাহাকে অভিসম্পাত দেয়, কটু কথা বলে—সে-কথা সে জানে। কেবল দু'টী বউয়ের বিরুদ্ধে সে এ অভিযোগ করিতে পারে না; একজন বিলু দিদি—পণ্ডিতের স্ত্রী, অপর জন শ্রীহরির স্ত্রী। পণ্ডিতের স্ত্রীর না করিবারই কথা—পণ্ডিত সম্বন্ধে তো তাহার আশঙ্কার কিছু নাই, সে সাধু লোক; কিন্তু ছিরুর সহিত তাহার প্রকাশ্য ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও শ্রীহরির স্ত্রী কোনদিন তাহাকে কটু কথা বলে নাই—অভিসম্পাত দেয় নাই। পালের স্ত্রীর সঙ্গে চোখে চোখ রাখিতে তাহার সত্যই লজ্জা-বোধ হয়।

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিয়া, অকস্মাৎ বোধ হয়, শ্রীহরির স্ত্রীর প্রসঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই সে প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করিল; বলিল—কে জানে ভাই; কচি-কাঁচা দেখলে আমার তো গা ঘিন্-ঘিন্ করে! মা-গো!

পদ্ম অত্যন্ত রূঢ়দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

দুর্গা তাহা লক্ষ্যই করিল না, অবশ্য লক্ষ্য করিলেও সে গ্রাহ্য করিত না। তাচ্ছিল্যের একটা বাঁকা-হাসির শাণিত শায়কে উহাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ধূলায় লুটাইয়া দিত। তেমনি উপেক্ষার ভঙ্গিতে সে বলিয়া গেল—আমাদের বউটার আবার এই বুড়ো বয়সে ছেলেপিলে হবে। আমি ভাই এখন থেকেই ভাবছি—সেই ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদবে, পাখীর বাচ্চার মত ক্ষণে ক্ষণে কাঁথাকাপড় ময়লা করবে,—মা গোঃ!

মুহূর্ত্তে পদ্মের বিচিত্র রূপান্তর হইয়া গেল। সে প্রশ্ন করিল—কোন দেবতার দোর ধ'রেছিল—তোমাদের বউ?

—দেবতা? দেবতা তো অনেকেই দয়া ক'রেছে।...তারপর ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—শেষ ওই ঘোষালের—

—ঘোষালেরা কবচ দেয় নাকি?

—মরণ তোমার! ওই হরেণ ঘোষালের সঙ্গে বউএর এতকালে আশনাই হ'য়েছে। বউ তো আর বাঁজা নয়, তাই সন্তান হবে।

পদ্ম স্থিরদৃষ্টিতে দুর্গার দিকে চাহিয়া রহিল।

দুর্গা বলিল—শুধু তো মেয়েই বাঁজা হয় না, পুরুষেরও দোষ থাকে। তা, জান্ না বুঝি?...সে দৃষ্টান্ত দিতে আরম্ভ করিল; আশ-পাশ গ্রামের বহু দৃষ্টান্তই সে জানে। এই জীবনের—এই পথের পথিকদের প্রতিটি সংবাদ সে জানে, প্রতিটি জনকে চেনে। তাহারা হয় তো আড়াল দিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চলিতে চায়—কিন্তু সে যে অহরহ পথের উপর অনবগুণ্ঠিত মুখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া আছে পথের যাযাবরীর মত; ওই পথেই যে সে বাসা বাঁধিয়াছে।

শীতের দিন—জলের হিম মানুষের দেহে যেন সূচ ফুটাইয়া দেয়। সকাল বেলাতেই দুইবার স্নান করিয়া পদ্মের শরীর যেন অসুস্থ হইয়া

পড়িল। সমস্ত দিনেও বেচারী সে অসুস্থতা কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। রান্নাশালায় আগুনের আঁচেও সে আরাম পাইল না। রান্নাবান্না শেষ করিয়াও সে কিছু খাইল না, সমস্ত অনিরুদ্ধের জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিল। কর্ম্মকার সকালেই খাবার বাঁধিয়া লইয়া ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংসনে তাহার নূতন কামারশালায় গিয়াছে।

অপরাহ্নে অনিরুদ্ধ ফিরিল। পদ্ম চুপ করিয়া দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়াছিল, অসুস্থ উদাসীনতা তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিস্ফুট। অনিরুদ্ধ একে ক্লান্ত, তাহার উপর পথে দুর্গার বাড়ীতে খানিকটা মদ খাইয়া আসিয়াছে। পদ্মের ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক পদ্মের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করিয়া উঠিল—বলি, তোর হ'ল কি ?

পদ্ম এতক্ষণে অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল।

অনিরুদ্ধ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—হ'ল কি তোর ?

শান্তস্বরে পদ্ম জবাব দিল—কি হবে ? কিছুই হয় নাই।...শরীরের অসুস্থতার কথা অনিরুদ্ধকে বলিতেও তাহার ইচ্ছা হইল না, ভালও লাগিল না। পাথরকে দুঃখের কথা বলিয়া কি হইবে ? অরণ্য-রোদনে ফল কি ? কথার শেষে একটি বিষণ্ণ মৃদুহাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—তবে ? তবে, উদাসিনী রাইএর মত ব'সে রয়েছিস—চালকাঠের দিকে চেয়ে ?

মুহূর্ত্তে পদ্ম যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—তাহার অলস শিথিল দেহের সর্ব্বাঙ্গে চকিতের জন্য একটি অধীর চাঞ্চল্য যেন খেলিয়া গেল, ডাগর চোখ দু'টি ক্রোধে রক্তাভ, উগ্রভঙ্গিতে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধের মনে হইল—দুই টুকরা লোহা যেন কামারশালার জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে আগুণের চেয়েও দীপ্তিময় এবং উত্তপ্ত হইয়া গলিবার

উপক্রম করিতেছে। পদ্মের দেহখানা পর্য্যন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দুঃসহ উত্তাপ ছড়াইতেছে। এ মূর্ত্তি পদ্মের নূতন। অনিরুদ্ধ ভয় পাইয়া গেল। এইবার পদ্ম কি বলিবে, কি করিবে—সেই আশঙ্কায় সে অধীর অস্থির হইয়া উঠিল। পদ্ম কিন্তু মুখে কিছু বলিল না। তাহার ক্রোধে পাত্রে-আবদ্ধ জ্বলন্ত ধাতুর মতই তাহার দৃষ্টি ও দেহ-ভঙ্গির মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হইয়া রহিল;—কেবল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনিরুদ্ধ দেখিল—পদ্ম যেন কাঁপিতেছে; সে শঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল—কি হ'ল পদ্ম? পদ্ম!

সর্ব্বদেহ সঙ্কুচিত করিয়া পদ্ম বোধ হয় অনিরুদ্ধের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু পারিল না—কাঁপিতে কাঁপিতেই সে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

* * * *

অনিরুদ্ধ ছুটিয়া জগন ডাক্তারের কাছে চলিয়াছিল।

পথে চণ্ডীমণ্ডপের উপরে ডাক্তারের আস্ফালন শুনিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপে তখন গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই আসিয়া সমবেত হইয়াছে। ডাক্তার কেবল আস্ফালন করিতেছে—দরখাস্ত ক'রব। কমিশনারের কাছে টেলিগ্রাম ক'রব।

উর্দ্দি-পরা একজন সরকারী পিওন চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালের গায়ে একটা নোটিশ লটকাইয়া দিতেছে। "আগামী ৭ই পৌষ হইতে এই গ্রামে সার্ভে-সেটেলমেণ্টের খানাপুরী আরম্ভ হইবেক। প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপন-আপন জমির নিকট উপস্থিত থাকিয়া সীমানা সহরদ্দ দেখাইয়া দিতে আদেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় আইন অনুযায়ী কার্য্য করা যাইবেক।"

গ্রামের লোকগুলি চিন্তিতমুখে মুঞ্জন করিতেছে।

শ্রীহরি ও গোমস্তা কথা বলিতেছে সেটেল্‌মেণ্ট হাকিমের পেশ্‌কারের সঙ্গে।—মাছ—একটা বড় মাছ!

দেবু নীরবে একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। অনিরুদ্ধ তাহারই কাছে ছুটিয়া গেল। (জংসন হইতে ফিরিবার পথে দুর্গার বাড়ীতে সে সকালবেলার কথা সব শুনিয়াছে। দেবুকে সে বরাবরই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে; সেদিন সে তাহার উপর রাগ করে নাই—অভিমানই করিয়াছিল। আজিই দুর্গার কাছে সব শুনিয়া—দেবুর উপর তাহার অভিমান দূর হইয়া গিয়া প্রগাঢ় অনুরাগে হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে।)

আবেগ-কম্পিত-কণ্ঠে সে বলিল—দেবু, ভাই!

—কি, অনি ভাই, কি হ'ল?

অনিরুদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিল।

* * * *

দেবুই জগন ডাক্তারকে ডাকিল,—শীগ্‌গির চল, অনিরুদ্ধের স্ত্রীর মূর্চ্ছা হ'য়েছ।

জগন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে অনিরুদ্ধের দিকে একবার চাহিল, তারপর নিজেই অগ্রসর হইয়া ডাকিল—এস তা'হলে।

সেটল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত বক্তৃতা আপাততঃ মুলতুবী থাকিল; চলিতে চলিতে সে আরম্ভ করিল গ্রাম্য লোকের অকৃতজ্ঞতার উপর এক বক্তৃতা।....তবু আমার কর্ত্তব্য ক'রে যাব আমি। চিকিৎসক যখন হ'য়েছি, তখন ডাকবামাত্র যেতে হ'বে আমাকে, যাব আমি। তিন পুরুষ ধ'রে গাঁয়ে ফি দেয় নি, আমিও নেব না। ফি!···ডাক্তার হাসিল—ওষুধের দামই কেউ দেয় না তো—ফি!

দেবু পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া বলিল—বিড়ি খাও ডাক্তার।

—দাও। বিড়িটা দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ডাক্তার বলিল—তোমার

খাতা দেখাব পণ্ডিত—দশহাজার টাকা! আমাদের দশহাজার টাকা ডুবিয়ে দিয়েছে লোকে, অথচ খাতিরের লোক হ'ল মহাজন—যারা সুদ নেয়; কঙ্কণার বাবুরা—ছিরে পাল—এরাই।

জগনের ডাক্তারখানার সম্মুখেই সকলে আসিয়া পড়িয়াছিল। ডাক্তারখানা হইতে একটা শিশি লইয়া ডাক্তার বলিল—চল। এক মিনিট—এক মিনিটেই চেতন হ'য়ে যাবে; ভয় নেই।

চৌদ্দ

আকাশে ভোরের আলো ভাল করিয়া তখনও ফোটে না,—দেবু বিছানা ছাড়িয়া উঠে। শৈশব হইতেই তাহার এই অভ্যাস। একা দেবুর নয়—পল্লীর অধিকাংশ লোকই, দিন সুরু হইবার পূর্ব্ব হইতেই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা আরম্ভ করে। মেয়েরা উঠিয়া দুয়ারে জল দেয়, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করে, নিকায়, পুরুষেরা গরু-বাছুরকে খাইতে দেয়। আবার যাহার বাড়ীতে যখন ধান-ভানার কাজ থাকে, তখন তাহার বাড়ীতে জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠে রাত্রির শেষ-প্রহর হইতে। রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ প্রহরে ঢেঁকির শব্দ উঠে—দুম্-দুম্-দুম্ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট তালে; মৃদু কথা-বার্ত্তার সাড়া পাওয়া যায়, কিরোসিনের ডিবের আলোর আভাস জাগে। পল্লীর এই সময় অনেক বাড়ী হইতে ঢেঁকির সাড়া উঠেই। আজ কোন বাড়ীতেই সাড়া উঠে নাই। 'ইতুলক্ষ্মীর' পর্ব্ব, শস্যের উপর ঢেঁকির আঘাত দিতে নাই; আজ সঞ্চয়ের দিন।

দেবুকে বিলু বলিল—দেখ, আজ বাইরের উঠানটাও নিকুতে হবে। গোমস্তা এসেছে—এখন কিছুদিন বাড়ীতেই পাঠশালা ব'সবে।

গোমস্তা আসিয়াছে; চণ্ডীমণ্ডপে এখন গোমস্তার কাছারী বসিবে।

গ্রাম্য দেবোত্তর সম্পত্তির সেবাইৎ হিসাবে চণ্ডীমণ্ডপের মালিক জমিদার; তবে সাধারণের ব্যবহার্য্য স্থান—সাধারণের ব্যবহারের অধিকার আছে। সেই অধিকারেই গ্রামের লোক ব্যবহার করে, সেই দায়িত্বে চণ্ডীমণ্ডপটির রক্ষণাবেক্ষণ করে, চাঁদা করিয়া খড় তুলিয়া ছাওয়ায়, ভাঙা-ফুটা মেরামত করে; এমন কি চণ্ডীমণ্ডপটি তাহারাই নিজেরা চাঁদা তুলিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। সে অনেক কাল পূর্ব্বের কথা,—তখনকার জমিদার মালিক হিসাবে তাহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন।...

চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিয়া দেবু মাঠের দিকে বাহির হইয়া গেল; গ্রামের প্রবীণরা তখন বাবা-শিব ও মা-কালীর দুয়ারে জল ছিটাইয়া প্রণাম করিতেছে। জলে-জলে দেবতার ঘরের চৌকাঠের নীচের কাঠ একেবারে পচিয়া খসিয়া গিয়াছে, দুয়ারের নীচের একাংশ ক্ষয়িষ্ণু হইয়াছে। এবার মেরামত না করাইলে পূজার সময় ভোগের সামগ্রীর গন্ধে বিড়াল তো ঢুকিবেই—কুকুর প্রবেশ করাও কিছু আশ্চর্য্য নয়।

খোঁড়া পুরোহিত বলে—এত ক'রে জল দিও না, মা-সকল, জল একটুকুন কম ক'রেই দিয়ো। তোমাদেরই পরলোকের পথে কাদা হবে—পেছল্ হবে, তা'তেই বলছি। শেষে রথের চাকা গেড়ে গিয়ে আর উঠবে না।

মোড়লপিসি মুখের মত জবাব দেয়—রথের ঘোড়া তো আর তোমার ওই তে-ঠেঙে বেতো ঘোড়া নয়, ঠাকুর; তার গেলে আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

পুরোহিত হাসিয়া বলে—আমার ঘোড়া সেই রথের ঘোড়ারই বাচ্চা মোড়ল-পিসী। আমার ঘোড়ার তো তিনটে ঠ্যাঙ, ওর মা-বাবার মাত্তর দু টো, শোন নাই, "ডান ঠ্যাঙটা লটর-পটর, বাঁ ঠ্যাঙটা খোঁড়া, বাবা বদ্যিনাথের ঘোড়া।"...

জগন ডাক্তার বলে আরও কর্কশ কঠোর কথা, সে বলে—কেউ চোর, কেউ ছ্যাচড়, কেউ ছেনাল্; হিংসুটে-বদমাস-কুঁদুলী তো সবাই; সকালে আসেন সব পুণ্যি ক'রতে! নিয়ম ক'রে দাও, দেবতার দোরে জল দিতে হ'লে সবাইকে রোজ একটি ক'রে পয়সা দিতে হবে; দেখবে একজনাও আর আসবে না। দেখ না পুকুরের জল সব ঘড়া-ঘড়া আনছে আর ঢালছে।

দেবু কোন কথাই বলে না। জগনের কথা অবশ্য মিথ্যা নয়; যে অপবাদ সে দেয়, তাহা অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু নিত্য-নিয়মিত প্রথম প্রভাতে দেবু যখন ইহাদের দেখে, তখন ওই পরিচয়গুলির কোন চিহ্নই তাহাদের চোখে-মুখে-ভাবে-ভঙ্গিতে সে দেখিতে পায় না। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একদল মানুষকে সে দেখে। তখন ইহারা প্রত্যেকেই যেন এক কল্পলোকের যাত্রী। ইহারা যদি সদা সর্ব্বদা এমনই মানুষ থাকিত! কিন্তু এই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইয়া বাড়ীতে পা দিতে-না দিতেই প্রতিটি জনই আবার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে। কেহ আপনার দুঃখকষ্টের জন্য ভগবানকে শতমুখে গালি পাড়ে; কেহ হয়তো ঘাট হইতে অন্যের বাসন তুলিয়া লয়; কেহ হয়তো রাস্তায় প্রতীক্ষা করে 'পাইকারের' অর্থাৎ গরু-বাছুরের দালালের,—বুড়ো গাইটাকে বেচিয়া দিবে; দালালেরা বুড়া গাই লইয়া কি করে সে সকলেই জানে, কিন্তু কয়েকটা টাকার লোভও সম্বরণ করা তখন ইহাদের সাধ্যের অতীত।....একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দেবু চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পথে নামিয়া আসিল।

কৃষাণেরা মাঠে চলিয়াছে; বাউড়ী, ডোম, মুচী প্রভৃতি শ্রমিক চাষীর দল। একখানা পরণের কাপড়ই গায়ের ব্যাপারের মত জড়াইয়া হুকা টানিতে টানিতে চলিয়াছে; অন্য হাতে কাস্তে। ধান-কাটার পালা এখন। গ্রামের চাষী গৃহস্থেরাও অধিকাংশই নিজ-হাতে কৃষাণদের সঙ্গেই চাষ করে, তাহারাও কাস্তে হাতে চলিয়াছে। 'খাটে-খাটার

দুনো পায়'—অর্থাৎ চাষে যাহারা নিজেরাও সঙ্গে খাটে এবং চাষী-মজুর খাটায়, তাহাদের চাষে দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়—এই প্রবাদ-বাক্যটা ইহারা আজও মানিয়া চলে। কেবল দুই-চারিজন নিজেরা চাষে খাটে না। হরেন্দ্র ঘোষাল ব্রাহ্মণ, জগন ঘোষ একে কায়স্থ তার আবার ডাক্তার, দেবু ঘোষ পাঠশালার পণ্ডিত; শ্রীহরি সম্প্রতি কুলীন সদ্গোপ এবং বহু ধনসম্পত্তির মালিক; এই কয়জনই চাষে খাটে না।

সতীশ বাউড়ী তাহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতব্বর গোছের লোক। লোকটির নিজের হাল-গরু আছে। জমি অবশ্য তাহার নিজের নয়—পরের জমি ভাগে চাষ করে। বেশ বিজ্ঞ ধরণে কথা কয়। দেবুকে দেখিয়া হেঁট হইয়া সে প্রণাম করিল, বলিল—পেনাম হই, পণ্ডিত মশায়।....সঙ্গে সঙ্গে দলের সকলেই প্রণাম করিল।

দেবু প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—মাঠে যাচ্ছ?

—আজ্ঞে হঁ্যা।...সতীশ নিজের সঙ্গীদের বলিল—পণ্ডিতমশায়ের মত মানুষটি আমি দেখলম্ না। পেনাম ক'রলে অনেক বাবু তো রা পর্য্যন্ত কাড়ে না। পণ্ডিতমশায় কিন্তুক কপালে হাতটি ঠেকাবেই। কখনও তুই-তুকারি শুনলম্ না উঁয়ার মুখে।

দেবু কথা বলিল না, দ্রুতপদে আগাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সতীশ বলিল—হাঁ গো, পণ্ডিতমাশায়—এ কি হবে বলেন দেখি?

—কিসের? কি হ'ল তোমাদের?

—আজ্ঞে, একা আমাদের লয়, গোটা গাঁয়ের নোকেরই বটে। এই সেটেল্‌মেণ্টের কথা ব'লছি। সাতদিন পরেই ব'লছে আরম্ভ হবে দিনরাত হাজির থাকতে হবে, নোয়ার শেকল টেনে মাপ হবে; তা হ'লে ধান-কাটাই বা কি ক'রে হয়, আর পাকা ধানের ওপর শেকল টানলে ধানই বা থাকবে কোথা?

—গোমস্তা কি বললেন? প্যালই বা কি ব'ললে?

—আজ্ঞে ঘোষমশাই বলুন !

—ঘোষ মশায় ?

আজ্ঞে, উনি এখন ছিহরি ঘোষ মাশাই গো। ঘোষ ব'লতে হুকুম হ'য়েছে। জমিদারের কাগজ-পত্তরে, মায় আদালত পর্য্যন্ত ঘোষ ক'রে লিয়েছেন পাল কাটিয়ে।

—তাই নাকি ? ওঁরা কি ব'ললেন ? কাল তো তোমরা গিয়েছিলে সব।

—আজ্ঞে ডাক হ'য়েছিল, গিয়েছিলাম। তা, ওঁরা ব'ললেন—দিনরাত খেটে ধান কেটে ফেল সব সাতদিনের মধ্যে। তাই কি হয় গো ? আপনিই বলেন ক্যানে পণ্ডিতমশাই ?

দেবু চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। কাল সমস্ত রাত্রি সে এই কথাটাই ভাবিয়াছে। কিন্তু কোন উপায়ই স্থির করিতে পারে নাই।

সতীশ বলিল—হোথা থেকে এলাম তো দেখি, ডাক্তোর বাবু পাড়ায় এয়েছেন, ব'লছেন—টিপছাপ দিতে হবে, দরখাস্ত পাঠাবেন। তা হ্যাঁ মশায়, দরখাস্তে কি হবে গো ? এই তো ঘর-পোড়ার লেগে দরখাস্ত ক'রলাম—কি হ'ল ? তা ছাড়া দরখাস্ত ক'রলে সেটেল্‌মেণ্টোর হাকিম যদি রেগে যায় ?

* * *

বাংলাদেশে ইংরাজী ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কোন জরিপবন্দী হয় নাই। তখনকার দিনে সীমানা-সরহদ্দ লইয়া দাঙ্গা-বিবাদের আর অন্ত ছিল না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট হইতে পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরিয়া জরীপ করিয়া মাত্র গ্রামগুলির সীমানা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে জরিপ আইন পাশ হইবার পর বাঙলা দেশে নূতন জরিপের এক পরিকল্পনা হয়—প্রতিটি টুকরা জমি, তাহার

বিবরণ এবং তাহার স্বত্ব-স্বামীত্ব নির্দ্ধারণ করিবার জন্যই এ জরিপের আয়োজন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাহার জের এই গ্রামাঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম্য লোকগুলি বিভীষিকায় একেবারে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জরিপের সময়ে এতটুকু ত্রুটীতে হাকিম নাকি বেত লাগায়, হাতকড়ি দিয়া জেলে পাঠাইয়া দেয়।

জরিপের পর প্রজাদের জরিপের খরচের অংশ দিতে হইবে। না দিলে অস্থাবর ক্রোক হইবে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে।

তাহার পর জমিদার দাবী করিবে খাজনা-বৃদ্ধি; প্রতি টাকায় চার আনা, আট আনা, এমন কি—টাকায় টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধিও হইতে পারে, হাইকোর্টের নাকি নজীর আছে। নাখরাজ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। বজায় থাকিলে সেস্ লাগিবে, সে সেসের পরিমাণ নাকি খাজনারই সমান—কম নয়; এমনি আরও অনেক কিছু হইবে।

ফিরিবার পথে দেবু দেখিল—জনকয়েক মাতব্বর ইতিমধ্যেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হইয়াছে; সকলে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবু চণ্ডীমণ্ডপেই উঠিয়া আসিল। হরিশ প্রশ্ন করিল—হয়েছে?

রাত্রে তাহার একখানা দরখাস্ত লিখিয়া রাখিবার কথা ছিল। কিন্তু দেবুর দরখাস্ত লেখা হইয়া উঠে নাই। দরখাস্তে তাহার আস্থা নাই। দরখাস্তের প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গিয়াছিল কয়েকটি তিক্ত ঘটনার স্মৃতি। নিজে সে এককালে কয়েকবার দরখাস্ত করিয়াছিল; সেই দরখাস্তের ফলের কথা মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

তখন বাপের মৃত্যুর পর সদ্য সে স্কুল ছাড়িয়া নিজের হাতেই চাষ করিত। সেদিন মাঠে সে হাল চালাইতেছিল। খাকী পোষাক-পরা টুপী মাথায় পুলিশের এ্যাসিষ্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টার মাঠের পথে যাইতে যাইতে তাহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিল—এই—শোন্!

দেবু এই অভদ্রজনোচিত সম্ভাষণে অসন্তুষ্ট হইয়াই উত্তর দেয় নাই।

—এই উল্লুক!

দেবু এবারও উত্তর দেয় নাই। দেবুর সেই প্রথম দরখাস্ত। দরখাস্ত করিয়াছিল পুলিশ সাহেবের কাছে। তদন্ত হইল মাস দুয়েক পর। তদন্তে আসিলেন ইন্সপেক্টার।

দেবুর অভিযোগ শুনিয়া তিনি মিষ্ট কথায় ব্যাপারটা মিটাইয়া দিলেন, বলিলেন—দেখ বাপু, জমাদার-বাবু তোমার বাপের বয়সী। 'তুই' বললেও তোমার রাগ করা উচিত নয়। 'উল্লুক' বলাটা অন্যায় হয়েছে, যদি উনি ব'লে থাকেন।

দেবু বলিল—উনি বলেছেন।

—বুঝলাম—কিন্তু সাক্ষী কে, বল?

সাক্ষী ছিল না। ইন্সপেক্টার বলিলেন—যাক, তুমি বাড়ী যাও। কিছু মনে ক'র না।

দেবুর ক্ষোভ কিন্তু মেটে নাই।

দ্বিতীয় দরখাস্তের অভিজ্ঞতা বিচিত্র। জমিদার বৈশাখ মাসে খাসপুকুর হইতে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সেইটিই একমাত্র পানীয় জলের পুকুর। জল অল্পই ছিল, সেই জল আরও খানিকটা বাহির করিয়া দিয়া মাছ ধরিবার কথা হইল। গ্রামের লোকে শিহরিয়া উঠিল, বলিল—ওইটুকু জল কেটে বের করে দিলে থাকবে কতটুকু? তার উপর মাছ ধরলে যে কাদা ছাড়া কিছু থাকবে না। আমরা খাব কি?

গোমস্তা বলিল—জমিদারের বাড়ীতে কাজ, তিনিই বা মাছ কোথায় পাবেন বল?

প্রজারা খোদ জমিদারের কাছে গেল; জমিদার বলিলেন—তোমরা মাছ দাও, নয় মাছের দাম দাও।

তরুণ দেবু এক দরখাস্ত করিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। কিন্তু

কিছুই হইল না। জমিদারের চাপরাশীরা শোভাযাত্রা করিয়া আসিয়া মাছ ধরাইয়া পুকুরটাকে পঙ্ক-পল্বলে পরিণত করিয়া দিয়া গেল। দেবুর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। হঠাৎ সাতদিন পর অকস্মাৎ দারোগা-কনেষ্টবল-চৌকীদারের আগমনে গ্রামখানা ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গে একজন সাহেবী-পোষাকপরা অল্পবয়সী ভদ্রলোক। দারোগা আসিয়া দেবুকে ডাকিল। বলিল—ম্যাজিষ্টেট সাহেব বাহাদুর ডাকছেন তোমাকে।

দেবু অবাক হইয়া গেল। সাহেব নিজে আসিয়াছেন? কিন্তু এখন আসিয়া ফল কি? সাহেবকে সে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। সাহেব প্রতিনমস্কার করিলেন। সে আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল সাহেবের কথায়।

—আপনি দেবদাস ঘোষ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা বলিল—'আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর' বলতে হয়।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন—থাক। তারপর সমস্ত শুনিলেন—পুকুর নিজে দেখিলেন। পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া জলের অবস্থা দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। দেবুর আজও মনে আছে ভদ্রলোকের চোখ হইতে ফোঁটাকয়েক জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল। রুমালে চোখ মুছিয়া সাহেব বলিলেন—তাই ত দেবুবাবু, এসে তো কিছু করতে পারলাম না আমি!

দেবু বলিল—আমি দরখাস্ত করেছিলাম পাঁচদিন আগে হুজুর!

—ডাকে যেতে একদিন লেগেছে। দরখাস্ত যথানিয়মে পেশ হতেও কোন কারণে দেরী হয়েছে। সে কারণে আমি এনকোয়ারী করব। তারপর—সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—দেবদাসবাবু

এসব ক্ষেত্রে দরখাস্ত করবেন না। নিজে যাবেন, একেবারে আমাদের কাছে সরাসরি জানাবেন। দরখাস্ত ?—তিনি হাসিয়াছিলেন।

সাহেব একটা ইঁদারা মঞ্জুর করিয়াছিলেন এ গ্রামের জন্য। কিন্তু সাহেব এ জেলা হইতে চলিয়া যাওয়ার সুযোগে ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য কঙ্কণার বাবুরা সেটা অন্য গ্রামে দিয়াছে।

দরখাস্ত! একটা গল্প তাহার মনে পড়ে! কোন রাজার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছিল; রাজা ছিলেন দার্জ্জিলিঙে। আগুন নিভাইবার হাঁড়ি বালতি কিনিবার জন্য বরাদ্দ না থাকায় রাজার নিকট টেলিগ্রাফ করা হইল। হুকুম টেলিগ্রামে আসিলেও আসিল চব্বিশ-ঘণ্টার পর। দরখাস্তের কথায় ওই গল্প তাহার মনে পড়ে, মুখে তিক্ত হাসি ফুটিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে সেই সাহেবের উপদেশ! মিঃ এ, কে, হাজরা, আই-সি এস। দেবু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে।

দেবু উত্তর দিল—না হরিশ-কাকা, লেখা হয় নাই।

লেখা হয় নাই, শুনিয়া হরিশ, ভবেশ প্রভৃতি প্রবীণগণ অসন্তুষ্ট হইল। হরিশ বলিল—তুমি বল্লে লিখে রাখবে, ভার নিলে! জলখাওয়ার পর গাঁয়ের লোক সব আসবে, দস্তখৎ করবে! এখন ব'লছ হয় নাই। এ কি রকম কথা হে? পারবে না ব'ললে, ডাক্তোরই লিখে রাখত!

ভবেশ বলিল—এ্যাই কথা। স্পষ্ট কথার কষ্ট নাই। ব'ললেই তো অন্য ব্যবস্থা হত!

দেবু হাসিল, বলিল—দরখাস্ত না-হয় আমি লিখে দিচ্ছি ভবেশ দাদা; কিন্তু দরখাস্ত ক'রে হবে কি বল'তে পার?

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হরিশ বলিল—তা হ'লে কি ক'রব বল? কিছু ক'রতে তো হবে, এমন ক'রে—ধর—আপনাকেই বা 'পেবোধ' দিই কি ব'লে?

—এক কাজ ক'রবেন ?

কি, বল ?

—পাঁচখানা গাঁয়ের লোক ডাকুন, তারপর চলুন সকলে মিলে সদরে ম্যাজিষ্টেটের কাছে।

—তাতে ফল হবে বলছ ?

—দরখাস্তের চেয়ে বেশী ফল হবে নিশ্চয়।

সকলে আপনাদের মধ্যেই আবার গুঞ্জন সুরু করিল।

পাঠশালার ছেলেরা ইতিমধ্যে চণ্ডীমণ্ডপেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল ; দেবু তাহাদের বলিল—এইখানেই এসেছে সব ? আচ্ছা আজ এইখানেই ব'সে সব পড়্‌তে আরম্ভ কর। কালকে যে পদ্যের মানে লিখতে দিয়েছিলাম সবাই লিখেছো তো ? খাতা আন সব—রাখ এইখানে।

হরিশ ডাকিল—দেবু।

—বলুন !

—তবে না হয় তাই চল। না, কিগো ? তোমাদের মত কি সব ?.... হরিশ জিজ্ঞাসু নেত্রে সকলের দিকে চাহিল।

ভবেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া বলিল—হরির নাম নিয়ে তাই চল সব। ধ'রে তো আর খেয়ে ফেল্‌বে না সায়েব ! আমি রাজি। বল হে সব বল, আপন আপন কথা বল সব !

মনে মনে সকলেই একটা উত্তেজনার উচ্ছ্বাস অনুভব করিল ; হরেন ঘোষাল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উত্তেজিত হইয়াছিল, সে বলিল—আই য়্যাম রেডি। এস্পার কি ওস্পার, যা হয় হবে।

—ব্যাস, তাই চল কাল সকালেই।

—হ্যাঁ ! হ্যাঁ ! হ্যাঁ !...এবার একটা সমবেত সম্মতি প্রায় ঐক্যতানের মত উঠিয়া পড়িল।

—কিন্তু—।....ভবেশের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল।

—কিন্তু কি ?....হরিশ বলিল—আবার কিন্তু করছ কেনে ?

—পাঁজিটা একবার দেখবে না ? দিন-খ্যান কেমন—?

—তা বটে। ঠিক কথা।

সকলেই মুহূর্ত্তে সায় দিয়া উঠিল।

দেবু তিক্ত স্বরে বলিল—আপনারা মানেন—কিন্তু রাজার কাজ তো পাঁজি মানে না। দশদিন যদি ভাল দিন-ক্ষণ না থাকে ?

ঘোষাল উত্তেজিত স্বরে বলিল—ড্যাম ইওর পাঁজি! বোগাস্ ওসব।

দেবু বলিল—মাম্‌লার দিন থাকলে যে মঘাতেও যেতে হয়।

হরিশ একটু ভাবিয়া বলিল—তা ঠিক। রাজদ্বারে পাঁজী পুথি নাই।

দেবু বলিল—ভোর ভোর বেরিয়ে পড়লে দশটা নাগাদ ঠিক কোর্টের সময়েই গিয়ে পৌঁছান যাবে। আপন আপন খাবার সকলে সঙ্গে নেবেন; চিড়ে, গুড়, যে যা পারেন। একটা দিন বৈতো নয়!

ঠিক এই সময় চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইল—গোমস্তা দাসজী, শ্রীহরি ঘোষ, ভূপাল নগদী এবং আরও কয়েকজন; তাহার মধ্যে একজন থোকন বৈরাগী—স্থানীয় রাজমিস্ত্রী।

দাসজী হাসিয়া বলিল—কি গো, দেবু মাষ্টারের পাঠশালায় সব আবার নতুন ক'রে নাম লেখালেন নাকি ? ব্যাপার কি সব ?

কে কি উত্তর দিত কে জানে, কিন্তু সে দায় হইতে সকলকে নিষ্কৃতি দিয়া হরেন ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—উই আর গোয়িং টু দি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট—কাল ম্যাজিস্ট্‌ট সাহেবের কাছে যাচ্ছি সব; ধানকাটা না হওয়া পর্য্যন্ত খানাপুরী স্টপ্‌ড্—বন্ধ রাখতে হবে।

ভ্রূ নাচাইয়া দাসজী প্রশ্ন করিল—ঘোষাল মশায়ের হাত ক'টা ? দু'টো না চারটে ?...এমন ভঙ্গিতে সে কথাগুলি বলিল যে, ঘোষাল

কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হইয়া চুপ করিয়া গেল। তারপর সে-ই চীৎকার করিয়া উঠিল—ব্রাহ্মণকে তুমি এত বড় কথা বল?

দাসজী সে কথার উত্তর দিল না, শ্রীহরির হাতে একখানা খবরের কাগজ ছিল, সেখানা টানিয়া লইয়া বলিল—এই দেখ। বেশী লাফিয়ো না। 'জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গেপ্তার। সেটেল্‌মেণ্টের কার্য্যে বাধা দেওয়ার অপরাধে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। এই নাও, পড়ে দেখ!....সে কাগজখানা মজলিসের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ঘোষালই কাগজখানা কুড়াইয়া লইয়া হেড লাইনে চোখ বুলাইয়া বলিয়া উঠিল—মাই গড্!...পাংশু বিবর্ণ মুখে সে কাগজখানা দেবুর দিকে বাড়াইয়া দিল। দেবু কাগজখানা পড়িতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি বলিল—আমাকে তো আপনারা বাদ দিয়েই সব ক'রছেন। তা করুন। আমি কিন্তু আপনাদের কথা না ভেবে পারি না। ও সব ক'রতে যাবেন না। পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত নয়। তার চেয়ে চলুন বিকাল-বেলা সেটেল্‌মেণ্ট্.. হাকিমের সঙ্গেই দেখা ক'রে আসি। দাসজী যাবেন, আমি যাব, মাতব্বর জন-কয়েক আপনারাও চলুন। ভাল রকমের ডালিও একটা নিয়ে যাই। মাছ একটা ভালই পড়েছে, বুঝলেন হরিশ খুড়ো, পাকি বার সের!....বলিতে বলিতেই বোধ করি তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল! দাসজীকে বলিল—হ্যাঁগো, সেই ইয়ে, মানে—মুরগীর জন্যে লোক পাঠানো হ'য়েছে তো?....সবাই মিলে ধরে-পোড়ে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর, ওই না-রাজী দরখাস্ত করা, কি, একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে দরবার ক'রতে যাওয়া—ও একরকম সরকারের হুকুমের বিরোধিতা করা। তাতে আমাদের বিপদ বাড়বে বই কম্‌বে না।

দেবু কাগজখানা ঘোষের হাতেই ফেরৎ দিল, তারপর সে ছেলেদের পড়াইতে আরম্ভ করিল। বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া লিখিল, এক মণ দুধের দাম যদি পাঁচ টাকা দশ আনা হয়—।...

ও-দিকে মজলিসে আবার পরামর্শের গুঞ্জনধ্বনি উঠিল। হরেন ঘোষালেরই চাপা-গলা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল—ভেরি নাইস্ হবে। ভেরি গুড্ পরামর্শ।

দাসজী এবার খোকন রাজমিস্ত্রীকে বলিল—ধর্, দড়ি ধর্। ভূপাল, তুই ধর্ একদিকে।

খোকন বৈরাগী খানিকটা বাবুই ঘাসের দড়ি হাতে অগ্রসর হইয়া আসিল, সর্ব্বাগ্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া দেব-দেবীকে প্রণাম করিল—তারপর জোড় হাতে বলিল—আরম্ভ করি তা'হলে?

দাসজী বলিল—দুগ্‌গা ব'লে, তার আর কথা কি? শুনছেন গো—হরিশ মণ্ডল মশায়, ভবেশ পাল! চণ্ডীমণ্ডপ পাকা ক'রে বাঁধানো হ'চ্ছে? আপনারাও একটা অনুমতি দেন।

—বাঁধানো হ'চ্ছে? পাকা ক'রে?....সমস্ত মজলিস-শুদ্ধ লোক অবাক হইয়া গেল।

—হাঁ। একটা কুয়োও হ'চ্চে—ওই ষষ্ঠীতলায়। ঘোষমশায়, মানে, আমাদের শ্রীহরি ঘোষ গ্রামের উপকারের জন্ম এই সব ক'রে দিচ্ছেন।

শ্রীহরি নিজে হাতজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—অনুমতি দেন আপনারা সবাই।

হরিশ বলিল—দীর্ঘজীবী হও বাবা। এই তো চাই। তা' মা-ষষ্ঠীকে আর ধূলোয় মাটিতে রাখছ ক্যানে? ষষ্ঠীতলাটিও বাঁধিয়ে দাও।

শ্রীহরি বলিল—বেশ তো তাও হোক। ষষ্ঠীতলা ব'লে খেয়ালই হয় নাই আমার।

হরিশ মজলিসের দিকে চাহিয়া বলিল—তবে শ্রীহরি, দাসজী যা ব'লেছেন তাই ঠিক হ'ল; বুঝলেন গো সব?…শ্রীহরির এত বড় বদান্যতায় একমুহূর্ত্তে সকলে তাহার কথাই শিরোধার্য্য করিয়া লইল।

শ্রীহরির খুড়া ভবেশ অকস্মাৎ ভ্রাতুষ্পুত্রের গৌরবে ভাবাবেগে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল, উঠিয়া আসিয়া শ্রীহরির মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—মঙ্গল হবে মঙ্গল হবে বাবা। শ্রীহরি খুড়াকে প্রণাম করিল।

ঘোষাল চুপি চুপি বলিল, হি উইল ডাই—ছিরু এইবার নিশ্চয় ম'রবে। হঠাৎ এতবড় সাধু? এত ভাল লক্ষণ নয়! মতিভ্রম—দিস ইজ্ মতিভ্রম!

মজলিস ভাঙিয়া গেল। মজুরদেরও জলখাবারের ছুটি হইল। দেবু ছেলেদের ছুটি দিয়া বলিল—কাল থেকে আমার বাড়ীতে পাঠশালা ব'সবে, বুঝেছ? সেইখানে যাবে সবাই।

—বাঁধানো হ'য়ে গেলে আবার এইখানে ব'সবে তো পণ্ডিত মশায়?

—পাকা হোলে আবার বস্‌বে বৈকি! যাও, আজ ছুটি।…

সে উঠিল, উঠিতে গিয়া তাহার নজরে পড়িল—বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী ঠুক্ ঠুক্ করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের উপরে উঠিতেছে। দেবু সম্ভাষণ করিয়া বলিল—চৌধুরী মশায়, এত বেলায়?

—হ্যাঁ, একটু বেলা হ'য়ে গেল। সকালে আসতে পারলাম না। দরখাস্তে সই ক'রবার ডাক ছিল!

দেবু হাসিয়া বলিল—কষ্টই সার হ'ল আপনার, দরখাস্ত করা হ'ল না।…চৌধুরী হাসিয়া বলিল—পথে আস্‌তে আস্‌তে সব শুনলাম। সদরে যাবার পরামর্শ হয়েছিল তা-ও শুনলাম। আবার নতুন হুকুমও শুনলাম—বিকেলে আসতে হবে। তাই চলুন, দেখা যাক কি হয়

—আমি যাব না, চৌধুরী মশাই।

বৃদ্ধ, দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—যা পাঁচ জনে ভাল বোঝে, করুক, পণ্ডিত, আপনি মন খারাপ ক'রবেন না।

দেবু জোর ক'রিয়া একটু হাসিল।

—চলুন, পণ্ডিত, আপনার ওখানে একটু জল খাব।

—আসুন, আসুন।···দেবু ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইল।

চলিতে চলিতে বৃদ্ধ বলিল—ও কিছু হবে না, পণ্ডিত। একদিন আমারও ভাল দিন ছিল—আর তখন ডালি দেওয়া তো হরিরলুটের সামিল ছিল। আজকালই বরং একটু কম হ'য়েছে। তা' দেখছি—বিশেষ কিছু হয় না। তার চেয়ে বরং সবাই মিলে গিয়ে পড়লে—।··· 'কিছু হইত' এ কথাও ভরসা ক'রিয়া বৃদ্ধ বলিতে পারিল না।

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এতটুকু সাহস নাই, মতিস্থির নাই; এরা মানুষ নয়, চৌধুরীমশায়!···সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। চোখ মুছিয়া হাসিয়া সে আবার বলিল—জানেন, পাঁচখানা গাঁয়ের লোক যদি সদরে যেতো, আমি ব'লতে পারি, চৌধুরী মশায়, কাজ নিশ্চয় হ'ত। সায়েব নিশ্চয় কথা শুনত।

বৃদ্ধ হাসিল—আপনি মিছে দুঃখু ক'রছেন, পণ্ডিত!

—দুঃখ একটু হয় বৈ কি।

—একটা গল্প ব'লব চলুন।

জল খাইয়া কলার পেটোয় তামাক খাইতে খাইতে চৌধুরী বলিল—অনেক দিন আগে, মহাগ্রামের ঠাকুর মশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম—প্রয়াগে কুম্ভ-স্নান ক'রতে। হরেক রকমের সন্ন্যাসী দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। নাগা সন্ন্যাসী দেখলাম—উলঙ্গ ব'সে

রয়েছে সব। কেউ বুক পর্য্যন্ত বালিতে পুঁতে র'য়েছে, কেউ উর্দ্ধবাহু, কেউ বসে আছে লোহার কাঁটার আসনে, কেউ চারিদিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ব'সে রয়েছে। দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। বললাম—স্বর্গ এদের হাতের মুঠোয়। শুনে, ঠাকুরমশায় বললেন—চৌধুরী, একটা গল্প বলি শোন।....

তখন সত্যযুগের আরম্ভ। সবে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। সবাই তখন সাধু, বনে কুটীর বেঁধে সব থাকেন—ফলমূলে জীবন ধারণ চলে, ভগবানের নাম করেন, আর পরমানন্দে দিন কাটে। মা-লক্ষ্মী তখন বৈকুণ্ঠে, অন্নপূর্ণা কৈলাসে, মানে সোনা-রূপো, এমন কি—অন্নেরও পয্যন্ত প্রচলন হয় নাই সংসারে। যাক, এই ভাবে একপুরুষ কেটে গেল। তখন অকাল মৃত্যু ছিল না, কাজেই হাজার বছর পরে একসঙ্গে একপুরুষের মৃত্যুর সময় হ'য়ে এল। তখন মানুষেরা ঠিক ক'রলেন—চল, আমরা সশরীরে স্বর্গে যাব।

বদরিকাশ্রম পার হ'য়ে হিমালয়ের পথে পিঁপড়ের সারির মত মানুষ চ'লেছে। স্বর্গ-দ্বারে যে দ্বারী ছিল, সে দেখ্‌তে পেলে কোটী কোটী লোক কলরব করতে করতে সেই দিকেই আসছে। সে ভয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে—দেবরাজ, মহা বিপদ উপস্থিত।

—কিসের বিপদ হে?

—কোটী কোটী কারা স্বর্গের দিকে চলে আসছে পিঁপড়ের সারির মত। বোধ হয় দৈত্য-সৈন্য।

—দৈত্য-সৈন্য? বল কি?

সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। এমন সময় এলেন দেবর্ষি নারদ। ব'ললেন—দৈত্য নয় দেবরাজ, মানুষ।

—মানুষ?

হ্যাঁ, মানুষ। তোমাদের অস্ত্রে তাদের কিছুই হবে না; কারণ পাপ তো তাদের দেহে নাই, সুতরাং দেব-অস্ত্র অচল। দিব্যাস্ত্র ফুলের মালা হ'য়ে যাবে তাদের গায়ে ঠেকে।

—তবে উপায়? এত মানুষ যদি সশরীরে এখানে আসে তবে—? ....ইন্দ্র আর কথা ব'লতে পারলেন না। সবাই হয়তো দাবি করবে তাঁরই সিংহাসন!

—চল, নারায়ণের কাছে চল সব।

নারায়ণ শুনে হাসলেন। ব'ললেন—আচ্ছা, চল দেখি। বলে প্রথমেই তিনি পাঠালেন মা অন্নপূর্ণাকে।

অন্নপূর্ণা এসে পথে এক পুরী নির্ম্মাণ ক'রে ফেল্‌লেন—ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ক'রে রাখলেন এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনে। তারপর মানুষের সেই দল সেখানে আসবামাত্র তাদের ব'ললেন—পথশ্রমে বড়ই ক্লান্ত তোমরা, আজকের মত আমার আতিথ্য-গ্রহণ কর।

মানুষেরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইল, রান্নার সুগন্ধে সকলেই মোহিত হয়ে গেল। কতক দল কিন্তু মোহ কাটিয়ে ব'ললে—স্বর্গের পথে বিশ্রাম ক'রতে নাই।...তারা চলে গেল। যারা থাকল—তারা অন্ন-ব্যঞ্জন খেয়ে পেট ফুলিয়ে সেইখানেই শুয়ে পড়ল। ব'ললে—মা, আমরা এইখানেই যদি থাকি, রোজ এমনি ক'রে খেতে দেবে তো?

মা ব'ললেন—নিশ্চয়।...থেকে গেল তারা সেইখানেই।

যারা থামে নি, তারা চল্‌ল এগিয়ে। নারায়ণ তখন পাঠিয়ে দিলেন লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মীর পুরী—সোনার পুরী! সোনার পথ, সোনার খাট, সোনার ধুলো পুরীতে। দেখে মানুষের চোখ ধেঁধে গেল।

মা ব'ললেন—এ সব তোমাদের জন্য বাবা। এস—এস, পুরীতে প্রবেশ কর।

একদল প্রবেশ ক'রলে।

পথে আরও এক পুরী তখন নির্ম্মাণ হ'য়ে আছে। ফুলের বাগান চারিদিকে, কোকিল ডাকছে, ভুবন-ভুলানো গান শোনা যাচ্ছে—আর এক অপূর্ব্ব সুগন্ধ ভেসে আসছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অপ্সরার দল, একহাতে তাদের অপরূপ ফুলের মালা আর এক হাতে সোনার পানপাত্র। তারা ডাকছে—আসুন, বিশ্রাম করুন; আমরা আপনাদের দাসী, সেবা ক'রবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা তৃষ্ণার্ত্ত—এই পানীয় পান করুন।

সে পানীয় হ'চ্ছে স্বর্গীয় সুরা। দলে দলে লোকে ঢুকে পড়ল!

নারায়ণ বললেন—দেখ তো ইন্দ্র, আর কেউ আসছে কিনা?

ইন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—না।

—ভাল ক'রে দেখ।

—একটা কি নড়ছে, বোধহয় একজন মানুষ।

নারায়ণ ব'ললেন—স্বর্গদ্বার খুলে রাখ, তুমি নিজে পারিজাতের মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাক। আমার মত সম্মান ক'রে স্বর্গে নিয়ে এস। ওর পায়ের ধূলোয় স্বর্গ পবিত্র হ'ল।....

হাসিয়া চৌধুরী বলিল—জান্‌লে পণ্ডিত গল্পটি শেষ ক'রে ঠাকুরমশায় ব'লেছিলেন—চৌধুরী, এর পর কেউ ভক্তের রসাল খাদ্যদ্রব্যে ভুলবে, কেউ মোহন্ত হয়ে সোনা-রূপো সম্পত্তি নিয়ে ভুলবে, কেউ সেবাদাসীর দল নিয়ে স্ত্রীলোকে আসক্ত হবে। স্বর্গে যাবে কোটী কোটীর মধ্যে একজন।...দুঃখ ক'র না পণ্ডিত; মানুষের ভুল-ভ্রান্তি-মতিভ্রম পদে পদে। এরা মানুষ নয়, ব'লে দুঃখ ক'রছেন, মানুষ হওয়া কি সোজা কথা?....আচ্ছা আমি উঠি তা' হ'লে। ওই ডাক্তার আসছেন—উনি এসে পড়লে আবার খানিকক্ষণ দেরি হ'য়ে যাবে। আমি চলি।

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি পথে নামিয়া পড়িল।

গল্পটি দেবুর বড় ভাল লাগিল। বিলুকে আজ গল্পটি বলিতে হইবে। আশ্চর্য্য বিলুর ক্ষমতা, একবার শুনিলেই সে শিখিয়া লয়।

ডাক্তার আসিয়া বিনা ভূমিকায় বলিল—শুনলাম সব!

দেবু হাসিল, বলিল—তুমি সকাল থেকে কোথায় ছিলে হে?

—অনিরুদ্ধের বাড়ী। কামার-বউয়ের আজ আবার ফিট্ হ'য়েছিল।

—আবার?

—হ্যাঁ। সে সাংঘাতিক ফিট্। (ঘরে মেয়ে নাই, ছেলে নাই, সে এক বিপদ। তবু দুর্গা মুচিনী ছিল, তাই খানিকটা সাহায্য হ'ল বউটার বোধ হয় মৃগীরোগে দাঁড়িয়ে গেল। অনিরুদ্ধ তো ব'লছে অন্য রকম। মানুষে নাকি তুক্ ক'রেছে।)

—মানুষে তুক্ ক'রেছে?

—হ্যাঁ, ছিরে পালের নাম করছে। যাক গে!—এ দিকের এ যা' হয়েছে, ভালই হয়েছে দেবু। পরে সব ঝক্কি পড়তো তোমার আর আমার ঘাড়ে। জে এল ব্যানার্জ্জীর এ্যারেষ্টের খবর জান তো?—হয় তো আমাদেরও এ্যারেষ্ট করতো। আর সব শালা সুড় সুড় ক'রে ঘরে ঢুকতো। আচ্ছা, আমি এখন চলি। সকাল থেকে রোগী বসে আছে, ওষুদ দিতে হবে।

ডাক্তার ব্যস্ত হইয়াই চলিয়া গেল। দেবু একটু হাসিল। ডাক্তারের এই ব্যস্ততার অর্দ্ধেকটা সত্য, বাকীটা কৃত্রিম। রোগীদের জন্য জগনের দরদ অকৃত্রিম; চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে সত্যই সজাগ। শত্রু হোক, মিত্র হোক—সময় অসময় যখনই হোক-ডাকিলেই সে বাহির হইয়া আসিবে, যত্ন করিয়া নিজে ঔষধ তৈয়ারী করিয়া দিবে। কিন্তু আজিকার ব্যস্ততাটা কিছু বেশী, এক

অস্বাভাবিক। জে-এল ব্যানার্জ্জীর গ্রেপ্তারের সংবাদে ডাক্তার বেশ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছে, আলোচনাটা সে এড়াইতে চায়।....

(—পণ্ডিত মশাই গো!...বাড়ীর ভিতর হইতে কে ডাকিল।

পণ্ডিত পিছন ফিরিয়া দেখিল—বিলু দাঁড়াইয়া হাসিতেছে; সে-ই ডাকিয়াছে।

রাগের ভাণ করিয়া দেবু বলিল—দুষ্ট বালিকে, হাসিতেছ-কেন? পড়া করিয়াছ?

বিলু খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবু উঠিয়া আসিয়া বলিল—আজ ভারী সুন্দর একটা গল্প শুনেছি, তোমাকে বলব; একবার শুনেই শিখতে হবে।)

বিলু বলিল—খোকার কাছে একবার বস তুমি! কামারবউকে একবার আমি দেখে আসি।

পনেরো

পদ্মের মূর্চ্ছা—নিয়মিত মূর্চ্ছার ব্যাধিতে দাঁড়াইয়া গেল।

বন্ধ্যা পদ্মের সবল পরিপুষ্ট দেহখানি মাস খানেকের মধ্যেই দুর্ব্বল শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে সে; এই শীর্ণতায় এখন তাহাকে অধিকতর দীর্ঘাঙ্গী বলিয়া মনে হয়; দুর্ব্বলতাও বড় বেশী চোখে পড়ে। চলিতে ফিরিতে দুর্ব্বলতাবশত সে যখন কোন-কিছুকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আত্মসম্বরণ করে, তখন মনে হয় দীর্ঘাঙ্গী পদ্ম যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সেই বলিষ্ঠা ক্ষিপ্রচারিণী পদ্মের প্রতি পদক্ষেপে এখন ক্লান্তি ফুটিয়া উঠে—ধীর মন্দগতিতেে চলিতেও তাহার পা যেন টলে। কেবল তাহার চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে অস্বাভাবিক প্রখর। দুর্ব্বল পাণ্ডুর মুখের মধ্যে পদ্মের ডাগর চোখ দুইটা অনিরুদ্ধের

সখের শাণিত বগি-দা'খানায় আঁকা পিতলের চোখ দুইটার মতই ঝক্‌মক্ করে। স্ত্রীর চোখের দিকে চাহিয়া অনিরুদ্ধ শিহরিয়া উঠে।

অনটনের দুঃখের উপর এই দারুণ দুশ্চিন্তায় অনিরুদ্ধ বোধ করি পাগল হইয়া যাইবে। জগন ডাক্তারের পরামর্শে সেদিন সে কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল।

জগন বলিয়াছিল—মৃগীরোগ।

হাসপাতালের ডাক্তার বলিল—এ একরকম মূর্চ্ছারোগ। বন্ধ্যা মেয়েদেরই, মানে যাদের ছেলেপিলে হয় না তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। হিস্‌টিরিয়া।

পাড়া-পড়শীরা কিন্তু প্রায় সকলেই বলে—দেবরোগ! বাবা বুড়াশিব ভাঙাকালীকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোন কালে পার পায় নাই! নবান্নের ভোগ দেবস্থলে আনিয়া সে-বস্তু তুলিয়া লওয়ার অপরাধ তো সামান্য নয়। কিন্তু অনিরুদ্ধ ও কথা গ্রাহ্য করিল না। তাহার মত কাহারও সহিত মেলে না; তাহার ধারণা, দুষ্ট লোকে তুক্ করিয়া এমন করিয়াছে। ডাইনী-ডাকিনী বিদ্যার অভাব দেশে এখনও হয় নাই। ছিরুর বন্ধু চন্দ গড়াঞী এ বিদ্যায় ওস্তাদ। সে বাণ মারিয়া মানুষকে পাথরের মত পঙ্গু করিয়া দিতে পারে। পদ্মের একটা কথা যে তাহার মনে অহরহ জাগিতেছে!....

প্রথম দিন পদ্মের প্রথম মূর্চ্ছা জগন ডাক্তার ভাঙাইয়া দেওয়ার পর —সেই রাত্রেই ভোরের দিকে সে ঘুমের ঘোরে একটা বিকট চীৎকার করিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই নিশুতি রাত্রে অনিরুদ্ধ আর জগনকে ডাকিতে পারে নাই এবং সেই রাত্রে মূর্চ্ছিতা পদ্মকে ফেলিয়া যাওয়ারও উপায় তাহার ছিল না। বহু কষ্টে পদ্মের চেতনা সঞ্চার হইলে নিতান্ত অসহায়ের মত পদ্ম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আমার বড় ভয় লাগছে গো!

—ভয়? ভয় কি? কিসের ভয়?

—আমি স্বপ্ন দেখলাম—

—কি? কি স্বপ্ন দেখ্‌লি? অমন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলি ক্যানে?

—স্বপ্ন দেখলাম—মস্ত বড় একটা কালো কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধ'রছে।

—সাপ?

—হ্যাঁ, সাপ! আর—

—আর?

—সাপটা ছেড়ে দিয়েছে ওই মুখপোড়া—

—কে? কোন্ মুখপোড়া?

ওই শত্তুর—ছিরে মোড়ল! সাপ ছেড়ে দিয়ে আমাদের সদর দুয়োরের চালাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

পদ্ম আবার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছিল।....

কথাটা অনিরুদ্ধের মনে আছে। পদ্মের অসুখের কথা মনে হইলেই —ওই কথাটাই তাহার মনে পড়িয়া যায়। ডাক্তারেরা যখন চিকিৎসা করিতেছিল, তখন মনে হইলেও কথাটাকে সে আমল দেয় নাই। কিন্তু দিন দিন ধারণাটা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এখন সে রোজার কথা ভাবিতেছে, অথবা কোন দেবস্থল!

তাহার এই ধারণার কথা বিশেষ কেহ জানে না, পদ্মকেও সে বলে নাই। বলিয়াছে—কেবল মিতা গিরীশ ছুতারকে। জংসনের দোকানে যখন দু'জন যায়, তখন অনেক সুখদুঃখের কথা হয়। দু'জনে অনেক কল্পনাই করে। সমস্ত গ্রামই প্রায় এখন একদিকে, তাহাদিগকে জব্দ করিবার একটা সঙ্ঘবদ্ধ ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। অনিরুদ্ধ ও গিরীশের সঙ্গে আর একজন আছে, পাতু মুচী। ছিরু পালকে এখন

শ্রীহরি ঘোষ নামে গ্রামের প্রধানরূপে খাড়া করিয়া গোমস্তা দাসজী বসিয়া বসিয়া কল টিপিতেছে। গ্রামের দলের মধ্যে নাই কেবল দেবু পণ্ডিত, জগন ঘোষ এবং তারা নাপিত। দেবু নিরপেক্ষ, তাহার প্রীতি—স্নেহের উপর অনিরুদ্ধের অনেক ভরসা; কিন্তু এ সকল কথা লইয়া অহরহ তাহাকে বিরক্ত করিতেও অনিরুদ্ধের সঙ্কোচ হয়। জগন ডাক্তার দিবারাত্র ছিরুকে গালাগালি করে, কিন্তু ওই পর্য্যন্তই—তাহার অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করা ভুল। তারাচরণকে বিশ্বাস করা যায় না। তারাচরণ নাপিতের সঙ্গে গ্রামের লোকের হাঙ্গামাটা মিটিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকই মিটাইতে বাধ্য হইয়াছে, কারণ সামাজিক ক্রিয়াকলাপে নাপিতের প্রয়োজন বড় বেশী! জাতধর্ম্ম হইতে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি ক্রিয়াতেই নাপিতকে চাই। তারাচরণ এখন নগদ পয়সা লইয়াই কাজ করিতেছে, রেট অবশ্য বাজারের রেটের অর্দ্ধেক;—দাড়ি-গোঁফ কামাইতে এক পয়সা, চুল কাটিতে দু'পয়সা, চুলকাটা এবং কামানো একসঙ্গে তিন পয়সা।

অন্যদিকে সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে নাপিতের প্রাপ্যও কমিয়া গিয়াছে। নগদ বিদায় ছাড়া—চাল, কাপড় ইত্যাদি যে-সব পাওনা নাপিতের ছিল, তাহার দাবি নাপিত পরিত্যাগ করিয়াছে। তারাচরণ নাপিত ঠিক কোনো পক্ষভুক্ত নয়, অনেকটা নিরপেক্ষ ব্যক্তি। অনিরুদ্ধ বা গিরীশ জিজ্ঞাসা করিলে চুপি চুপি সে গ্রামের লোকের অনেক পরামর্শের কথাই বলিয়া যায়। আবার অনিরুদ্ধ ও গিরীশের সংবাদ গ্রামের লোক জিজ্ঞাসা করিলে তা-ও কিছু কিছু বলে। কিন্তু তবুও তারাচরণের আকর্ষণ অনিরুদ্ধ-গিরীশের দিকেই বেশী। পাতুর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাদেরই সে দুই চারিটা বেশী খবর দেয়। কিন্তু অযাচিতভাবে সকল খবর দিয়া যায় দেবুকে। দেবুকে সে ভালবাসে। আর কিছু কিছু খবর বলে জগন ডাক্তারকে। বাছিয়া

বাছিয়া উত্তেজিত করিবার মত সংবাদ সে ডাক্তারকে বলে। ডাক্তার চীৎকার করিয়া গালিগালাজ দেয়; তারাচরণ তাহাতে খুসী হয়, দাঁত বাহির করিয়া হাসে। কৌশলী তারাচরণ কিন্তু কোনদিন প্রকাশ্যে অনিরুদ্ধ-গিরীশের সঙ্গে হৃদ্যতা দেখায় না। কথাবার্ত্তা যাহা-কিছু হয় সে সব ওপারের জংসন সহরে হাটতলায়। সেও আজকাল জংসনে গিয়া ক্ষুর ভাড় লইয়া হাটের পাশেই একটা গাছতলায় বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাঁচখানা গ্রামে তাহার যজমান আছে, তাহার মধ্যে তিনখানার কাজ একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। বাকী দুইখানার একখানি নিজের গ্রাম—অপরখানি মহুগ্রাম। মহুগ্রামের ঠাকুরমশায় বলেন মহাগ্রাম; এই ঠাকুরমহাশয় শিবশেখর ন্যায়রত্ন জীবিত থাকিতে ও-গ্রামের কাজ ছাড়া অসম্ভব। ন্যায়রত্ন সাক্ষাৎ দেবতা। এই দুইখানা গ্রামে দু'দিন বাদে—সপ্তাহের পাঁচদিন সে অনিরুদ্ধ-গিরীশের মত সকালে উঠিয়া জংসনে যায়। হাটতলায় অনিরুদ্ধের কামারশালার পাশেই বটগাছের ছায়ায় কয়েকখানা ইঁট পাতিয়া সে বসে। সেই তাহার হেয়ার কাটিং সেলুন। দস্তুরমত সেলুনের কল্পনাও তাহার আছে। অনিরুদ্ধের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয় সেইখানে।

পদ্মের অসুখ সম্বন্ধে নিজের ধারণার কথা অনিরুদ্ধ গিরীশকে বলিলেও তারাকে বলে নাই। তারাচরণকে তাহারা ঠিক বিশ্বাস করে না।

কিন্তু তারাচরণ অনেক সন্ধান রাখে, ভাল রোজা, জাগ্রত দেবতার অথবা প্রেত-দানার স্থান, যেখানে ভর্ হয়—এ সবের সন্ধান তারা নাপিত দিতে পারে! অনিরুদ্ধ ভাবিতেছিল—তারা নাপিতকে কথাটা বলিবে কি না!

সেদিন মনের আবেগে অনিরুদ্ধ কথাটা তারাচরণের পরিবর্ত্তে বলিয়া ফেলিল জগন ডাক্তারকে। দ্বিপ্রহরে জংসনের কামারশালা হইতে

ফিরিয়া অনিরুদ্ধ দেখিল, পদ্ম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। কখন যে মূর্চ্ছা হইয়াছে—কে জানে! মুখে-চোখে জল দিয়াও চেতনা হইল না। কামারশালায় তাতিয়া পুড়িয়া এতটা আসিয়া অনিরুদ্ধের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তিতে ক্রোধে সে কাণ্ডজ্ঞান হারাইয়া ফেলিল। জলের ঘটিটা ফেলিয়া দিয়া, পদ্মের চুলের মুঠি ধরিয়া সে নিষ্ঠুরভাবে আকর্ষণ করিল। কিন্তু পদ্ম অসাড়। চুল ছাড়িয়া দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অনিরুদ্ধের বুকের ভিতরটা কান্নার আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া জগন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। জগনের তেজী ওষুধের ঝাঁঝে পদ্ম অচেতন অবস্থাতেই বারকয়েক মুখ সরাইয়া লইয়া, শেষে গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল।

ডাক্তার বলিল—এই তো চেতন হ'য়েছে। কাঁদছিস কেন তুই ?

অনিরুদ্ধের চোখ দিয়া দরদর-ধারে জল পড়িতেছিল। সে ক্রন্দন-জড়িত কণ্ঠেই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখুন দেখি, ডাক্তার! আগুন-তাতে পুড়ে এই এক ক্রোশ দেড়ক্রোশ রাস্তা এসে আমার ভোগান্তি দেখুন দেখি একবার।

ডাক্তার বলিল—কি ক'রবি বল্? রোগের উপর তো হাত নাই। এ তো আর মানুষ ক'রে দেয় নাই।

অনিরুদ্ধ আজ আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, সে বলিয়া উঠিল—মানুষ, মানুষেই ক'রে দিয়েছে ডাক্তার; তায় আমার এতটুকুন্ সন্দেহ নাই। রোগ হ'লে এত ওষুধ-পত্র—একটুকুও বারণ শোনে না এ মানুষের কীর্ত্তি।

জগন ডাক্তার হইলেও প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারে নাই; রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইন্‌জেকশন দিয়াও সে দেবতার পাদোদকের উপর ভরসা রাখে; অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সে

বলিল—তা যে না হতে পারে, তা নয়। ডাইনী-ডাকিনী দেশ থেকে একেবারে যায় নাই। কিন্তু আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে তো তা বিশ্বাস করে না। ওরা ব'লেছে—

বাধা দিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—বলুক, এ কীর্ত্তি ওই হারামজাদা ছিরের।....ক্রোধে ফুলিয়া সে এতখানি হইয়া উঠিল।

সবিবিস্ময়ে জগন প্রশ্ন করিল—ছিরের?

—হ্যাঁ, ছিরের!·· ক্রুদ্ধ আবেগে অনিরুদ্ধ পদ্মের সেই স্বপ্নের কথাটা আনুপূর্ব্বিক ডাক্তারকে বলিয়া শেষে বলিল—ওই যে চন্দর গঁড়াই, ছিরে শালার প্রাণের বন্ধু—ও শালা ডাকিনী-বিদ্যে জানে। যোগী গঁড়ায়ের বিধবা মেয়েটাকে কেমন বশীকরণ ক'রে বের ক'রে নিলে—দেখলেন তো! ওকে দিয়েই এই কীর্ত্তি ক'রেছে ছিরে!

জগন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল, কিছুক্ষণ পর বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হুঁ।

ক্রোধে অনিরুদ্ধের ঠোঁট দুইটি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। পদ্ম এই কথাবার্ত্তার মধ্যে উঠিয়া বসিয়াছিল; দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া সে হাঁপাইতেছিল। অনিরুদ্ধের ধারণার কথাটা শুনিয়া সে অবাক হইয়া গেল।

জগন বলিল—তাই তুই দেখ্ অনিরুদ্ধ; একটা মাদুলি কি তাবিজ হ'লেই ভাল হয়! তারপর বলিল—দেখ, একটা কথা কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে, দেখিস তুই এ ঠিক ফলে যাবে; নিজের বাণে বেটা নিজেই ম'রবে।

অনিরুদ্ধ সবিস্ময়ে জগনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। জগন বলিল—সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয় জানিস তো?

—কি হয়?

—বংশবৃদ্ধি হয়, ছেলে হয়। তোদের কপালে ছেলে নাই, কিন্তু

ছিরে নিজে যখন সাপ ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে ম'রে—তোর ঘরে এসে জন্মাবে। তোর হয় তো নাই, কিন্তু ও নিজে থেকে দিয়েছে।

জগনের এই বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া অনিরুদ্ধ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল; তাহার চোখ দুইটা বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে জগনের মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

পদ্মের মাথার ঘোমটা অল্প সরিয়া গিয়াছে, সে-ও স্থির বিচিত্র-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল সম্মুখের দিকে। তাহার মনে পড়িয়া গেল—ছিরুর শীর্ণ গৌরবর্ণা স্ত্রীর কথা। তাহার চোখ-মুখের মিনতি, তাহার সেই কথা —'আমার ছেলে দু'টিকে যেন গাল দিয়ো না ভাই! তোমার পায়ে ধ'রতে এসেছি আমি!'

জগন অনিরুদ্ধ কথা বলিতে বলিতে বাহিরে চলিয়া গেল। জগন বলিল—চিকিৎসা এর তেমন কিছু নাই। তবে মাথাটা যাতে একটু ঠাণ্ডা থাকে, এমনি কিছু চলুক। আর তুই বরং, একবার সাওগ্রামের শিবনাথ তলাটাই না-হয় ঘুরে আয়। শিবনাথ-তলার নাম-ডাক তো খুব আছে।

শিবনাথ-তলার ব্যাপারটা ভৌতিক ব্যাপার। কোন পুত্রহারা শোকার্ত্তা মায়ের অবিরাম কান্নায় বিচলিত হইয়া নাকি তাহার মৃত পুত্রের প্রেতাত্মা নিত্য সন্ধ্যায় মায়ের কাছে আসে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার মা খাবার রাখিয়া দেয়, আসন পাতিয়া রাখে; প্রেতাত্মা আসিয়া সেই ঘরে বসিয়া মায়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে। সেই অবসরে নানা স্থান হইতে লোকজন আসিয়া রোগ-দুঃখ—অভাব-অভিযোগ প্রেতাত্মার কাছে নিবেদন করে। প্রেতাত্মা সে-সবের প্রতিকারের উপায় করিয়া দেয়।

অনিরুদ্ধ বলিল—তাই দেখি।

—দেখি নয়, শিবনাথ-তলাতেই যা তুই। দেখ না, কি বলে।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনিরুদ্ধ একটু হাসিল—ম্লান হাসি। বলিল—এদিকে যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে, এগিয়ে যাই কি ক'রে!

ডাক্তার অনিরুদ্ধের দিকে চাহিল, অনিরুদ্ধ বলিল—পুঁজি ফাঁক হ'য়ে গেল, ডাক্তারবাবু, বর্ষাতে হয়তো ভাতই জুটবে না। বাকুড়ির ধান মূলে-চুলে গিয়েছে, গাঁয়ের লোকে ধান দেয় নাই, আমিও চাইতে যাই নাই। তার ওপর মাগীর এই রোগে কি খরচটা হ'চ্ছে তা তো আপনি সবই জানেন গো! শিবনাথের শুনেছি বেজায় খাঁই।

প্রেত-দেবতা শিবনাথ রোগ-দুঃখর প্রতিকার করিয়া দেয়, কিন্তু বিনিময়ে তাহার মাকে মূল্য দিতে হয়। সেটা লাগে প্রথমেই।

জগন বলিল—পাঁচ-সাত টাকা হ'লে আমি না-হয় কোন রকমে দেখতাম অনিরুদ্ধ, কিন্তু বেশী হ'লে তো—

অনিরুদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—ডাক্তারের অসমাপ্ত কথার উত্তরে সে বলিয়া উঠিল, তাতেই হবে ডাক্তারবাবু, তাতেই হবে; আরও কিছু আমি ধার-ধোর ক'রে চালিয়ে নোব। দেবুর কাছে কিছু, আপনার আর দুগ্গার কাছে যদি—

ডাক্তার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—দুগ্গা?

অনিরুদ্ধ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, তারপর মাথা চুলকাইয়া একটু লজ্জিতভাবেই বলিল—পেতো মুচির বোন দুগ্গা গো।

চোখ দুইটা বড় করিয়া ডাক্তারও একটু হাসিল—ও!....তারপর আবার প্রশ্ন করিল—ছুঁড়ির হাতে টাকাকড়ি আছে, নয়?

—তা আছে বৈকি। শালা ছিরের অনেক টাকা ও বাগিয়ে নিয়েছে। তা ছাড়া কঙ্কণার বাবুদের কাছেও বেশ পায়। পাঁচ টাকার কমে হাঁটেই না।

—ছিরের সঙ্গে নাকি এখন একবারে ছাড়াছাড়ি শুনলাম?

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—আমার কাছে একখানা বগি-দা করিয়ে নিয়েছে; বলে—খ্যাপা কুকুরকে বিশ্বাস নাই। রাত্রে সেখানা হাতের কাছে নিয়ে ঘুমোয়।

—বলিস্ কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ!

—কিন্তু তোর সঙ্গে এত মাখামাখি কিসের? আস্‌নাই নাকি?

মাথা চুলকাইয়া অনিরুদ্ধ বলিল—না—তা' নয়, তবে দুগ্‌গা লোক ভাল, যাই-আসি গল্প-সল্প করি।

—মদ-টদ চলে তো?

—তা'—এক-আধ দিন মধ্যে-মাঝে—

অনিরুদ্ধ লজ্জিত হইয়া হাসিল।

* * * *

দুর্গার সঙ্গে সত্যই অনিরুদ্ধের হৃদ্য ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিতেছে।

আজকাল দুর্গা জংসনে যায় নিত্যই, দুধের যোগান দিতে। ফিরিবার পথে অনিরুদ্ধের কামারশালায় একটি বিড়ি খাইয়া, সরস হাস্য-পরিহাসে খানিকটা সময় কাটাইয়া আসে। অনিরুদ্ধও সকালে বিকালে জংসন যাওয়া-আসার পথে দুর্গার বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই যায়; দুর্গাও একটি করিয়া বিড়ি দেয়; বিড়ি টানিতে টানিতে দাঁড়াইয়াই দুই-চারিটা কথাবার্ত্তা হয়। দা'খানাকে উপলক্ষ করিয়া হৃদ্যতাটুকু অল্পদিনের মধ্যেই বেশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে একদিন লোহা কিনিবার একটা গুরুতর প্রয়োজনে—টাকার অভাবে বিব্রত হইয়া অনিরুদ্ধ চিন্তিতমুখেই কামারশালায় বসিয়াছিল; সেদিন দুর্গা আসিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—এমন ক'রে গুম্ মেরে ব'সে কেন হে?

দুর্গাকে বিড়ি দিয়া নিজেও বিড়ি ধরাইয়া অনিরুদ্ধ কথায় কথায় অভাবের কথাটা খুলিয়া বলিয়াছিল। দুর্গা তৎক্ষণাৎ আঁচলের খুঁট

খুলিয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া তাহাকে দিয়া বলিয়াছিল—চারদিন পরেই কিন্তুক শোধ দিতে হবে ভাই।

অনিরুদ্ধ সে-টাকাটা ঠিক চারদিন পরেই দিয়াছিল দুর্গা সেদিন হাসিয়া বলিয়াছিল—সোনার চাঁদ খাতক আমার!....

অনিরুদ্ধকেও দুর্গার বড় ভাল লাগে। ভারী তেজী লোক, কাহারও সে তোয়াক্কা রাখে না। অথচ কি মিষ্ট স্বভাব! সবচেয়ে ভাল লাগে কামারের চেহারাখানি। লম্বা মানুষটি! দেহখানিও যেন পাথর কাটিয়া গড়া! প্রকাণ্ড লোহার হাতুড়িটা লইয়া সে যখন অবলীলাক্রমে লোহার উপর আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকে—তখন ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে; কিন্তু তবুও ভাল লাগে, একটি আঘাতও বেঠিক্ পড়ে না।

*　　*　　*　　*

অনিরুদ্ধ বাড়ীর মধ্যে ফিরিয়া দেখিল—পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছে, রান্নাবান্নার নাম-গন্ধ নাই! পদ্মকে সে আর কিছু বলিল না, কতকগুলো কাটকুটা উনানের মুখে আনিয়া উনান ধরাইতে বসিল। রান্না করিতে হইবে; তাহার পর আবার ছুটিতে হইবে জংসনে। রাজ্যের কাজ বাকী পড়িয়াছে।

পদ্ম কাহাকে ধমক দিল—যা!

অনিরুদ্ধ ফিরিয়া চাহিল; কিন্তু কেহ কোথাও নাই। কাক কি কুকুর, কি বিড়াল, তাও কোথাও নাই। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি?

পদ্ম উত্তরে প্রশ্ন করিল—কি?

অনিরুদ্ধ একেবারে ক্ষেপিয়া গেল, বলিল—খেপেছিস নাকি তুই? কিছু কোথাও নাই, ধমক দিচ্ছিস কাকে?

পদ্ম এইবার লজ্জিত হইয়া পড়িল; শুধু লজ্জিতই নয়, একটু

অধিক মাত্রায় সচেতন হইয়া সে ধীরে ধীরে উঠিয়া উনানশালে আসিয়া বলিল—সর। আমি পারব। তুমি যাও।

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেল। আর সে পারিতেছে না।

কিন্তু তাহার অনুপস্থিতে যদি পদ্মের রোগ উঠিয়া পড়ে! সে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া দাঁড়াইল। পড়ে পড়ুক, সে আর পারে না! সে বাহির হইয়া গেল।

পদ্ম রান্না চাপাইল। ভাতের সঙ্গে কতকগুলা আলু, একটা ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কতকগুলি মসুরির ডাল ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ বাহিরে গিয়াছে। বাড়ীতে কেহ কোথাও নাই। নির্জ্জন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আজ অহরহ মনে হইতেছে তাহার সেই স্বপ্নের কথাগুলি, সেদিনের ডাক্তারের কথাগুলি। ছিরু পালের বড় ছেলেটা তাহার মাকে কি ভালই না বাসে!

ওই—ওই কি আসিবে ?....

ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া তাহার হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল ছেলেটির শীর্ণ গৌরাঙ্গী মা ওই খিড়কীর দুয়ারের মুখেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে পদ্মের দিকে মিনতি-ভরা চোখে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে একটা সকাতর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বার বার আপন মনেই বলিল—না-না-না, তোমার বুকের ধন কেড়ে নিতে আমি চাই না। আমি চাই না। আমি চাই না।

উনানের মধ্যে কাঠগুলা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, হাঁড়ি-কড়া সম্মুখেই,—এইবার রান্না চড়াইয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু সে তাহার কিছুই করিল না। চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্তরের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ চকিতের মত অধীর অতৃপ্ত কেহ অতি নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বলিয়া উঠিতেছে—মরুক, মরুক!...মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছে পাল-বধূর

সন্তান। সভয় চাঞ্চল্যে শিহরিয়া উঠিয়া নীরবেই পদ্ম বলিতেছিল—না-না-না

পাল-বধূর আটটি সন্তান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মাত্র দুইটি অবশিষ্ট ' ়; আবার নাকি সে সন্তানসম্ভবা। তাহার গেলে সে আবার পায়।...যাক, তাহার আর একটা যাক! ক্ষতি কি!

উনানের আগুন বেশ প্রখরভাবেই জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তবুও সে কাঠগুলাকে অকারণে ভিতরে ঠেলিয়া দিল, অকারণেই স্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—আঃ ছি-ছি-ছি।

তারপরই সে ডাকিল পোষা বিড়ালটাকে—মেনী মেনী, আয় আয়, পুষি আয়!

(ছেলে না হইলে কিসের জন্য মেয়েমানুষের জীবন! শিশু না থাকিলে ঘর-সংসার! শিশু রাজ্যের জঞ্জাল আনিয়া ছড়াইবে,—পাতা, কাগজ, লাঠি, ধুলা, মাটি, ঢেলা, পাথর, কত কি! সে তিরস্কার করিবে, আবার পরিষ্কার করিবে; রূঢ় তিরস্কারে শিশু কাঁদিবে, পদ্ম তখন তাহাকে বুকে লইয়া আদর করিবে। তাহার আবদারে নিজের ধুলার মুঠা মুখের কাছে লইয়া খাওয়ার অভিনয় করিবে—হাম-হাম-হাম! শিশু কাঁদিবে, হাসিবে, বক্ বক্ করিয়া বকিবে, বায়না ধরিবে; সঙ্গে সঙ্গে পদ্মও আবোল্ তাবোল্ বকিয়া ক্লান্ত হইয়া শেষে তাহাকে একটা চড় কষাইয়া দিবে। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কোলে আসিয়া ঘুমাইয়া পরিবে। তাহার গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া, দুই গালে দু'টি চুমা খাইয়া সন্তর্পণে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিবে!...

এই সব কল্পনা করিতে করিতে ঝর্-ঝর্ করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।)

তাহার নিজের নাই, কেহ যদি তাহাকে একটি শিশু পালন করিতেও দেয়! একটি মাতৃহীন শিশু! শিশুসন্তানের জননী কেহ

মরে না! ওই পাল-বধূ মরে না! পণ্ডিতের স্ত্রী মরে না! না হয় তো তাহার নিজের মরণ হয় না কেন? সে মরিলে তো সকল জ্বালা জুড়ায়!

বাহিরে অনিরুদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। ওখানে আর যাচ্ছি না। আমার পৌষ-আগলানো আমার নিজের বাড়ীর দরজায় হবে।

পদ্মের মনের মধ্যে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিল একটা দুরন্ত ক্রোধ। ইচ্ছা হইল—উনানের জ্বলন্ত আগুন লইয়া এই ঘরের চারিদিকে লাগাইয়া দেয়। যাক্, সব ছাই হইয়া যাক্! অনিরুদ্ধ পর্য্যন্ত পুড়িয়া মরুক। পরমুহূর্ত্তেই সে জ্বলন্ত উনানের উপর হাঁড়িটা চাপাইয়া দিল; তাহাতে জল ঢালিয়া, চাল ধুইতে আরম্ভ করিল।

কাল আবার লক্ষ্মীপূজা, পৌষ-সংক্রান্তিতে পৌষ-লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী! তাঁহার আবার লক্ষ্মী! কার জন্য লক্ষ্মী? কিসের লক্ষ্মী?

ষোল

পৌষ-সংক্রান্তির দিন পৌষ-লক্ষ্মী অর্থাৎ পৌষ-পার্ব্বণ। নবান্নের দিন হইতে দীর্ঘ দুই মাস পর পল্লীবাসীর জীবনে আর একটি সার্ব্বজনীন উৎসব। যেখানে উদয়কাল হইতে অস্তকাল পর্য্যন্ত বারো ঘণ্টা সময়ের অর্দ্ধেকটা চলে হল-আকর্ষণকারী কুব্জপৃষ্ঠ বলদের অতি-মন্থর পদক্ষেপের পিছনে পিছনে অথবা ঘরের সমান উঁচু ধান ও খড়-বোঝাই গরুর গাড়ীর চাকা ঠেলিয়া বা ধানের বোঝা মাথায় করিয়া শ্বাস-রোগীর মত দুঃসহ কষ্টে টানিয়া টানিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলিয়া, সেখানে দুই মাস সময় দীর্ঘ বই কি! মধ্যে ইতুলক্ষ্মী গিয়াছে; কিন্তু ইতু-লক্ষ্মীতে নিয়ম আছে—পালন আছে, পার্ব্বণ নাই—সমারোহ নাই।

পৌষ-পার্ব্বণে ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা-পরব। অগ্রহায়ণ-সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী পাতিয়া চিঁড়া, মুড়কী, মুড়ি, মুড়ির নাড়ু, কলাই-ভাজা ইত্যাদিতে পূজা হইয়াছিল। পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধান-কড়ি সাজাইয়া সিংহাসনের দুইপাশে দুইটি কাঠের পেঁচা রাখিয়া লক্ষ্মীপূজা হইবে—এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন লক্ষ্মীর সঙ্গে নানা দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে। রাশিকৃত চাল ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া প্রস্তুত হইয়াছে—পিঠা তৈয়ারী হইবে হরেক রকমের। রস প্রস্তুত হইয়াছে। গুড়ে-নারিকেলে, গুড়ে-তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে, পাতলা ক্ষীর হইয়াছে, চাঁচি বা খোয়া-ক্ষীর হইয়াছে—লোকে আকণ্ঠ পূরিয়া প্রসাদ ভোজন করিবে।

অনিরুদ্ধের এ-সব আয়োজন কিছুই হয় নাই। একে পদ্মের দেহ অসুস্থ, তার ওপর একটি পয়সাও হাতে নাই। গোটা পৌষটাই অনিরুদ্ধের কামারশালা একরকম বন্ধ গিয়াছে বলিলেই হয়। লোহার কাজ এ সময়ে বেশী না হইলেও কিছু হয়; ধান-কাটার কাস্তে পাজানো এবং গরুর গাড়ীর চাকার খুলিয়া-পড়া লোহার বেড় লাগানো কাজ না করাইয়া চাষীদের উপায় নাই। কিন্তু অবসরের অভাবে অনিরুদ্ধ তাহাও করিতে পারে নাই। পাঁচবিঘা বাকুড়ির ধান তাহার গিয়াছে; বাকি জমির ধানের জন্য ভাগ জোতদারের সঙ্গে নিজে মজুরের মত পরিশ্রম করিতেছে, ঘাড়ে করিয়া ধান ঘরে আনিয়া তুলিতেছে। সে-ও বা কতটুকু! সেই অতি-অল্প ধান তোলা এখনও শেষ হয় নাই।

আবার সরকারের সেটেল্‌মেণ্ট আসিয়াছে, নোটিশ হইয়াছে—"আপন আপন জমিতে স্বত্ব-স্বামিত্বের প্রমাণাদি সহ উপস্থিত থাকিতে হইবে। অন্যথায় সেটেল্‌মেণ্ট কার্য্যবিধি অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইতে হইবেক।"...এক টুকুরা জমির জন্য কানুনগো ও আমিন বাবুদের সঙ্গে

সেই ভোর হইতে বেলা তিন পহর কাটিয়া যায়, পাকা ধানের উপর দিয়া শিকল টানিতে টানিতে সেই জমিটুকুতে আসিতে চার পাঁচ দিন সময় লাগে। সে টুকরাটা হইয়া গেলে দুই-তিন কি চার-পাঁচ দিন নিশ্চিন্ত, তাহার পর হয়তো আবার এক টুকরা। শুধু অনিরুদ্ধ নয়, সমস্ত গ্রামের লোকেরই এইভাবে লাঞ্ছনা-দুর্ব্বিপাকের আর শেষ নাই। পৌষ-সংক্রান্তিতে ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর সিংহাসন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে; কিন্তু এবার লক্ষ্মী এখনও মাঠে। গোটা গাঁয়ের মধ্যে একটি গৃহস্থেরও 'দাওন' আসে নাই। ওই আবার একটা হাঙ্গাম রহিয়া গেল। তোলার শেষ দিনে 'দাওন' আসিবে—অনিরুদ্ধের নিজেকেই শেষ ধানগুচ্ছটি কাটিতে হইবে—কাটাধানের গোড়ায় জল দিয়া ধানগুচ্ছটি লইয়া আসিতে হইবে মাথায় করিয়া। অনিরুদ্ধের কৃষাণ নাই, ভাগ-জোতদারকে পায়েস রাঁধিয়া খাওয়াইতে হইবে। অন্যান্য বার এই লক্ষ্মীর সঙ্গেই ও পর্ব্বটি সারা হইয়া যায়—এবার সেট্‌ল্‌মেণ্টের দায়ে বাকী পড়িয়া রহিল।

* * *

ভাতের হাঁড়িটা নামাইয়া পদ্ম ফেন গালিয়া ফেলিল। খুঁজিয়া বাছিয়া একটা ন্যাকড়ার প্রান্তদেশ টানিয়া বাহির করিল একটি ছোট পুটুলি। উহারই মধ্যে আছে খানিকটা মসুর কলাই, গোটা চারেক বড় বড় আলু, এবং এক-টুকরা কুমড়ার ফালি। এগুলা মাখিয়া ফেলিয়া আবার মাছ দেখিতে হইবে; মাছ নহিলে অনিরুদ্ধের ভাত উঠিবে না। এইজন্য খিড়কীর ডোবার জলের কিনারায় কতকগুলা 'আপা' অর্থাৎ গর্ত্ত করা আছে—পাঁকাল মাছগুলা তাহার মধ্যে ঢুকিয়া থাকে; সতর্ক-ও-ক্ষিপ্রভাবে হাত চালাইয়া দিলেই ধরা যায়। পদ্ম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বাহিরের দরজার দিকে চাহিল। এ কাজটুকুও তো সে করিলে

পারিত! কোথায় গেলেন নবাব? সেই একবার বাহির-দরজায় সাড়া শোনা গিয়াছিল—চণ্ডীমণ্ডপ না-ছাঁটিবার সঙ্কল্পের আস্ফালন হইতেছিল, তারপর আর সাড়া নাই। 'চণ্ডীমণ্ডপ ছাঁটিব না'। তবে তো মা কালী ও বাবা-শিবের বেগুন-ক্ষেত জলপ্লাবিত হইয়া গাছগুলা পচিয়া নিদারুণ ক্ষতি হইয়া গেল! ওইরূপ মতি না হইলে এই দুর্গতি হইবে কেন?....

—কম্মকার রইছ নাকি হে? কম্মকার! অ কম্মকার! কম্মকার হে!

কে লোকটা? উত্তর না পাইয়াও এক নাগাড় ডাকিয়াই চলিয়াছে!

—অ কম্মকার! এই তোমার দুগ্‌গা ব'ললে—বাড়ী গেল কম্মকার, আর সাড়া দিচ্ছ না! ওহে ও কম্মকার!

অনিরুদ্ধ দুর্গার বাড়ী গিয়াছিল। রূপ আছে বলিয়া ওই মুচিনীর বাড়ী। ছি-ছি-ছি!....লক্ষ্মী? এই লোকের বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকে? না—এই লোকের বংশ থাকে? পদ্ম যেন পাগল হইয়া উঠিল—সে উনান হইতে জ্বলন্ত কাঠ একখানা টানিয়া বাহির করিল। আগুন ধরাইয়া দিবে—ঘর-সংসারে সে আগুন ধরাইয়া দিবে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাড়ীর ভিতর আসিয়া প্রবেশ করিল ভূপাল চৌকীদার!—বলি, কম্মকার, তুমি কি রকম মানুষ হে? ডেকে ডেকে গলা আমার ফেটে গেল! কই, কম্মকার কই?

বাড়ীর মধ্যে অনিরুদ্ধকে না পাইয়া ভূপাল খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া গেল, অবশেষে বলিল—তুমি বাপু কম্মকারকে ব'ল—আমি এসেছিলাম। আমার হ'য়েছে এক মরণ। ডাকলে লোকে যাবে না, আর গোমস্তা বলবে—শালা—ব'সে ব'সে ভাত খাবার জন্য তোকে মাইনে দিই?

—কে রে? কি ব'লবে কম্মকারকে?....বাহির দরজা হইতেই কথা বলিতে বলিতে অনিরুদ্ধ ঘরে ঢুকিল।

—এই যে কম্মকার! ভূপাল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।—তুমি বাপু একবার চল, গোমস্তা তো আমার মুণ্ডুপাত করছে।

অনিরুদ্ধ খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এই! বাড়ীর ভেতর ঢুকলি ক্যানে তুই?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ভূপাল এবার রুষ্টস্বরে বলিল—হাত ছাড়, কম্মকার।

—বাড়ী ঢুকলি ক্যানে তুই? খাজনার তাগাদা আছে, বাড়ীর বাইরে থেকে ক'রবি। জমিদারের নগদী—বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে!

হাতটা মোচড় দিয়া ছাড়াইয়া লইয়া ভূপাল এবার হুঙ্কার দিয়া উঠিল—এ্যাও!—মুখ সাম্‌লে, কম্মকার, মুখ সাম্‌লে কথা বল। দু'বছর খাজনা বাকী, খাজনা দাও নাই ক্যানে? আলবৎ বাড়ী ঢুকব! ইউনান বোডের ট্যাক্স—তাও আজও দাও নাই।....ভূপালও বাগ্দীর ছেলে—সেও এবার বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইল।

খাজনা, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স! অনিরুদ্ধ অস্থির হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। ও-সব কথা আমলে না আনিয়া সে তাহার নিজের অভিযোগটাই আবার জাহির করিল—আমি যদি বাড়ীতে থাকতাম, তা' হ'লে নয় ঢুকতিস—ঢুকতিস। বাড়ীতে বেটাছেলে নাই—আমার বাড়ী ঢুকবি ক্যানে তুই?

ভূপাল বলিল—চল তুমি, গোমস্তা ডাকছে।

—যা-যা বল গে, কারুর ডাকে আমি যাই না।

—খাজনার কি ব'লছ বল?

—যা, বল গে, খাজনা আমি দোব না।

—বেশ!....ভূপাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধও সাফ জবাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আস্ফালন আরম্ভ করিয়া দিল—আদালত আছে, উকিল আছে—আইন আছে, নালিশ কর্ গিয়ে! বাড়ীর ভেতর ঢুকবে, বাড়ীর ভেতর! ওঃ, আস্পধ্ধা দেখ!

অকস্মাৎ সে কাঁদো-কাঁদো সুরে আবার বলিল—গরীব ব'লে আমাদের যেন মান-ইজ্জৎ নাই। আমরা মানুষ নই!

পদ্ম একটি কথাও বলে নাই, নীরবেই সিদ্ধ সামগ্রীগুলি নুন-তেল দিয়া মাখিতেছিল। এতক্ষণে বলিল—হ্যাঁগা, মাছের কি হবে?

—মাছ? মাছ চাই না। কিছু খাব না, যা। পিণ্ডিতে আমার অরুচি ধ'রেছে!

পদ্ম আর কোন কথা না বলিয়া ভাত বাড়িতে আরম্ভ করিল।

(অনিরুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল—তুই আমার লক্ষ্মী ছাড়ালি!)

—আমি?

—হ্যাঁ, তুই! রোগ হ'য়ে দিন রাত প'ড়ে আছে,....ঘরে সন্ধ্যে নাই, ধূপ নাই। এ ঘরে লক্ষ্মী থাকে? বলি, কাল যে লক্ষ্মীপুজো—তার কি কুটোগাছটা ভেঙে আয়োজন ক'রেছিস্?...অনিরুদ্ধ রাগে ক্ষোভে অধীর হইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

পদ্ম চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অন্তরের ক্ষোভের উন্মত্ততা ইতিমধ্যে অদ্ভুতভাবে প্রশান্ত উদাসীনতায় পরিণত হইয়া আসিয়াছে। অনিরুদ্ধের এই অপমানে ক্ষোভে তাহার তৃপ্তি হইয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু তাহার নিজের ক্ষোভের উন্মত্ততা—যে উন্মত্ততাবশে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল—সে উন্মত্ততা শান্ত হইয়াছে। আঁচল বিছাইয়া সেখানেই সে শুইয়া পড়িল।

পদ্ম নীরবে কাঁদিতেছিল; দর্-দর্ ধারে তাহার চোখ হইতে জল

গড়াইয়া গণ্ড ভিজাইয়া মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতেছিল! (কাঁদিলে তাহার বুকের ভিতরে গভীর যন্ত্রণাদায়ক আবেগটা কমিয়া যায়। কান্নায় সে কিছুক্ষণ পরে তৃপ্তি অনুভব করে, আনন্দ পায়।)

—কই হে? কামার-বউ কই হে?

কে ডাকিতেছে?...পদ্ম নিঃশব্দে চোখের জল আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। মুছিয়া ফেলিয়াও কিন্তু সাড়া দিল না—সাড়া দিতে ইচ্ছা হইল না।

—কামার-বউ! ও মা, এই বিকেলবেলা উনোনের মুখে শুয়ে ক্যানে হে?

পদ্মের সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। এইবার সে চিনিয়াছে ডাকিতেছে দুর্গা। কি আস্পর্দ্ধা মুচিনীর! ডাকিবার ধরণ দেখ না! অত্যন্ত অপ্রসন্ন কণ্ঠেই সে বলিল—ক্যানে? কি দরকার?

হাসিয়া দুর্গা বলিল—একটা কথা আছে ভাই তোমার সঙ্গে।

—আমার সঙ্গে? কি কথা? কিসের কথা, শুনি?

—ব'লব, তা উঠেই ব'স।

—আমার শরীরটা ভাল নাই।

(দুর্গা শঙ্কিত-কণ্ঠে বলিল—অসুখ ক'রেছে? দাওয়ার ওপর উঠব?

তড়িৎস্পৃষ্টের মত পদ্ম উঠিয়া বসিল, বলিল—না।

দুর্গা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—ও মা, কাঁদ্‌ছিলে বুঝি? কি হ'ল? কর্ম্মকারের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে বুঝি?·· সে হি-হি করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।)

—সে খবরে তোমার দরকার কি? কি ব'লছ বল না? খোঁজ দেখ না! যেন আমার কত আপনার জন!

—আপনার জন তো বটে, ভাই! 'লই' কি না—তুমিই বল!

—তুই আমার আপনার জন?···পদ্ম ক্রোধে এবার 'তুই' বলিয়া সম্বোধন করিল।

দুর্গা কিন্তু তাহাতেও রাগ করিল না, হাসিল। হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হে হ্যাঁ! যদি বলি আমি তোমার সতীন! তোমার কর্তা তো আমাকে ভালবাসে হে!

পদ্ম এবার ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। দুরন্ত ক্রোধে রান্নাশালার ঝাঁটা গাছটা কুড়াইয়া লইল।)

দুর্গা হাসিয়া খানিকটা সরিয়া গিয়া বলিল—ছোঁয়া পড়লে অবেলায় চান ক'রতে হবে! আমার কথাটাই আগে শোন ভাই, তারপর না-হয় ঝাঁটাটা ছুঁড়েই মেরো।

পদ্ম অবাক হইয়া গেল।

দুর্গা বলিল—দাঁড়াও ভাই, বার-দরজাটা আগে বন্ধ ক'রে দি। কে কখন এসে পড়বে।

পদ্ম তখনও শান্ত হয় নাই, সে ঝাঁঝালো সুরে বলিল—দরজা দিয়ে কি হবে? গণ্ডায় গণ্ডায় আমার তো নাগর নাই।

দুর্গা আবার হাসিয়া উঠিল, বলিল—আমার তো আছে ভাই। তারা যদি গন্ধে গন্ধে এসে পড়ে!)

—আমার বাড়ী এলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব না!

দুর্গা ততক্ষণে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। ফিরিয়া সে সংস্পর্শ বাঁচাইয়া খানিকটা দূর হইতে বলিল—পরকে না হয় পার। কিন্তু তোমার আপন কত্তাটিকে? সেও যে আমার, তুমি যা' বল'লে—তাই! ....যাক্, শোন ভাই ঠাট্টা নয়, এইগুলো ঘরে তুলে রাখ দেখি।—সে ততক্ষণে কাঁখাল হইতে কাপড় ঢাকা একটা চুপ্‌ড়ি নামাইল। তাহার মধ্য হইতে নামাইয়া দিল—এক ঘটি দুধ, এক ভাঁড় গুড়, গোটা দুয়েক ছাড়ানো নারিকেল, সেরখানেক তিল, একটা পাত্রে আধসেরটাক্ তেল—আরও কতকগুলি মসলাপত্র। বলিল—যাও লক্ষীপুজোর উয্যুগ ক'রে ফেল। আতপ চাল তো আমার নাই, আর আমাদের

চালগুড়োতে তো হবে না! আমি শুনলাম তোমার কর্তার কাছে।

পদ্মের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; ইচ্ছা হইল লাথি মারিয়া জিনিস-গুলাকে ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ঠিক তখনই বাহির দরজায় কে ধাক্কা দিল। হয় তো অনিরুদ্ধ। ভাল, সে-ই আসুক—তারপর সামনেই সে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিবে।

দ্রুতপদে গিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল; কিন্তু সে অনিরুদ্ধ নয়—বুড়ী রাঙাদিদি। পদ্ম শান্তভাবে সম্ভাষণ করিল—কে রাঙাদিদি?)

—হ্যাঁ। তা' হ্যাঁলো নাতবউ!—বলিতে বলিতে বৃদ্ধার দৃষ্টি পড়িল দুর্গার উপর।—ও মা, কে ব'সে লো? কে ও?

—আমি! কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া দুর্গা বলিল—রাঙাদিদি, আমি দুগ্‌গা। বায়েনদের দুগ্‌গা!

—দুগ্‌গা! তোর কি আ-ছাটা 'মিস্তিকে' নাই লা? (এই হেথা, ওই হোথা, একবারে হুই মুলুকে। কঙ্কণা, জংসন, কোথায় বা না যাস! তা' হেথা কি ক'রছিস লা? ওগুলা কি বটে?)

—এই, কামার-বউ টাকা দিয়েছিল জংসন থেকে জিনিস কিনতে; তাই এনে দিলাম, রাঙাদিদি।

—তা' আমাকে ব'লতে নাই? গাঁয়ে ব'সে চার আনার বাজার ক'রলাম আজ, চাল বেচলাম এক টাকার। জংসনে চার আনার বাজারেও এক পয়সা বাঁচত, চালের দরেও দু'টো পয়সা বেশী পেতাম। আমার তো শক্ত-সোমথ সোয়ামী নাই, আবাগী আমি—আমার 'উব্‌গার' ক'রবি ক্যানে বল?

হাসিয়া দুর্গা বলিল—এইবার একদিন দিও দিদি, এনে দোব।

—তা' দিস।(তুই মানুষ তো ভাল, তবে বড় নচ্ছার। তা' তুই যা করবি করগে, আমার কি?)

দুর্গা সশব্দে হাসিয়া উঠিল—তা' বৈ কি, দিদির তো আর বুড়ো নাই। ভয়-ভাবনা কিসের? তা' বাজার তোমার করে দোব দিদি।

বৃদ্ধা বলিল—মরণ! তার আবার হাসি কিসের লা?

—বেশ, আর হাসব না। এখন কি বলছ বল?

মর্! তোকে কে ব'লছে? ব'লছি নাত-বউকে। হ্যাঁ লা নাত-বউ, এবার যে বড় আমার বাড়ীতে চাল কুটতে গেলি না?

রাঙাদিদির বাড়ীতে ঢেঁকি আছে, পদ্ম বরাবরই রাঙাদিদির ঢেঁকিতে পিঠার চাল কুটিয়া আনে। এবার যায় নাই; তাই বৃদ্ধা আসিয়াছে।—বলি হ্যাঁলা! তোকে আমি কখনও কিছু বলেছি? বল্‌ কিছু ব'লেছি কি না?....কখন কি বলে বুড়ি—সে তাহার মনে থাকে না।

ম্লান হাসি হাসিয়া পদ্ম বলিল—তার জন্য নয়; এবার চাল কোটাই হয় নাই রাঙাদিদি।

—চাল কোটাই হয় নাই? বলিস্ কি?

—না।

আ-মরণ! তা' আর কবে চাল কুটবি? রাত পোহালেই তো—

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল। দুর্গা মাঝখান হইতে বলিল—নাত-বউয়ের অসুখ তো জান, রাঙাদিদি। অসুখ শরীরে কি ক'রবে বল?

—তবে? লক্ষ্মী হবে কি ক'রে? তোর সেই 'হাঁদামুখল' মিন্সে কোথা? সেই অনিরুদ্ধ? সে পারে না?

দুর্গাই বলিল—হবে কোন রকম ক'রে। কম্মকার আসুক, দোকান থেকে কিনে আনবে।

—কিনে আনবে। না-না। কলে-কোটা গুঁড়োর কি লক্ষ্মী হয়? ও নাত-বউ, এক কাজ কর্, আমার ঘর থেকে নিয়ে আয় চাড্ডি

গুঁড়ো। তা' দু'সের আড়াই সের দিতে পারব। আচ্ছা আমি না হয় দিয়ে যাব। ওমা! তা ব'লতে হয়। আমি এক্ষুনি দিয়ে যাচ্ছি।

যাইতে যাইতে দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা বলিল—ইছু সেখ পাইকারের করণটা দেখ দেখি, দুগ্‌গা—বুড়ো গাইটার দাম ব'লছে চার টাকা। শেষমেষ বলে, পাঁচ টাকা। তোদের পাড়ায় আর কেউ পাইকার এলে পাঠিয়ে দিস্‌তো বুন্‌।

দুর্গাও ঝুড়িটা লইয়া উঠিল, বলিল—বাটি-ঘটি কাল এসে নিয়ে যাব ভাই। আজ চল্‌লাম।

—এইখানে কাল খাবে।

—বেশ।....দুর্গা হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

অকস্মাৎ কোথা দিয়া কি হইয়া গেল। রাঙাদিদির সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে কেমন করিয়া তাহার অন্তরের ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া গেল। আবার সব ভাল লাগিতেছে। দুর্গার জিনিসগুলা সে প্রত্যাখ্যান করিল না, লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল না। দুর্গার ওই মিথ্যা কথাটা তার বড় ভাল লাগিয়াছে; রাঙাদিদিকে সে বলিল—কামার-বউ তাহাকে জংসন সহর হইতে বাজার করিয়া আনিতে টাকা দিয়াছিল —এ সেই জিনিস!

সে রাঙাদিদির চাল-গুঁড়ার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বাড়ীতে আতপ চাল নাই; চাল গুঁড়াইয়া একবার বাঁটিয়া লইয়া আলপনার গোলা তৈয়ারি করিতে হইবে। আল্‌পনা আঁকিতে হইবে—বাহির দরজা হইতে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত, খামারে, মরাইয়ের নীচে। চণ্ডীমণ্ডপে আবার পৌষ আগ্‌লানোর আল্‌পনা আছে। মনে পড়িল, 'আউরী-বাউরী' চাই। কার্ত্তিক সংক্রান্তির 'মুঠ লক্ষ্মীর' ধানের খড় পাকাইয়া সেই দড়িতে বাঁধিতে হইবে ভাণ্ডারের প্রতিটি আধার। ঘরের বাক্স-পেটরা, তৈজস-পত্র সবেতেই পড়িবে মা লক্ষ্মীর বন্ধন।

*　　*　　*

সেই পুরাকালে ছিল এক রাখাল ছেলে। বনের ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে আপনার গরুগুলিকে লইয়া চরাইয়া ফিরিত। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের বাতাস তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত; মধ্যে মধ্যে দুঃখ-কষ্ট হইলে সে চোখের জল ফেলিত, আর ঊর্দ্ধমুখে দেবতাকে ডাকিত—ভগবান, আর পারি না, এ কষ্ট তুমি দূর কর, আমাকে বাঁচাও।

একদিন্ লক্ষ্মী-নারায়ণ চলিয়াছিলেন আকাশ-পথে। রাখালের কাতর কান্না আসিয়া পৌঁছিল তাঁহাদের কানে। মা লক্ষ্মীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। দূর কর ঠাকুর, রাখালের দুঃখ দূর কর।

নারায়ণ হাসিলেন। বলিলেন—এ দুঃখ দূর করিবার শক্তি তো আমার নাই, লক্ষ্মী। সে শক্তি তোমার।

লক্ষ্মী বলিলেন—তুমি অনুমতি দাও।

নারায়ণের অনুমতি পাইয়া লক্ষ্মী আসিলেন মর্ত্ত্যে। চারিদিক হাসিয়া উঠিল সোনার বর্ণচ্ছটায়—ভরিয়া উঠিল দেবীর দিব্যাঙ্গের অপরূপ সৌরভে! রাখাল অবাক হইয়া গেল। দেবী রাখালের কাছে আসিয়া বলিলেন—দুঃখ তোমার দূর হইবে, তুমি আমার কথামত কাজ কর। এই লও ধানের বীজ; বর্ষার সময় মাঠে এইগুলি ছড়াইয়া দাও, বীজ হইতে গাছ হইবে। সেই গাছের বর্ণ যখন হইবে আমার দেহ-বর্ণের মত, আমার গাত্র-গন্ধের মত গন্ধে যখন ভরিয়া উঠিবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ, তখন সেগুলি কাটিয়া ঘরে তুলিবে।....

রাখাল লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বর্ষায় প্রান্তরের বুকে ছড়াইয়া দিল ধানের বীজ; দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ ভরিয়া গেল সবুজ ধানের গাছে। ক্রমে ক্রমে বর্ষা গেল—সবুজ ধানের ডগায় দেখা দিল শীষ। রাখাল নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল, কিন্তু এখনও সেই ঠাকরুণের মত

বর্ণ হয় নাই, সে গন্ধও উঠিতেছে না। রাখাল অপেক্ষা করিয়া রহিল। হেমন্তের শেষে অগ্রহায়ণে একদিন রাত্রে ঘরে শুইয়াই রাখাল পাইল সেই গন্ধ। সকালে উঠিয়াই সে ছুটিয়া গেল মাঠে। অবাক হইয়া গেল। সোনার বর্ণে গোটা মাঠটা আলো হইয়া উঠিয়াছে, দিব্য গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত! সোনার বর্ণে, দিব্য গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আকাশে নানাবিধ কীট-পতঙ্গ পাখী উড়িতেছে—পশুরা আসিয়া জুটিয়াছে চারিপাশে; সেই ঠাকরুণ যেন তাহান দুঃখে বিগলিত হইয়া মাঠ জুড়িয়া অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ধান কাটিয়া ভারে ভারে ঘরে তুলিল।

দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া আসিয়া সোনা দিয়া কিনিলেন ধান। রাজার ভাণ্ডারের সোনা ফুরাইয়া গেল—কিন্তু রাখালের ধান অফুরন্ত। রাজার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। তখন রাজা আপনার কন্যাকে আনিয়া দান করিলেন রাখালের হাতে। সম্মুখেই পৌষ-সংক্রান্তি। পৌষ-সংক্রান্তিতে রাখাল লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিল। ওই ধানকেই স্থাপিত করিল সিংহাসনে, সিন্দুর-কজ্জলে তাহাকে বিচিত্র শোভায় সাজাইল, সম্মুখে স্থাপন করিল জলপূর্ণ ঘট, ঘটের মাথায় দিল ডাব—আমের পল্লব। রাজকন্যা ঐ ধান ভানিয়া চাল করিলেন, চাল হইতে প্রস্তুত হইল অন্ন, পরামান্ন ও বহুবিধ পিঠা পঞ্চপুষ্পে ধূপ-দীপ-চন্দন গন্ধে দেবীর পূজা করিয়া, রাখাল ও রাজকন্যা দেবীর ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইল।

লক্ষ্মীদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিলেন, আপন পরিচয় [illegible], বর দিলেন তোমার মত এই পৌষ-সংক্রান্তিতে যে আমার পূজার্চ্চনা করিবে—তাহার ঘরে আমি অচলা হইয়া বাস করিব। পৃথিবীতে তাহার কোন অভাব বা কোন দুঃখ থাকিবে না। পরলোকে সে করিবে বৈকুণ্ঠে বাস।...

* * * *

সমস্ত ব্রত-কথাটি মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে আশা-আকাঙ্খায় বুক বাঁধিয়া পরিতুষ্ট মনেই পদ্ম আয়োজন আরম্ভ করিল। ঘর-দুয়ার, খামার হইতে গোয়াল পর্য্যন্ত আলপনা আঁকিয়া বিচিত্রিত করিয়া তুলিল। দুয়ার হইতে আঙিনার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত আলপনায় আঁকিল চরণ-চিহ্ন। ওই চরণ-চিহ্নে পা ফেলিয়া লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখে আঁকিল প্রকাণ্ড এক পদ্ম; অপরূপ তাহার, কারুকার্য্য। মা আসিয়া বিশ্রাম করিবেন। শাঁখ ধুইল, ধূপ বাহির করিল, প্রদীপ মার্জ্জনা করিল, সিন্দুর রাখিল, কাজল পাড়িল। এদিকের আয়োজন শেষ করিয়া, গুড়ে-নারিকেলে, গুড়ে-তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবে, দুধ জ্বাল দিয়া ক্ষীর হইবে। কত কাজ, কত কাজ! কাজের কি অন্ত আছে? আজ যদি তাহার একটা ছোট মেয়ে থাকিত, তবে সে-ই জিনিসপত্রগুলি হাতে-হাতে আগাইয়া দিতে পারিত। সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—আলপনার কাজে তাহার একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে পৌষ-আগলানোর আলপনা দেওয়া হয় নাই।

একমুহূর্ত্ত সে দাঁড়াইয়া ভাবিয়া লইল; অনিরুদ্ধ তখন ব লিতেছিল —চণ্ডীমণ্ডপে তাহার কেহ যাইবে না, তাহার পৌষ-আগলানো পর্ব্ব হইবে তাহার বাড়ীর দুয়ারে।

—না, সে হইবে না।···পদ্ম তাহা করিবে না, করিতে দিবে না। মা-কালী, বাবা বুড়োশিবের চরণতল ওই চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া,—না, সে হইবে না। পদ্ম আলপনা-গোলার বাটী হাতে চণ্ডীমণ্ডপ অভিমুখেই বাহির হইয়া গেল।

পদ্মের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। এ কি সেই চণ্ডীমণ্ডপ? কোন্ যাদুকরের মায়াদণ্ডের স্পর্শে তাহা আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া অপরূপ শোভায় হাসিতেছে! পথ হইতে চণ্ডীমণ্ডপ উঠিবার পাকা

সিঁড়ি; সিঁড়ির দুই পাশে দুইটি হাতীর শুঁড় সিঁড়িগুলিকে বেষ্টন করিয়া যেন ধরিয়া রাখিয়াছে। ষষ্ঠীতলার বকুল গাছটির চারিপাশ পাকা গোল বেদী দিয়া বাঁধানো! চণ্ডীমণ্ডপের মেঝে পাকা হইয়াছে, মসৃণ সিমেণ্টের পালিশ ঝক্‌মক্‌ করিতেছে। মাটির থামগুলিতে নূতন করিয়া মাটির স্তূপ। ওখানে একটা কূয়া কাটান হইতেছে। পদ্মের মনে পড়িয়া গেল—এসব শ্রীহরি ঘোষের কীর্ত্তি! পদ্ম একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আল্‌পনা আঁকিতে বসিল। "পোষ-পোষ, বড় ঘরের মেঝেয় ব'স"—একটা ঘর আঁকিতে হইবে। মরাই আঁকিতে হইবে। "এস পোষ ব'স তুমি, না যেয়ো ছাড়িয়া।" পোষ মাস তো শ্রীহরির, তাহাদের আবার পোষ মাস কিসের!

—কে গা? কে তুমি, একরাশ আল্‌পনা যেন দিয়ো না, বাছা। মুঠো মুঠো খরচ ক'রে একজনা বাঁধিয়ে দিলে—আর তোমরা তো আপনার কল্যেণ ক'রে চাল-গোলা ঢাল্‌ছ। এর পর ধোবে মুছবে কে?

পদ্ম মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শ্রীহরির-মা পথের উপর হইতে চীৎকার করিতেছে। পদ্ম প্রতিবাদ করিতে পারিল না, শ্রীহরির মায়ের এ-কথা বলিবার অধিকার আছে বই কি! সে কোনমতে আল্‌পনা শেষ করিয়া চলিয়া আসিল।

বাড়ী ঢুকিতেই দেখিল, দেবু তাহাদেরই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। ঘোমটা টানিয়া সে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। দেবুর পিছনে বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়াছিল—অনিরুদ্ধ। দেবু হাসিয়া পদ্মকেই বলিল—কাল তা'হলে পণ্ডিতগিন্নীর কাছে লক্ষ্মীর কথা শুনতে যেয়ো মিতেনী! সে ব'লে দিয়েছে।

পদ্ম অবগুণ্ঠিত-মস্তকে সায় দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল, সে যাইবে।

দেবু চলিয়া গেল।

অনিরুদ্ধ বলিল—পণ্ডিত এসেছিল; কার কাছে শুনেছে, লক্ষ্মীর উদ্যুগ হয় নাই আমার; তাই দুটো টাকা দিয়ে গেল। এমন মানুষ আর হয় না !....কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল—কিন্তু সংসারে বাড়-বাড়ন্ত তো ওর হবে না, হবে ছিরের।

পদ্ম চুপ করিয়া রহিল। সে-ও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

অনিরুদ্ধ আবার প্রশ্ন করিল—আর কিছু আনতে হয় তো বল্ ?

—না।

—তবে নে, কাজগুলো সেরে নে। আগে একবার তামুক সেজে দে দেখি।

অনিরুদ্ধকে তামাক সাজিয়া দিয়া সে উনানে কড়া চড়াইয়া আরম্ভ করিল গুড়-নারিকেলের পাক। তাহার অন্তর আবার দুঃখের—আক্ষেপের আবেগে ভরিয়া উঠিয়াছে। দেবু পণ্ডিতের কথা ছাড়িয়াই দিতে হইবে—পণ্ডিত সত্যই দেবতার মত মানুষ। কিন্তু ওই দুর্গা, তাহারও দয়াধর্ম্ম আছে, ভালবাসা আছে; রাঙাদিদির মত কৃপণ, সেও পুণ্যকর্ম্ম করে। শ্রীহরি ঘোষের কীর্ত্তি—তাহার মহত্ব দেখিয়া সে তো অবাক হইয়া গিয়াছে।···কিন্তু তাহাদের জীবনে কি হইল !

দুঃখ তাহার নিজের জন্য, কিন্তু আজ সে হিংসা কাহাকেও করিল না। বরং সকলকেই সে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। আর বার বার কামনা করিল, মাগো দুঃখ আমার দূর কর। সন্তানে-সম্পদে আমার ঘর ভরিয়া দাও,—আমি ষোড়শোপচারে তোমার পূজা দিব, আঙুল কাটিয়া প্রদীপের সলিতা করিব, চুল কটিয়া চামর বাঁধিয়া সে চামরে তোমায় বাতাস করিব, বুক চিরিয়া রক্ত দিয়া সেই রক্তে তোমার পায়ে আলতা পরাইব। তোমার পূজায় পঞ্চ-শব্দের বাজনা করিব, পট্টবস্ত্রের চাঁদোয়া টানাইব। রূপার সিংহাসনে সোনার ছাতার তলায় তোমাকে

বসাইব; আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপড়শী, দীন-দুঃখী, পশু-পক্ষীকে বিতরণ করিব তোমার প্রসাদ—এক-অন্ন পঞ্চাশ-ব্যঞ্জন!"

অনিরুদ্ধ বাড়ীর বাহির হইতেই ব্যস্ত ব্যগ্র কণ্ঠে ডাকিল—পদ্ম! ও পদ্ম!....পদ্ম চমকিয়া উঠিল। কি হইল আবার?

* * *

অনিরুদ্ধ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বলিল—কড়াইটা নামিয়ে রেখে আমার সঙ্গে আয় দেখি!

—কেন?

—পণ্ডিতকে ধ'রে নিয়ে গেল; পণ্ডিতের বাড়ী যাব।

—ধ'রে নিয়ে গেল? কে?

—সেটেল্‌মেণ্টের হাকিম পরোয়ানা বার ক'রেছিল; থানা থেকে লোক এসে ধ'রে নিয়ে গেল।

সেটেল্‌মেণ্টে! সেটেল্‌মেণ্ট! উঃ—কোথা হইতে ইহারা আসিয়া গ্রামখানার ঝুঁটি ধরিয়া ঝাঁকি দিয়া সর্ব্ব অঙ্গ-স্নায়ু-তন্ত্রী-মন অস্থির অবশ করিয়া দিল। নিত্য নূতন নোটিশ্, নূতন হুকুম! তকমা-আঁটা পিওনগুলার যাওয়া-আসার বিরাম নাই। পথে-ঘাটে সাইকেলের পর সাইকেল চলিয়াছে! কিন্তু হায় হায়, একি কাণ্ড! দেবু পণ্ডিতের মত লোককে তাহারা ধরিয়া লইয়া গেল!

সতেরো

দেবু ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ একটি নয়। সরকারী জরিপের কাজে বাধা দেওয়া ও সার্ভে ডিপার্টমেণ্টের কর্ম্মচারী আমীনকে প্রহার করার অপরাধে সে অভিযুক্ত হইয়াছে। স্থানীয় সেটেল্‌মেণ্ট-অফিসারের নির্দ্দেশ মত স্থানীয় থানার এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সাব-ইন্সপেক্টার একজন কনষ্টবল লইয়া আসিয়াছে; গ্রাম্য চৌকীদার ভূপালকেও ডাকা

হইয়াছে। দেবুকে হাতে হাতকড়ি দিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। আজ রাত্রিতে থাকিবে হাজতে, কাল সকালে সেটেলমেণ্ট-অফিসারের নিকট হাজির করা হইবে। তিনি ইচ্ছা করিলে জামীন দিবেন কিংবা বিচারাধীন আসামী হিসাবে তাহাকে সদর জেলে পাঠাইবেন; আবার ইচ্ছা করিলে সঙ্গে সঙ্গেই বিচারের দিন ধার্য্য করিয়া নিজে বিচার করিবেন। ছোট দারোগা আসিয়া বসিয়াছে ওই চণ্ডীমণ্ডপে। দেবুকে সেইখানেই ডাকা হইয়াছে।

দেবু চুপ করিয়া দাওয়ার উপর মাথা হেঁট করিয়া বসিয়াছিল। মাথার ভিতরটা কেমন যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; কিসে কি হইয়া গেল তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত নাই। শুধুই সে ভাবিতে পারিল যে, যাহা সে করিয়াছে—ভালই করিয়াছে; এখন যাহা হইবার হইয়া যাক্!

গ্রামের লোক প্রায় সকলেই আসিয়াছিল। শ্রীহরি ও দাসজী গোমস্তা, ছোট দারোগা সাহেবের পাশেই বসিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে মৃদুস্বরে তিনজনে কথাও হইতেছে। হরিশ আসিয়াছে, ভবেশ আসিয়াছে, হরেন ঘোষাল, মুকুন্দ ঘোষ, কীর্ত্তিবাস মণ্ডল, নটবর পাল, ও গ্রামের দোকানী বৃন্দাবন, রামনারায়ণ ঘোষ, এমন কি এই শীতের সন্ধ্যায় বৃদ্ধ দারকা চৌধুরীও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জগন ডাক্তার দেবুর পাশেই বসিয়া আছে। মুখর জগনও আজ স্তব্ধ, বিষণ্ণ, এমন আকস্মিক অভাবনীয় পরিণতিতে সে-ও হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। একপাশে গ্রামের হরিজনেরা দাঁড়াইয়া আছে। সতীশ, পাতু সকলেই আসিয়াছে। দুর্গা বসিয়া আছে ষষ্ঠীতলার একপাশে—একা, নীরবে, মাটির পুতুলের মত।

চীৎকার করিতেছে কেবল বুড়ী রাঙাদিদি। চণ্ডীমণ্ডপের ও-পাশে গ্রামের প্রবীণারা পর্য্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের সম্মুখে

দাঁড়াইয়া রাঙাদিদি বলিতেছিল—এ একবারে হাতে ক'রে মাথা কাটা! দারোগা! দারোগা হ'য়েছে তো সাপের পাঁচ পা দেখেছে। বলি— হাঁ গো দারোগা, চুরি না জোচ্চুরি না ডাকাতি, কি ক'রেছে বাছা যে, এই তিন সন্ধেবেলা—রাত পোয়ালে লক্ষ্মী—তুমি বাছার হাতে দড়ি দিতে এলে?

হরিশ বলিল—ওগো রাঙাপিসী, তুমি থাম।

—ক্যানে? থাম্‌ব ক্যানে? দেখ্‌ব একবার কত বড় ওই দারোগা মিন্‌সে!

এবার ধমক দিয়া শ্রীহরি বলিল—রাঙাদিদি, তুমি থাম। যা' হয় আমরা ক'রছি, তুমি একটু চুপ কর। তোমরা মেয়ে লোক—

—মেয়ে লোক? আমার সাড়ে-তিনকুড়ি বয়স হ'ল—আমি আবার মেয়ে লোক কি রে? একশোবার ব'লব, হাজারবার ব'লব: আমার কি করবে কি? বাঁধবি তো বাঁধ ক্যানে, দেখি! পণ্ডিতের মতন লোককে দড়ি দিয়ে বাঁধছিস—আমাকেও বাঁধ। লে বাঁধ! আহা, পণ্ডিতের মতন মানুষ, দেবুর মতন ছেলে—!·· বুড়ী অকস্মাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

দেবু এবার নিজে উঠিয়া আসিয়া বলিল—একটু চুপ কর, রাঙাদিদি, আমি তোমার কাছে হাত জোড় ক'রছি।

বৃদ্ধা সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—আমি তোকে আশীর্ব্বাদ ক'রছি ভাই, সায়েব তোকে দেখবা মাত্তর ছেড়ে দেবে, চেয়ারে বসিয়ে বলবে—পণ্ডিত লোক, তোমাকে কি জেহেল দিতে পারি বাপ্?

দেবু হাসিল।

ওদিকে, ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া কৌশলে মুক্তিলাভ করাইবার কাথাবার্ত্তা হইতেছিল। শ্রীহরি ঘোষ তাহার অগ্রণী; সঙ্গে জমিদারের

গোমস্তা দাসজী আছে। ছোট দারোগা শ্রীহরি ঘোষের বন্ধু লোক, শ্রীহরি তাহাকেই ধরিয়াছে। (প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে দেবু শ্রীহরির বিরোধীপক্ষ; অন্তরে অন্তরে দেবু তাহাকে ঘৃণা করে—তাহা শ্রীহরি জানে। কিন্তু গ্রামের প্রধান ব্যক্তি হিসাবে শ্রীহরি আজ দেবুর পক্ষ অবলম্বন না করিয়া পারে না। সে থাকিতে তাহার গ্রামবাসী—বিশেষ করিয়া তাহার জ্ঞাতি একজনকে হাতে দড়ি দিয়া লইয়া গেলে, লোকে কি বলিবে? সে ছোট দারোগাকে খুসী করিয়া একটা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছে।)

ছোট দারোগা বলিল—পেশকারের কাছে যাও, ধ'রে-পেড়ে হ'য়ে যাবে একরকম ক'রে। যে আমিন-কানুনগোর সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে—তাদেরই খুসী কর, বিনয় ক'রে মাফ্ চেয়ে নিক দেবু ঘোষ, ব্যস্—মিটে যাবে। এতো আকৃছার হ'চ্ছে!

শ্রীহরি বলিল—খুড়োর যে আমার বেজায় মাথা গরম গো। আমি প্রথমদিন শুনেই ব'লে পাঠিয়েছিলাম।....খুড়ো, একবার কানুনগোবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে ব্যাপারটা মিটিয়ে এস। রাজকর্ম্মচারী—তুই-তুকারি ক'রলে তো হ'ল কি?

ভবেশ অমনি বলিয়া উঠিল—এ্যাই, গায়ে তো আর ফোস্কা পড়ে নাই।

শ্রীহরি বলিল—যখন ঘটনা ঘটল, তখুনি তখুনি জানতে পারলে তো সে ঢেউ তখুনি মেরে দিতাম—ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতাম। আমি যে অনেক পরে শুনলাম।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটিয়া গিয়াছিল। এও সেই তুই-তুকারি লইয়া ঘটনা।

দেবু আপনার দাওয়ায় বসিয়া ছিল—তখন বেলা প্রায় বারোটা। সাইকেলে চড়িয়া সম্মুখের পথ দিয়া যাইতেছেল একজন কানুনগো।

বোধ হয় বহুদূর হইতে আসিতেছিল—শীতের দিনে এক-গা ঘামিয়া ধূলায় ও ঘামে আচ্ছন্ন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল ভদ্রলোক; দেবুকে দেখিয়া সাইকেল হইতে নামিয়াই সম্ভাষণ করিল—এই! ওরে! এই! শোন্।

এই সম্ভাষণ শুনিলেই দেবু ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠে; তাহার তিক্ত কটু অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তবুও লোকটির মাথায় টুপি, সাদা-সার্ট, খাকী হাফপ্যাণ্ট ও সাইকেল দেখিয়া সরকারী কর্ম্মচারী অনুমান করিয়া সে চুপ করিয়াই রহিল।

—এই ইডিয়ট্! শুনতে পাচ্ছিস্?

এবার দেবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া লোকটির দিকে চাহিল—ইচ্ছা ছিল কোন উত্তর না দিয়াই সে উঠিয়া গিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিবে, উত্তর দিবে না, ওই লোকটার কোন কথাই শুনিবে না। কিন্তু উঠিতে-উঠিতেও একবার সে লোকটির দিকে না চাহিয়া পারিল না।

চোখাচোখি হইতেই কানুনগো বলিল—যা দেখি, একগ্লাস জল আন্ দেখি। বেশ ঠাণ্ডা জল। পরিষ্কার গ্লাসে বুঝলি?

দেবু বিপদে পড়িয়া গেল। তৃষ্ণার জল দিবার এই অভদ্র আবেদন,—সে 'না' বলিতে পারিল না। তবুও সে মুখে কোন কথা বলিল না, ঘরের ভিতর হইতে একটা মোড়া আনিয়া দাওয়ায় রাখিল; পিচবোর্ডে তৈয়ারী একখানা পাখা আনিয়া দিল। ঐগুলির মারফতেই নীরব আমন্ত্রণ জানাইয়া, সে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই একহাতে ঝক্‌ঝকে মাজা একখানি থালায় একটি বড় বাদমা ও একগ্লাস জল এবং অন্য হাতে একটি বড় ঘটির এক ঘটি জল ও পরিষ্কার একখানি গামছা আনিয়া হাজির করিল।

লোকটি হাত-মুখ ধুইল; দেবু গামছা আগাইয়া দিলে বাঁ হাত দিয়া কানুনগো গামছাখানা সরাইয়া দিল। হাত-মুখ মুছিয়া ফেলিল

সে আপনার রুমালে; তারপর কদমাটা খানিকটা ভাঙিয়া মুখে দিয়া বোধ হয় চাখিয়া দেখিল। কদমাটা টাটকা কদমা, বেশ ভাল লাগিবারই কথা! লাগিলও বোধ হয় ভাল; কারণ গোটা কদমাটাই নিঃশেষ করিয়া জল খাইয়া কানুন্‌গো পরিতৃপ্তির একটি নিশ্বাস ফেলিল—আঃ!

দেবু ইতিমধ্যে ভিতরে গিয়াছিল। পান বা মসলা আনিতে তাহার ভুল হইয়া গিয়াছিল। বিলুকে বলিল—সুপুরি লবঙ্গ আর দু'টো পান দাও দেখি! শীগ্‌গির।

পান সাজাই ছিল। একটুকরা পরিষ্কার কলাপাতার উপর সুপারি, লবঙ্গ ও দুইটি পান সাজাইয়া সে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

ঠিক এই সময়েই বাহির হইতে ডাক আসিল—ওরে! এই ছোক্‌রা!

দেবু আর সহ্য করিতে পারিল না। পানের পাতাটা সেইখানেই ফেলিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া সে বলিল—কি'রে, কি বলছিস্?

এমন অতর্কিত রূঢ় প্রত্যুত্তরের জন্য কানুনগো প্রস্তুত ছিল না; বিস্ময়ে ক্রোধে প্রথমে সে কয়েক মুহূর্ত্ত হতবাক হইয়া রহিল, তারপর বলিল—হোয়াট্! আমায় তুই-তুকারি করিস্? জানিস—

নির্ভয়ে দেবু উত্তর দিল—সে তো তুই-ই আগে করেছিস্।

—কি নাম তোর শুনি? তারপর দেখছি তোকে!

—দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিল, তারপর নির্ভয়ে বলিল—আমার নাম শ্রীদেবনাথ ঘোষ।

কানুন্‌গো বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গিয়াছিল।...

ওদিকে জরিপ স্থগিত রাখিবার জন্য শ্রীহরিদের দরবারে বিশেষ ফল হয় নাই; ধান কাটিবার জন্য মাত্র আর সাতদিন সময় মঞ্জুর হইয়াছিল। কিন্তু পৌষের চৌদ্দদিনের মধ্যে বিস্তীর্ণ মাঠের ধান কাটা ও তোলা

অসম্ভব ব্যাপার। অসম্ভব কোনমতেই সম্ভবই হয় নাই। হইয়াছে কেবল শ্রীহরির এবং আর জন দুই-তিনের—হরিশ, দোকানী বৃন্দাবন দত্ত এবং কৃপণ হেলারাম চাটুয্যের। তাহাদের পয়সা আছে, বহু নগদ মজুর নিযুক্ত করিয়া তাহারা কাজ শেষ করিয়াছে। বাকী লোকের পাকাধানের উপর দিয়াই জরিপ চলিতে আরম্ভ করিল। সরকার হইতে অবশ্য যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়া ধান বাঁচাইয়া আইলের উপর দিয়া কাজ করিতে নির্দেশ রহিল।

দেবু প্রথম দিন মাঠে গিয়া দেখিল—সার্ভে-টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে সেই কানুন্‌গো ভদ্রলোক। কানুন্‌গোও দেবুকে দেখিল। দু'জনের চিত্তই তিক্ত হইয়া উঠিল। কানুন্‌গো লোকটি ডিস্‌পেপ্‌টিক, অত্যন্ত রুক্ষ মেজাজের লোক, লোকজনের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করা তাহার স্বভাব। দেবু সাবধানে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কয়েকটা ক্ষুদ্র ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া কানুন্‌গো তাহাকে ক্যাম্পে হাজির হইতে নোটিশ দিল।

তিক্তচিত্তে দেবু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে স্থির করিল—যাহা হয় হউক, সে কিছুতেই ওই কানুন্‌গোর সম্মুখে হাজির হইয়া হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইবে না।

কানুন্‌গো সুযোগ পাইয়া এই অনুপস্থিতির কথা সেট্‌ল্‌মেণ্ট-ডেপুটিকে রিপোর্ট করিল। ডেপুটি সাহেব নোটিশগুলি দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। এই তুচ্ছ কারণে নোটিশ করা হইয়াছে? তাহার উপর তিনি এই কানুন্‌গোটির স্বভাবও জানিতেন। তবুও আইনানুযায়ী দেবুকে নোটিশ করিলেন। দেবু এ নোটিশও অমান্য করিল। তারপরই ওয়ারেণ্ট হওয়ার নিয়ম। এদিকে ঠিক এই সময়েই এক চরম ব্যাপার ঘটিয়া গেল।

দেবুরই একটা জমি পরিমাপের সময় কানুনগোর সঙ্গে তাহার বচসা আরম্ভ হইল। দেবু জমির রসিদ আনে নাই। বচসার উপলক্ষ তাই। কথায় উত্তর দিতে দিতেই দেবুর নজর পড়িল,—তাহার জমির ঠিক মাঝখানে পাকা ধানের উপর জরিপের শিকল টানা হইতেছে। সে ভাবিল—এটাও কানুনগোর ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। কিন্তু সত্য বলিতে এটা কানুনগোর ইচ্ছাকৃত নয়, দেবুর জমিটারই আকার এমন অসমান যে, মাঝখানে প্রস্থের একটা মাপ না লইয়া উপায় ছিল না। রাগের মাথায় ভুল বুঝিয়া দেবু চরম কাণ্ড করিয়া বসিল। জরিপের চেন টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিল। কানুনগো সঙ্গে সঙ্গে টেবিল শিকল লইয়া মাঠ হইতে উঠিয়া একেবারে ডেপুটির ক্যাম্পে হাজির হইয়া রিপোর্ট করিল।

ডিপুটিবাবু সত্যকারের ভদ্রলোক, তিনি বাংলার চাষীর নিরীহ প্রকৃতির কথা জানেন, তিনিও এই দেশেরই মানুষ; তিনি অবাক হইয়া গেলেন। কিন্তু কানুনগোর বন্ধু পেশকারটি ধুরন্ধর লোক, সে তাঁহাকে পরিষ্কার বুঝাইয়া দিল—লোকটা ওই জে-এল ব্যানার্জ্জীর শিষ্য।

ডেপুটি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।....

তারপরই এই পরিণত।—একেবারে ওয়ারেণ্ট অব য়্যারেস্ট।

শ্রীহরি সত্যই বলিয়াছে—সে কয়েকবারই অনুরোধ করিয়াছে—খুড়ো, চল তুমি, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, কানুনগোকে আমি নরম ক'রে এনেছি; তুমি একবারটি গেলেই সব মিটে যাবে।

দেবু বলিয়াছে—না।

জগন বলিয়াছে—পণ্ডিত, তুমিও একটা দরখাস্ত কর, সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে দাও সি-ওকে; ডি-এল-আরকেও একটা দরখাস্ত কর।

দেবু বলিয়াছে—না, থাক।

বিলু শঙ্কিত, উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করিয়াছে—হ্যাঁ গো, কি হবে?

দেবু হাসিয়া বলিয়াছে—যা হয় হবে।

যাহা হইবার হইয়া গেল।

*   *   *

শ্রীহরি দেবুর কাছে আসিয়া বলিল—ছোট দারোগাকে রাজী ক'রেছি, খুড়ো। প্রথমে কানুনগোর ক্যাম্পে যাব, সেখানে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিয়ে, কানুনগোর চিঠি নিয়ে যাব সার্কেল ডেপুটির কাছে। কেস্ খারিজ হ'য়ে যাবে, আমরা বাড়ী চ'লে আসব।

দেবু বলিল—না।

—না কি গো?

—না। সে আমি যাব না, ছিরু!

—ফল কি হবে, ভাবছ তা'।

—যা' হয় হবে।....দেবু এবারও হাসিল।

শ্রীহরি গভীর দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াও বিরক্তি সম্বরণ করিতে পারিল না, বলিল—কাজটা কিন্তু ভাল ক'রছ না, খুড়ো।

দাসজী বলিল—তা' হলে আমরা আর কি ক'রব বল?

মজলিস-সুদ্ধ লোকই সমস্বরে বলিল—আমরা আর কি ক'রব বল?

কেবল মজলিসের সঙ্গে সায় দিল না তিনজন—জগন ডাক্তার, অনিরুদ্ধ, আর হরেন ঘোষাল। হরেন ঘোষালের অভ্যাস সকলের আগে কথা বলা, কিন্তু সে আজ কিছু না বলিয়াই দ্রুতপদে উঠিয়া চলিয়া গেল।

জগন বলিল—ভেবো না দেবু ভাই! কাল যদি কেস্ না ক'রে হাজতী আসামী ক'রে জেলে পাঠায়, তবে সদরে গিয়ে মোক্তার এনে

মামলা লড়্‌ব। আর যদি কালই বিচার ক'রে জেল দেয়, তবে সদরে আপীল ক'রব। জামিন সঙ্গে সঙ্গে হবে।

দেবু বলিল—শতখানেক টাকা আমার পোষ্টাপিসে আছে, বিলুর কাছে ফরম সই ক'রে দিয়েছি। দরকার মত টাকা বার ক'রে নিয়ো। মামলা ক'রে কিছু হবে না জানি, কিন্তু জেরা ক'রে আমি সব একবার ফাঁস ক'রে দিতে চাই।

অনিরুদ্ধ অত্যন্ত কাতরস্বরে বলিল—দেবু ভাই, তার চেয়ে মামলা মিটিয়ে ফেল।

হাসিয়া দেবু বলিল—তুমি একটু সাবধানে থেকো, অনি ভাই। ডাক্তার, ওকে তুমি একটু দেখো।

ছোট দারোগা বলিল—সন্ধ্যে হ'য়ে গেল। কি ঠিক হ'ল আপনাদের?

দেবু উঠিয়া দাঁড়াইল—চলুন, আমি তৈরী।

ছোট দারোগা ডাকিল—ভূপাল! রামকিষণ!

—একটুকুন দাঁড়াবেন, দারোগাবাবু!···কোথা হইতে আসিয়া দাঁড়াইল দুর্গা। দেবুকে বলিল—আর একবার বিলুদিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাও, পণ্ডিত।

দারোগা বলিল—যান, দেখা ক'রে আসুন।····

মুখরা দুর্গা আজ নীরব হইয়া দেবুর আগে-আগে পথ চলিতেছিল।

দেবু বলিল—দুর্গা, তুই কিন্তু ওদের একটু দেখিস, একটু খোঁজখবর নিস্।

অগ্রগামিনী শুধু নীরবে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

বিলু কাঁদিতেছিল। দেবু চোখ মুছাইয়া দিল। তারপর শুধু কয়টা কাজের কথাই বলিল—পোষ্টাপিসের টাকাগুলো তুলে এনে

নিজের কাছে রেখো। ডাক্তার যা' চাইবে দিয়ো মামলার জন্য। সাবধান থেকো। ধান-পান হিসেব ক'রে নিয়ো। নিজেই তুমি হিসেব ক'রে নিয়ো। তুমি তো হিসেব জানো। মন খারাপ ক'র না। খোকার ভার তোমার ওপর রইল—ঘর-দোর-সব। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি চঞ্চল হ'লে তো চ'লবে না; তোমায় থাকতে হবে অচলা হ'য়ে।

বিলু একটি কথাও বলিতে পারিল না।

দেবু হাসিয়া সব শেষে তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া প্রগাঢ় আবেগে একটি চুম্বন দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে ছিল পদ্ম ও দুর্গা। দেবু বলিল—মিতেনী, তুমি রইলে, দুর্গা রইল, বিলুকে তোমরা একটু দেখো।....সে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া বলিল—চলুন।

—ওয়েট্!...চণ্ডীমণ্ডপে নাটকীয় ভাবে প্রবেশ করিল—হরেন ঘোষাল। তাহার হাতে একটি অতি সুন্দর গাঁদা ফুলের মালা। মালা গাছটা সে দেবুর গলায় পরাইয়া দিয়া উত্তেজিত আবেশে চীৎকার করিয়া উঠিল—জয়, দেবু ঘোষের জয়!

মুহূর্ত্তে ব্যাপারটার চেহারা পাল্টাইয়া গেল।

দারোগা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ফুলের মালা ও জয়ধ্বনিতে দেবুর গা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একটা অদ্ভুত শিহরণ বহিয়া গেল। বুকের মধ্যে যে ক্ষীণতম দুর্ব্বলতার আবেগটুকু স্পন্দিত হইতেছিল—সেটুকুও আর রহিল না; তাহার পরিবর্ত্তে ভাটার নদীর বুকে জোয়ারের মত একটা বিপরীতমুখী উচ্ছ্বসিত আবেগ আসিয়া তাহাকে স্ফীত, প্রশস্ত করিয়া তুলিল। দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে সে অগ্রসর হইল।

* * *

লক্ষ্মী-পূজার আয়োজন করিতে বিলুর হাত উঠিতেছিল না। এক-অন্ন-পঞ্চাশ-ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর পূজা—এই বেদনা বুকে লইয়া কি করিয়া কি করিবে সে? কাহার জন্য লক্ষ্মী পাতিবে? পুরুষকে আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মীর বাস। দেবুই যখন আজ এই আয়োজনের মধ্যস্থলে উপস্থিত নাই, তখন—! বারবার তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছিল।

কিন্তু রাঙাদিদি আসিয়া বলিল—ভাবিস না ভাই, পণ্ডিত ভাই আজই ফিরে আসবে। আর আমার পানে তাকিয়ে দেখ, তিনকুলে কেউ নাই, তবু তো পূজো ক'রছি। তোর কোলে সোনার চাঁদ, দেবু আমার ফিরে আসছে—তোর পূজো না ক'রলে চলে? দে, আমি বরং তোর লক্ষ্মী পেতে দিয়ে যাই। ওই চারিদিকে শাঁখ বাজছে—লক্ষ্মী পাতা হ'য়ে গেল সব।

রাঙাদিদি কত বাহার করিয়া নিপুণ হাতে সাজাইয়া লক্ষ্মী পাতিয়া দিয়াছে। লাল রেশমী কাপড়ে এমন করিয়া ধান ও কড়িগুলি ঢাকিয়া দিয়াছে যে, মনে হয় যেন ছোট্ট একটি বধূ বসিয়া আছে সিংহাসনের উপর।

পদ্ম দুই-তিনবার আসিয়াছিল। দুর্গা তো বসিয়াই আছে। শ্রীহরির মা-বউও আসিয়াছিল।

মা মৌখিক তত্ত্ব করিয়া গিয়াছে; বউটি আনিয়াছিল একছড়া মর্তমান কলা, একটা থোড়, একটা মোচা—শ্রীহরির নূতন কাটান পুকুরের পাড়ের ফসল। আর কতকগুলি মটরশুঁটি, একটা কপি,—বাড়ীতে লক্ষ্মী-পূজা উপলক্ষে শ্রীহরি সহর হইতে আনাইয়াছে। বউটি বলিয়া গিয়াছে—তুমি ভেবো না, শাশুড়ী; তোমার ভাশুর-পো

সকালেই গিয়েছে হাকিমের সঙ্গে দেখা ক'রতে। খুড়া-শ্বশুরকে সঙ্গে নিয়ে সে আজই ফিরে আসবে।

প্রায় প্রতি ঘরের মেয়েরা আসিয়া বিলুদের তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে। জগন ডাক্তারের স্ত্রী পাঁচবার আসিয়াছে। হরিজনেরা জনে জনে আসিয়াছে। খেজুর গুড়ের মহলদারটি খেজুর গুড় দিয়া গিয়াছে। সতীশ হইতে প্রত্যেকেই ছোট-বড় ঘটিতে কাঁচা-দুধ আনিয়া দিয়া গিয়াছে। আর প্রয়োজন নাই বলিলে শুনে নাই, বুঝে নাই; বিষণ্ণ মুখে বলিয়াছে—আমরা কি অপরাধ করলাম, মা?

দুর্গা বলিল—বিলুদিদি, ক্ষীর ক'রে রাখ।

বিলু বলিল—কি হবে বল দেখি? পচে যাবে তো।

—পচ্‌বে কেন? দেখ না, জামাই ঠিক ঘুরে আস্‌ছে।

কয় বাড়ীর গুটিকয়েক কুমারী মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল।—ঘড়া দাও, বউ-দিদি, জল এনে দি।

বিলুর ইহারা সম্পর্কে ননদ। বিলু মিষ্ট-হাসি হাসিয়া বলিল—জল আমি এনেছি ভাই।

বিলু বলিল—ব'স, জল খাও।

—না! আমরা কাজ ক'রতে এসেছি।

ইহাদের এই অকপট আত্মীয়তা বিলুর বড় ভাল লাগিল। এত আপনার জন তাহার আছে! মানুষ এত ভাল!

চণ্ডীমণ্ডপে তিলকুট ভোগের ঢাক বাজিল, তবে মেয়ে কয়টি গেল। চণ্ডীমণ্ডপে আজ তিলকুট সন্দেশে বাবা-শিব মা-কালীর ভোগ হইবে। ওখানে ভোগ হইলে, তবে বাড়ীতে লক্ষ্মীর ভোগ হইবে। বাউড়ী-ডোম মুচীদের ছেলেরা চণ্ডীমণ্ডপে ভিড় জমাইয়া বসিয়া আছে এক টুকরা তিলকুটের জন্য। ইহার পর আবার বাড়ী বাড়ী পিঠা সাধিতে যাইবে।

পুরুষেরা অনেকেই গিয়াছিল দেবুর জন্য সেটেল্‌মেণ্ট ক্যাম্পে। ফিরিল প্রায় একটার সময়। সকলেই গম্ভীর, চিন্তান্বিত। বিচার এখনও হয় নাই। তবে সবই বুঝা গিয়াছে! কিন্তু কি করিবে তাহারা? সকলের চেয়ে গম্ভীর শ্রীহরি। আমিন শ্রীহরিকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন—দেবুর পক্ষ লইয়া যে সাক্ষী দিবে, তাহার সহিত বুঝাপড়া হইবে পরে।

মুরুব্বিরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়াছে—তাহার চেয়ে কোন পক্ষেই সাক্ষ্য তাহারা দিবে না।

বাড়ী আসে নাই কেবল জনকয়েক,—জগন ডাক্তার, অনিরুদ্ধ, হরেন ঘোষাল, দ্বারকা চৌধুরী, তারা নাপিত। তাহারা বাড়ী ফিরিল প্রায় সন্ধ্যার সময়—বিষণ্নমুখে, মন্থর-পদে। দুর্গা পথে দাঁড়াইয়াছিল, সে প্রশ্ন করিল—কি হ'ল ডাক্তারবাবু, চৌধুরীমশায়?

জগন বলিল—সমস্ত দিন বসিয়ে রেখে, সন্ধ্যেবেলায় দিন ফেলে সদরে চালান্ দিলে। বদ্‌মায়েসী আর কি!

—চালান দিলে?

—হঁ্যা। কালই যাব আমি সদরে, জামিনে পণ্ডিতকে খালাস ক'রে আনব।

কথাটা মিথ্যা। দেবুর একবৎসর তিন মাস—পনেরো মাসের মেয়াদে জেল হইয়াছে। কাল জগন সদরে যাইবে আপীল করিবার জন্য। দেবু কিন্তু আপীল করিতে বারণ করিয়াছে। সাক্ষীর অবস্থা দেখিয়া সে আপীলের ফলও আন্দাজ করিয়া লইয়াছে।

জগন গালিগালাজ করিয়াছিল গ্রামের লোককে। দ্বারকা চৌধুরী পর্য্যন্ত আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ দন্তহীন মুখে কম্পিত অধরে বলিয়াছিলেন—ভগবান এর বিচার ক'রবেন।

দেবু হাসিয়া বলিয়াছেন—আপনি সেদিন যে গল্পটা ব'ললেন—

সেটা ভুলে গেলেন, চৌধুরীমশাই? মানুষের ভুল-চুক পদে-পদে। আর একটা কথা, চৌধুরীমশায়, এরা আমার পক্ষে সাক্ষী না দিক, বিপক্ষেও দেয় নাই!

অনিরুদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—দিলে, মাথায় বজ্রাঘাত হ'ত।...

জেলের কথাটা তাহারা চাপিয়া রাখিল; দেবুর স্ত্রীর কথা বিবেচনা করিয়াই চাপিয়া রাখিল।

দুর্গা আসিয়া বিলুকে সংবাদ দিয়া বলিল—তোমার কাছে আমার মা শোবে, বিলু দিদি।

বিলু বলিল—তুই থাক্ না দুগ্‌গা; বেশ দুজনে গল্প ক'রব। আমি ঘরে শোব, তুই বারান্দায় দোরটিতে শুবি।

দুর্গা বলিল—না, বিলুদিদি!

—কেন দুর্গা?

—আমার, ভাই, নিজের বিছেনা নইলে ঘুম হয় হয় না।

বিলু আর অনুরোধ করিল না। ব্যাপারটা সে বুঝিল; একটু কেবল হাসিল, কিন্তু রাগ করিল না। মরিলেও নাকি মানুষের স্বভাব যায় না!

সমস্ত দিনটা কাটিল, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে সময় আর কাটিতে চায় না। বিলু চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে জেলে। সন্ধ্যায় গোটা গ্রামটায় শাঁখ বাজিয়া উঠিতে তাহার চমক ভাঙিল—ঘরে মা-লক্ষ্মী রহিয়াছেন, ধূপ-দীপ দিতে হইবে! মায়ের শীতল-ভোগের আয়োজন এখনও করা হয় নাই। দুর্গা যাইবার সময় বাড়ীর রাখালটাকে ডাকিয়া দিয়া গিয়াছিল, ছোঁড়াটা প্রচুর পরিমাণে পিঠা খাইয়া এক পাশে কাপড় মুড়ি দিয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিল! বেচারির পেটটা

ফুলিয়া বুকের চেয়েও উঁচু হইয়া উঠিয়াছে—হাঁস ফাঁস করিতেছে। ছোঁড়াটাও আশ-পাশের বাড়ীর শাঁখের শব্দে উঠিয়া বসিল; বলিল—সাঁজ লেগে গেইচে লাগ্‌ছে! মনিব্যান্‌, সাঁজ জ্বাল গো, শাঁখ বাজাও, ধূপ-পিদীম দাও।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিলু উঠিল। ছোঁড়াটা বসিয়া বসিয়া আপন মনেই কথা বলিতেছিল—সবই মনিবের অর্থাৎ দেবুর কথা!

—মনিব এতখন ব'সে ব'সে আমাদের কথাই ভাবছে, লয় মনিব্যান্‌?

বিলু চোখ মুছিল।

—আচ্ছা, মনিব্যান্‌! জেহেলে কি লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়? মনিব তা' হ'লে কি ক'রে শোবে?

আর্ত্তস্বরে বিলু বলিল—ওরে, তুই আর বকিস্‌ না, থাম্‌।

ছোঁড়াটা অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া গেল।

সন্ধ্যা-প্রদীপ, ধূপ, শীতল-ভোগ সাজাইয়া বিলু বলিল—আমার সঙ্গে আয় বাবা, খামারে গোয়ালে যাব।....বলিতে বলিতেই মনে পড়িল—ঘুমন্ত শিশুর কথা; তাহার কাছে কে থাকিবে? অন্যদিন এই সময়টিতে থাকিত সে। বিলু একাই খামারে, গোয়ালে, মরাইয়ের তলে জল দিয়া সন্ধ্যা দেখাইয়া আসিত। আজ সে নাই বলিয়া অকারণে তাহার ভয় করিতেছে, তাহার আকস্মিক সকরুণ অসহায় অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

ছোঁড়াটা উঠিয়া বলিল—চল।

—কিন্তু খোকার কাছে থাকবে কে?

—আমি থাকছি। বলিয়া সে শুইয়া পড়িয়া বলিল—এত ভয় কিসের গো, মনিব্যান? যাও ক্যানে, 'কিবৃষেণরা' রইছে সব খামারে।

—কিষাণরা রয়েছে ?

—নাই ? আমি হে হেথা রইছি, তারাই তো গরু ঢোকালে গোয়ালে। রেতে একজনা থাকৃবে বাড়ীতে শুয়ে। পালা করে রোজ একজনা থাকে। মনিব নাই, থাকৃবে না ? আমিও থাকব মনিব্যান্, একটি ক'রে কাহিনী কিন্তুক ব'লতে হবে।....

বিলু সন্ধ্যা দেখাইয়া ফিরিয়া আসিল—সঙ্গে সঙ্গে কৃষাণ দুইজন।

লক্ষ্মীর সিংহাসনের সম্মুখে ধূপ-দীপ, শীতল-ভোগ রাখিয়া প্রণাম করিয়া বিলু কামনা করিল—ওঁকে মানে-মানে খালাস ক'রে দাও, মা ওঁর মঙ্গল কর। ঘরে আমার অচলা হ'য়ে বাস কর।

ছোঁড়াটা বলিল—মনিব্যান্, সেই ক্ষীরের পিঠে আর আছে নাকি ?

বিলু মৃদু হাসিয়া বলিল—আছে।

—তবে তাই গণ্ডা দুয়েক দাও, আর কিছু খাব না রেতে।

—হ্যাঁ বাবা, তোমরা ?....বিলু প্রশ্ন করিল কৃষাণ দুইজনকে।

—দেন অল্প ক'রে চারডি।

দুপুরবেলায় এক একজন ভীমের আহার করিয়াছে। ইহাদের খাওয়াইতে বিলুর এত ভাল লাগে! দেবু ইহাদের নিজে খাওয়াইত। বিলু জোগাইয়া দিত, পরিবেশন করিত সে নিজে।

আবার 'আঁউরি-বাঁউরি' দিয়া সব বাঁধিতে হইবে। মুঠ-লক্ষ্মীর ধানের খড়ের দড়িতে সমস্ত সামগ্রীতে বন্ধন দিতে হইবে।....আজিকার ধন থাক্, কালিকার ধন আসুক, পুরানো-নূতনে সঞ্চয় বাড়ুক। লক্ষ্মীর প্রসাদে পুরাতন অন্নে—নূতন বস্ত্রে জীবন কাটিয়া যাক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। অচলা হইয়া থাক মা, [illegible] হইয়া থাক।

শেষ রাত্রে ছিল আর এক পর্ব্ব। পৌষ-আগলানো পর্ব্ব—এই পৌষ-সংক্রান্তির রাত্রির শেষ প্রহরে। পৌষমাস যখন বিদায় লইয়া

অন্ধকারের আবরণে পশ্চিম দিগন্তের মুখে পা বাড়ায়, পূর্ব্ব দিগন্তে আলোক আভাসের পশ্চাতে মকর রাশিস্থ সূর্য্যের রথের সঙ্গে উদয় হয় মাঘের প্রথম দিন—তখন কৃষক-বণিতারা পৌষকে বন্দনা করিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করে—পৌষ, তুমি যাইও না। চিরদিন তুমি থাক।

চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় পৌষ-আগলানো হইয়া থাকে।

ভোর রাত্রে ঘরে ঘরে লোক জাগিয়া উঠিয়াছে, গ্রামময় মানুষের সাড়া। শাঁখও বাজিতেছে।

বিলুও উঠিল। ছেলেটিও জাগিয়াছিল—তাহাকে কাপড় জড়াইয়া রাখাল-ছেলেটার কোলে দিয়া বিলু পূজার আয়োজন করিতে বসিল।

—ও ভাই, পণ্ডিত-বউ। হ'ল কি তোমার? এস!

ডাকিতেছিল পদ্ম।

বিলু দুয়ার খুলিয়া দিল।—এই হ'য়েছে। ধূপের আগুন হ'লেই হয়; চল যাই।

উনানে কাঠ জ্বলিতেছিল। পদ্ম দাঁড়াইয়া রহিল। ধূপদানীতে আগুন তুলিয়া লইয়া বিলু বলিল—চল।

রাখাল-ছেলেটা লইল হারিকেন। বাড়ীতে কৃষাণেরা রহিল; দুর্গার মা শুইয়াই রহিল—সে উঠে নাই। বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই রাখালটা চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল—কে?

কেরে? পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল।

ছোঁড়াটা আলোটা তুলিয়া ধরিয়া বলিল—দুগ্‌গা দিদি বটে!

লণ্ঠনের আলোটা দুর্গার উপর পরিপূর্ণভাবে পড়িল, পরণে পাট-ভাঙা খয়ের রঙের তাঁতের শাড়ী, চুলের পারিপাট্যও চমৎকার, কপালে টিপ; কিন্তু সমস্তই বিশৃঙ্খল—বিপর্য্যস্ত। সে হাঁপাইতেছিল—চোখে তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

সে বলিল—মিছে কথা, বিলু দিদি, মিছে কথা। পণ্ডিত-জামাইয়ের পনেরো মাসের মেয়াদ হ'য়ে গিয়েছে।

বিলু হতবাক্ হইয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

দুর্গা গিয়াছিল নৈশ অভিসারে কঙ্কণার সেটেল্‌মেণ্ট ক্যাম্পে। আমিন, পিওন, এমন কি কানুনগোদের মধ্যেও দুই-একজন, স্থানীয় দুর্গা-শ্রেণীর নারীদের উপর গোপনে অনুগ্রহ করিয়া থাকে। পেস্কারটি আবার এ বিষয়ে সকলের সেরা। দুর্গার কাছে কয়েকদিনই সে অনুগ্রহের আহ্বান পাঠাইয়াছিল। কিন্তু দুর্গা যায় নাই। আজ সে গিয়াছিল নিজে। বলিয়াছিল—পণ্ডিতকে কিন্তু হাকিমকে ব'লে-ক'য়ে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

পেশকার বলিয়াছিল—আচ্ছা, কাল সকালে।

ভোরবেলায় আসিবার সময় দুর্গার ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—তাহার অনুগ্রহ-প্রার্থী পেস্কারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ একজন পিওন।

দুর্গা আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল। সে মনে মনে বাছিতেছিল—আপনার সগোত্রাদের মধ্যে একটি বাহ্যশ্রীময়ী অথচ ব্যাধি-যুক্তা সখি।

ও-দিকে তখন চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের সমস্বরে ধ্বনি উঠিতেছিল—পৌষ-বন্দনার, পৌষ-বন্ধনের।

পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ।
এস পৌষ যেয়ো না—জন্ম জন্ম ছেড়ো না।
না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে,
স্বামী-পুতে ভাত খাবে কটোরা ভরিয়ে।
পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ,
বড় ঘরের মেঝেয় বোস্,
বড় ঘরের মেঝে ভ'রে—বাহায় পৌটি হোস্
সোনার পৌষ।...

পদ্ম তাহার কাঁধে হাত দিয়া ডাকিল—এস ভাই।

বিলু স্বপ্নোত্থিতের মত বলিল—চল।

কি করিবে? উপায় কি? যাইবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে—খোকার ভার তোমার উপর রহিল, আরও রহিল ঘর-দুয়ার-মরাই—গরু-বাছুর—ধানজমি—সবের ভার। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুমি চঞ্চল হইলে তো চলিবে না। সর্ব্ব অবস্থায় অচলা হইয়া থাকিতে হইবে!...তাই থাকিবে সে, তাই থাকিবে। তাহার ঘরের সোনার পৌষ চলিয়া যাইতেছে, 'তাহাকে পূজা করিয়া বাঁধিতে হইবে। না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে'!—পনেরো মাস পরে তো সে ফিরিয়া আসিবে; তখন তাহাকে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া কটোরা ভরিয়া অন্ন সাজাইয়া দিতে হইবে!....

আঠারো

এক বৎসর অতীত হইয়াছে। এক পৌষ-সংক্রান্তি হইতে আর এক পৌষ-সংক্রান্তিতে এক বৎসর পূর্ণ হইয়া মাঘ ফাল্গুন আরও দুইটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। সেদিন চৈত্রের পাঁচ তারিখ। দেবু নামিল জংসন ষ্টেশনে নামিল। চৈত্রমাসের শীর্ণ ময়ূরাক্ষী পার হইয়া শিবকালীপুরের ঘাটে উঠিয়া সে একবার দাঁড়াইল। দীর্ঘ এক বৎসর তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ শেষ করিয়া সে আজ বাড়ী ফিরিতেছে। পনেরো মাসের মধ্যে কয়েকদিন সে মকুব পাইয়াছে। এতক্ষণে আপনার গ্রামখানির সীমানায় পদার্পণ করিয়া যেন পরিপূর্ণ মুক্তির আস্বাদ অনুভব করিল।

ওই তাহার গ্রাম শিবকালীপুর, তাহার পশ্চিমে সেখ-পাড়া কুসুমপুর, তাহার পশ্চিমে ওই দালান-কোঠায়-ভরা কঙ্কণা। দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংসন। সেখ-পাড়া কুসুমপুরের মসজিদের উঁচু

সাদা থামগুলি সবুজ গাছপালার ফাঁক দিয়া দেখা যাইতেছে। শিবকালী-পুরের পূর্ব্বে—ওই মহাগ্রাম—ন্যায়রত্ন মাহাশয়ের বাড়ী। মহাগ্রামের পূর্ব্বে ওই দেখুড়িয়া। দেখুড়িয়ার খানিকটা পূর্ব্বে ময়ূরাক্ষী একটা বাঁক ফিরিয়াছে। ওই বাঁকের উপর ঘন সবুজ গাছপালার মধ্যে বন্যায় নিশ্চিহ্ন ঘোষপাড়া মহিষডহর।

ঘাট হইতে সে ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর উঠিল। চৈত্র মাসের বেলা দশটা পার হইয়া গিয়াছে, ইহারই মধ্যে বেশ 'খরা' উঠিতেছে। বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র এখন প্রায় রিক্ত। গম, কলাই, যব সরিষা, রবিফসল প্রায়ই ঘরে উঠিয়াছে। মাঠে এখন কেবল আছে কিছু তিল, কিছু আলু, এবং কিছু-কিছু তরি ফসলও রহিয়াছে। তিলই এ সময়ের মোটা ফসল; গাঢ় সবুজ সতেজ গাছগুলি পরিপূর্ণরূপে বাড়িয়া উঠিয়াছে। এইবার ফুল ধরিবে। চৈত্র-লক্ষ্মীর কথা দেবুর মনে পড়িল—এই তিলফুল তুলিয়া কর্ণাভরণ করিয়া পরিয়াছিলেন মা-লক্ষ্মী; তাই চাষীর ঘরে তাঁহাকে আসিতে হইয়াছিল—তিলফুলের ঋণ শোধ দিতে। বেগুনি রঙের তিল ফুলগুলির অপূর্ব্ব গঠন। মনে পড়িল 'তিল ফুল জিনি নাসা'।

আজ এক বৎসরেরও অধিক কাল সে জেলখানায় ছিল—সেখানে ভাগ্যক্রমে জনকয়েক রাজবন্দীর সহচর্য্য সে কিছুদিনের জন্য লাভ করিয়াছিল। ঐ লাভের সম্পদ-কল্যাণেই তাহার বন্দীজীবন পরম সুখে না হোক্ প্রচুর আনন্দের মধ্যে কাটিয়া গিয়াছে, দেহ তাহার ক্ষীণ হইয়াছে, ওজনে সে প্রায় সাত সের কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু মন ভাঙে নাই। মুক্তি পাইয়া আপনার গ্রামের সম্মুখে আসিয়াও সাধারণ মানুষের মত অধীর-আনন্দে ছুটিয়া বা দ্রুতপদে চলিতেছিল না। সে একবার দাঁড়াইল। চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। শিবকালী-পুর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আম, কাঁটাল, জাম, তেঁতুল গাছগুলির উঁচু

মাথা নীল আকাশ-পটে আঁকা ছবির মত মনে হইতেছে। দুলিতেছে কেবল বাঁশের ডগাগুলি। ওই মৃদু দোল-খাওয়া বাঁশগুলির পিছনে তাহাদের ঘর। গাছের ফাঁকে ফাঁকে কতকগুলি ঘর দেখা যাইতেছে!

এদিকে বাউড়ী-পাড়া, বায়েনপাড়া; ওই বড়গাছটি ধর্ম্মরাজতলার বকুলগাছ। ছোট ছোট কুঁড়েঘরগুলির মধ্যে ওই বড় ঘরখানা দুর্গার কোঠা-ঘর। দুর্গা! আহা, দুর্গা বড় ভালো মেয়ে। পূর্ব্বে সে মেয়েটাকে ঘৃণা করিত, মেয়েটার গায়ে-পড়া ভাব দেখিয়া বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিত। অনেকবার রূঢ় কথাও বলিয়াছে সে দুর্গাকে। কিন্তু তাহার অসময়ে, বিপদের দিনে দুর্গা দেখা দিল এক নূতন রূপে। জেলে আসিবার দিন সে তাহার আভাসমাত্র পাইয়াছিল। তারপর বিলুর পত্রে জানিয়াছে অনেককথা। অহরহ—উদয়াস্ত দুর্গা বিলুর কাছে থাকে, দাসীর মত সেবা করে, সাধ্যমত সে বিলুকে কাজ করিতে দেয় না, ছেলেটিকে বুকে করিয়া রাখে। স্বৈরিণী বিলাসিনীর মধ্যে এ রূপ কোথায় ছিল—কেমন করিয়া লুকাইয়া ছিল?

ওই-যে বড় ঘরের মাথাটা দেখা যাইতেছে—ওটা হরিশ-খুড়ার ঘর; তারপরেই ভবেশ-দাদার বাড়ী, সেটা দেখা যায় না। ওই-যে ওধারে টিনের ঘরের মাথা রৌদ্রে ঝক্‌মক্ করিতেছে—ওটা শ্রীহরির ঘর। শ্রীহরির ঘরের পরই সর্ব্বস্বান্ত তারিণীর ভাঙা ঘর। তারপর পথের এপাশে গ্রামের মধ্যস্থলে চণ্ডীমণ্ডপ। তারপর হরেন ঘোষালের বাড়ী; ঠিক বাড়ী নয়, হরেন ঘোষাল বলে—'ঘোষাল হাউস'। ঘোষাল বিচিত্রচরিত্র। তাহার বাহিরের ঘরের দরজায় লেখা আছে 'পার্লার'; একটা ঘরে লেখা আছে 'ষ্টাডি'। দেবু কোনদিন ঘোষালের সেই মালার কথা ভুলিতে পারিবে না! ঘোষালের সম্পূর্ণ পরিচয় সে জানে। ম্যাট্রিক পাশ করিলেও মূর্খ ছাড়া কিছু নয়; ভীরু, কাপুরুষ সে; ব্রাহ্মণ হইয়াও সে পাতু বায়েনের স্ত্রীর প্রতি

আসক্ত। কিন্তু সেদিন ঘোষালকে তাহার মনে হইয়াছিল যেন সত্যকালের ব্রাহ্মণ। তাহার মালাকে সে পূত আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; ওই আশীর্ব্বাদই তাহাকে সেই যাইবার মুহূর্ত্তে অদ্ভুত বল দিয়াছিল, জেলের মধ্যেও বোধ হয় ওই আশীর্ব্বাদের বলেই রাজবন্দী বন্ধুদিগকে পাইয়াছিল।

বন্ধু কে নয়? বিলুর পত্রে সে পরিচয় পাইয়াছে, তাহাদের গ্রামের মানুষগুলির প্রতিটি জনই যেন দেবতা। তাহার মনে পড়িল একটি গ্রাম্য প্রবাদ—'গাঁয়ে মায়ে সমান কথা।' হ্যাঁ—মা! এই পল্লী তাহার মা! সে নত হইয়া পথের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া নজরে পড়িল—পলাশ গাছে ফুল ধরিয়াছে, লাল টকটকে ফুল। একটি বাড়ীর চালের মাথায় অজস্র সজিনার ডাঁটা ঝুলিয়া আছে। গ্রামের উত্তর প্রান্তে দিঘীর পাড়ে রিক্তপত্র শিমূল গাছটিতেও লাল রঙের সমারোহ। তাহারই পাশে একটা উঁচু তালগাছের মাথায় বসিয়া আছে একটা শকুন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—জগন ডাক্তারের খিড়কির বাঁশ ঝাড়ের একটি নুইয়াপড়া বাঁশের উপর সারিবন্দী একদল হরিয়াল বসিয়া আছে; সবুজ ও হলুদের সংমিশ্রণে পাখীগুলির রং অপূর্ব্ব, ডাকও তেমনি মধুর;—জলতরঙ্গ বাজনার ধ্বনির মত। বাতাসে এইবার গ্রামের নাবি আম গাছগুলির মুকুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। চৈত্রমাসে সকল আম গাছেই আম ধরিয়া গিয়াছে; শুধু চৌধুরীদের পুরানো খাস আম বাগানের গাছে চৈত্র মাসে মুকুল ধরে; এ গন্ধ চৌধুরী বাগানের মুকুলের গন্ধ।...

—পণ্ডিত মশায়!

কিশোর কণ্ঠের সবিস্ময় আনন্দ-ধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—অদূরবর্ত্তী পাশের আলপথ ধরিয়া আসিতেছে কালীপুরের

সুধীর, দ্বারকা চৌধুরীর নাতি; বড় ছেলের ছেলে। পাঠশালায় তাহার ছাত্র ছিল।

দেবু হাসিয়া সস্নেহে বলিল—সুধীর? ভাল আছিস?

সুধীর ছুটিয়া কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল।—আপনি ভাল ছিলেন স্যার? এই আসছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। এই আসছি। তুমি স্কুলে যাচ্ছ বুঝি কঙ্কণায়?

—হ্যাঁ। আপনার বাড়ীর সকলে ভাল আছে, পণ্ডিত মশায়। খোকা খুব কথা বলে এখন। আমরা যাই কিনা প্রায়ই বিকেলে, খোকাকে নিয়ে খেলা করি।

দেবু গভীর আনন্দে যেন অভিভূত হইয়া গেল। ছেলেরা তাহাকে এত ভালবাসে?

—পাঠশালার নূতন বাড়ী হ'য়েছে স্যার।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। বেশ ঘর, তিনখানা কুঠুরী! নতুন পালিশ-করা চেয়ার-টেবিল হ'য়েছে স্যার।....ইহার পরই সে ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিল —আর তো আপনি স্কুলে পড়াবেন না স্যার?

দেবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—না সুধীর, আমি আর পড়াব না। নতুন মাষ্টার এখন কে হ'য়েছেন?

কঙ্কণার বাবুদের নায়েবের ছেলে। ম্যাট্রিক পাশ, গুরু-ট্রেনিংও পাশ ক'রেছেন। কিন্তু আপনি কেন—?

সুধীরের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ওদিক হইতে একজন খুব অল্প-বয়সী ভদ্রলোক সুধীরকে ডাকিয়া বলিল—খোকা বুঝি ইস্কুলে যাচ্ছ? দেখি, তোমার খাতা আর পেন্সিলটা একবার দেখি।

সুধীর খাতা-পেন্সিল বাহির করিয়া দিল। এ ছেলেটি—হ্যাঁ—ভদ্রলোক অপেক্ষা ইহাকে ছেলে বলিলেই বেশি মানায়; কে এ ছেলেটি?

বয়স বোধ হয় আঠার-উনিশ বৎসর। চোখে চশমা—গায়ে একটা ফর্সা পাঞ্জাবী; এখানকার লোক নিশ্চয়ই নয়। সুন্দর ধারালো চেহারা। সুধীর অবশ্য ভদ্রলোকটিকে চেনে। কিন্তু ভদ্রলোকের সামনেই দেবু তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। অন্য প্রসঙ্গই উত্থাপন করিল—চৌধুরী মশায়—তোমার ঠাকুরদা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। তিনি কত আপনার নাম করেন!

দেবু হাসিল। চৌধুরীকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা করে। চমৎকার মানুষ! তিনি তাহার নাম করেন? দেবুর আনন্দ হইল। সে আবার প্রশ্ন করিল—বাড়ীর আর সকলে?

—সবাই ভাল আছেন। কেবল আমার একটি ছোট বোন মারা গিয়েছে।

—মারা গিয়েছে?

—হ্যাঁ। বেশী বড় নয়, এই একমাসের হ'য়ে মারা গিয়েছে।

ভদ্রলোকটি এইবার খাতা ও পেন্সিল সুধীরকে ফেরৎ দিল, হাসিয়া বলিল বল তো সংখ্যাটা কত?

সুধীর সংখ্যাটার দিকে চাহিয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। দেবুও দেখিল—বিরাট একটা সংখ্যা। কয়েক লক্ষ বা হাজার কোটী।

ভদ্রলোকই হাসিয়া সুধীরকে বলিল—পারলে না? বাইশ হাজার আট শো ছিয়ানব্বই কোটি, চৌষট্টিলক্ষ, উননব্বই হাজার।

সবিস্ময়ে সুধীর প্রশ্ন করিল—কি?

—টাকা।

—টাকা!

—হ্যাঁ। ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অব্ আমেরিকার খনি থেকে আর কল্‌কারখানা থেকে এক বছরের উৎপন্ন জিনিসের দাম।

সুধীর হতবাক হইয়া গেল। বিমূঢ়ের মত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবুও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল, কে এই অদ্ভুত ছেলেটি!

ভদ্রলোকটি সুধীরের পিঠের উপর সস্নেহে কয়েক চাপড় মারিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, স্কুলের দেরি হ'য়ে যাচ্ছে!....তারপর দেবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি বুঝি এদের বাড়ী যাবেন? চৌধুরী মশায়ের বাড়ী?

দেবু আরও বিস্মিত হইয়া গেল—ভদ্রলোক চৌধুরীকেও চেনেন দেখিতেছি; বলিল-না। আমি যাব শিবপুরে।

—কার বাড়ী যাবেন বলুন তো?

—আপনি কি সকলকে চেনেন? দেবু ঘোষকে জানেন?

বেশ সম্ভ্রমের সহিত যুবকটি বলিল—তাঁর বাড়ী চিনি, তাঁর ছোট খোকাটিকেও চিনি, কিন্তু তাঁকে এখনও দেখি নি! আমি আসবার আগেই তিনি জেলে গিয়েছেন। শিগ্‌গির তিনি আসবেন বেরিয়ে।

সুধীর বলিল—উনিই আমাদের পণ্ডিতমশায়।

—আপনি!....ছেলেটির চোখ দুটি আনন্দের উত্তেজনায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; দুই হাত মেলিয়া সাদরে সাগ্রহে দেবুকে জড়াইয়া ধরিয়া সে বলিল—উঃ, আপনি দেবুবাবু! আসুন আসুন—বাড়ী আসুন।

দেবু প্রশ্ন করিল—আপনি? আপনার পরিচয় তো—

চোখ বড় করিয়া সম্ভ্রমের সহিত সুধীর বলিল—উনি এখানে নজরবন্দী হ'য়ে আছেন স্যার।

—এখানে রেখেছে আমাকে। অনিরুদ্ধ কর্ম্মকার মশায়ের বাড়ীর বাইরের ঘরটায় থাকি। সুধীর, তুমি দৌড়ে যাও; ওঁর বাড়ীতে খবর দাও, গ্রামে খবর দাও। ওয়ান-টু-থ্রি। পু—ভস্-ভস্ ঝিক্-ঝিক্—! ধর, মেল ট্রেন—তুফান মেলে চলেছ তুমি!

মুহূর্ত্তে সুধীর তীরের মত ছুটিল।

হাসিয়া ভদ্রলোকটি বলিল—বুঝতে পারছেন বোধহয় এখানে ভেটিনিউ হ'য়ে আছি আমি ?

গ্রামে ঢুকিবার মুখেই ক্ষুদ্র একটি জনতার সঙ্গে দেখা হইল। জগন, হরেন, অনিরুদ্ধ, তারিণী, গণেশ আরও কয়েকজন। চণ্ডীমণ্ডপে ছিল অনেকেই—শ্রীহরি, হরিশ, ভবেশ প্রমুখ প্রবীণগণ। সকলেই সাদরে সস্নেহে আহ্বান করিল—এস, বাবা, বস। ....দেবু চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করিল, সমস্ত গুরুজনদিগকে প্রণাম করিল; শ্রীহরি পর্য্যন্ত আজ তাহাকে খাতির করিল। দেবু সম্বন্ধে খুড়া হইলেও শ্রীহরি বয়সে অনেক বড়। তাহার উপর অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হিসাবে শ্রীহরি প্রণামের খাতির বড় একটা কাহাকেও দেয় না। শ্রীহরিও তাহাকে প্রণাম করিল।

চণ্ডীমণ্ডপের খানিকটা দূরে ও-ই যে তাহার বাড়ী। দাওয়ার সম্মুখে ওই যে শিউলি ফুলের গাছটি। ওই যে সব ভিড় করিয়া কাহারা দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছে!...

তাহার বাড়ীর দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল গ্রামের মেয়েরা। দুইটি কুমারী মেয়ের কাঁখে দুটি পূর্ণ ঘট। দেবু অভিভূত হইয়া গেল। তাহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য গ্রামবাসীর এ কি গভীর আগ্রহ—এ কি পরমাদরের আয়োজন ? সহসা শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া দেখিল, একটি দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে শাঁখ বাজাইতেছে। দেবু তাহাকে চিনিল, সে পদ্ম।

বাড়ীতে ঢুকিতেই তাহার পায়ের কাছে খোকাকে নামাইয়া দিয়া ঢিপ্ করিয়া প্রণাম করিল দুর্গা।

আবক্ষ ঘোমটা টানিয়া দুয়ারের বাজুতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল

বিলু। খোকাকে কোলে লইয়া দেবু বিলুর দিকে চাহিল। (বুড়ী রাঙাদিদি তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—ই ছোঁড়ার কোন আক্কেল নাই। পণ্ডিত না মুণ্ডু। আগে ই দিকে আয়! বদ্‌রসিক কোথাকার!

—ছাড়, রাঙাদিদি, পেণাম করি।

পেণাম করতে হবে না রে ছোঁড়া—বৃদ্ধা তাহাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল। তারপর বিলুকে টানিয়া আনিয়া বলিল—এই লে।

তারপর সমবেত মেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল—চল্ গো সব, এখন বাড়ী চল্। চল্ চল্! নইলে গাল দোব কিন্তু।

সকলে হাসিতে হাসিতেই চলিয়া গেল। বিলুর হাত ধরিয়া সস্নেহে ডাকিল—বিলু!)

বিলুর মুখে চোখে জলের দাগ, চোখ দু'টি ভারি, চোখ মুছিয়া সে হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, পেণাম করি।

—মণিব মাশায়!....আকর্ণবিস্তার হাসি হাসিয়া সেই মুহূর্ত্তে রাখাল-ছোঁড়াটা আসিয়া দাঁড়াইল। ছোঁড়াটা হাঁপাইতেছিল।—মাঠে শোনলাম। এক দৌড়ে চ'লে আইচি।....সে ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম করিল।

পণ্ডিত মশাই কই গো! এবার আসিল সতীশ, তাহার সঙ্গে তাহার পাড়ার লোক সব।

-- কোথা গো পণ্ডিত মাশায়!....এ ডাক শুনিয়াই দেবু ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর গলা।

(দেবুর জীবনে এ দিনটি অভূতপূর্ব্ব। এই দুঃখ-দারিদ্র্য-জীর্ণ নীচতায়-দীনতায়-ভরা গ্রামখানির কোন্ অস্থিপঞ্জরের আবরণের অন্তরালে লুকানো ছিল—এমন মধুর, উদার স্নেহ-মমতা! বিলুকে সে বলিল—

একবার আসি বাইরে থেকে। চৌধুরী মশায় এসেছেন। সুখের মধ্যে মানুষকে চিনতে পারা যায় না, বিলু, দুঃখের দিনেই মানুষকে ঠিক বুঝা যায়। আগে মনে হ'ত এমন স্বার্থপর নীচ গ্রাম আর নাই!

বিলু হাসিয়া বলিল—কত বড় লোক তুমি, ভালবাসবে না লোকে? জান, তুমি জেলে গেলে—জরিপের আমিন, কানুনগো, হাকিম—কেউ আর লোককে কড়া কথা বলে নাই, 'আপনি' ছাড়া কথা ছিল না। পাঁচখানা গাঁয়ের লোক তোমার নাম ক'রেছে। দুহাত তুলে আশীর্ব্বাদ ক'রেছে।

* * *

এক বৎসরের মধ্যে অনেক-কিছু ঘটিয়া গিয়াছে; গ্রামের প্রতি জনে আসিয়া একে একে একবেলার মধ্যেই সব জানাইয়া দিল। জগন খবর দিল, সঙ্গে সঙ্গে হরেন ঘোষাল সায় দিল—কিছু কিছু সংশোধনও করিয়া দিল।

গ্রামে প্রজা-সমিতি হইয়াছে, ঐ সঙ্গে একটি কংগ্রেস-কমিটিও স্থাপিত হইয়াছে। জগন প্রেসিডেণ্ট, হরেন সেক্রেটারী।

হরেন বলিল—কথা আছে, তুমি এলেই তুমি হবে একটার প্রেসিডেণ্ট, যেটার খুসী। আমি বলি, তুমি হও কংগ্রেস-কমিটির প্রেসিডেণ্ট। ডেটিনিউ যতীনবাবু বলেন—না দেবুবাবু হবেন প্রজা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট!

—ছিরে পাল এখন গণ্যমান্ত লোক। একটা গুড়গুড়ি কিনেছে, চণ্ডীমণ্ডপে সতরঞ্চী পেতে একটা তাকিয়া নিয়ে বসে। বেটা আবার গোমস্তা হ'য়েছে গাঁয়ের; গোমস্তাগিরি নিয়েছে। একে মহাজন, তার ওপর হ'ল গোমস্তা, সর্ব্বনাশ ক'রে দিলে গাঁয়ের।

জমিদারের এখন অবস্থা খারাপ, শ্রীহরির টাকা আছে; আদায়

হোক-না-হোক, সমস্ত টাকা শ্রীহরি দিবে—এই সর্ত্তে জমিদার শ্রীহরিকে গোমস্তাগিরি দিয়াছে। শ্রীহরি এখন এক ঢিলে দুই পাখী মারিতেছে। বাকী খাজনার নালিশের সুযোগে—লোকের জমি নীলামে তুলিয়া আপন প্রাপ্য আদায় করিয়া লইতেছে সুদে-আসলে। সুদ-আসল আদায় হইয়াও আর একটা মোটা লাভ থাকে।

গণেশ পালের জোত নীলাম হইয়া গিয়াছে, কিনিয়াছে শ্রীহরি; এখন গণেশের অবশিষ্ট শুধু কয়েক বিঘা কোর্ফা জমি।

সর্ব্বস্বান্ত তারিণীর ভিটাটুকুও শ্রীহরি কিনিয়াছে; এখন উহার গোয়ালবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত সেটা। তারিণীর স্ত্রীটা সেটেলমেণ্টের একজন পিওনের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছে। তারিণী মজুর খাটে; ছেলেটা থাকে জংসনে, ষ্টেশনে ভিক্ষা করে।

পাতু মুচীর দেবোত্তর চাকরাণ জমি উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে! তাহার জন্য নালিশ দরবার করিতে হয় নাই, সেটেলমেণ্টেই সে-জমি জমিদারের খাস খতিয়ানে উঠিয়া গিয়াছে। পাতু নিজেই স্বীকার করিয়াছিল, সে আর বাজায় না, বাজাইতেও চায় না।

অনিরুদ্ধের জমি নীলামে চড়িয়া আছে। অনিরুদ্ধ এখন মদ খাইয়া ভবঘুরের মত বেড়ায়—দুর্গার ঘরেও মধ্যে মধ্যে যায়। তাহার স্ত্রীও পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। এখন অনেকটা সুস্থ দুর্গার যোগাযোগেই দারোগা ডেটিনিউ রাখিবার জন্য অনিরুদ্ধের ঘরখানা ভাড়া লইয়াছে।

দেবু বলিল—কামার-বউকে আজ দেখলাম শাঁখ বাজাচ্ছিল।

জগন বলিল—হ্যাঁ, এখন একটু ভাল আছে। একটু কেন, যতীনবাবু আসার পর থেকেই বেশ একটু ভাল আছে।....ঠোঁট বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল!

হরেন চাপা গলায় বলিল—মেনি মেন্ সে—বুঝলে কিনা—যতীনবাবু এ্যাণ্ড কামার-বউ—

দেবু বিশ্বাস করিতে পারিল না, সে তিরস্কার করিয়া উঠিল—ছি, হরেন! কি যা' তা' বলছ।

—ইয়েস; আমিও তাই বলি, এ হ'তেই পারে না। যতীনবাবু কামার-বউকে 'মা' বলে।....তারপর আবার সে বলিল—যতীনবাবু কিন্তু বড্ড চাপা লোক। বোমার ফর্মুলা কিছুতেই আদায় ক'রতে পারলাম না।

হরিশ এবং ভবেশ আসায় তাহাদের আলোচনা বন্ধ হইল; কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া গেল।

হরিশ বলিল—বাবা দেবু, যেয়ো সন্ধ্যেবেলায় চণ্ডীমণ্ডপে। ওখানেই এখন আমরা আসি। শ্রীহরি বসে পাঁচজনকে নিয়ে। আলো, পান, তামাক—সব ব্যবস্থাই আছে। শ্রীহরি এখন নতুন মানুষ। বুঝলে কিনা!

ভবেশ বলিল—হ্যাঁ! দু'বেলা চায়ের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ক'রেছে আমাদের শ্রীহরি। বুঝেছ কিনা?

দেবু আরও অনেক খবর শুনিল।...

গ্রামের পাঁচজনকে লইয়া উঠিবার-বসিবার সুবিধার জন্তই শ্রীহরি পৃথক পাঠশালা-ঘরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। জমিদার তরফ হইতে জায়গার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে সে-ই। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর সে, সে-ই দেওয়ালের খরচ মঞ্জুর করাইয়াছে; নিজে দিয়াছে নগদ পঁচিশ টাকা। তা' ছাড়া চালের কাঠ, খড়, দরজা-জানালার কাঠও দিয়াছে শ্রীহরি!

দুই বেলা এখন চণ্ডীমণ্ডপে মজলিস বসে দেখিয়া শ্রীহরির বিপক্ষ-দলের লক্ষ্মীছাড়ারা হিংসায় পাট্-পাট্ হইয়া গেল। তাহারা নানা নিন্দা রটনা করে। কিন্তু তাহাতে শ্রীহরির কিছু আসে যায় না। তাহার গোমস্তাগিরির অসুবিধা করিবার জন্তই তাহারা প্রজা-সমিতি

গড়িয়াছে, কংগ্রেস কমিটি খাড়া করিয়াছে। দেবু যেন ও-সবের মধ্যে না যায়।

তারা নাপিত আরও গূঢ় সংবাদ দিল।...জমিদার এ গ্রামখানা পত্তনি বিলি করিবে কিনা ভাবিতেছে। শ্রীহরি গিলিবার জন্য হাঁ করিয়া আছে। পত্তনি কায়েম হইলে, শ্রীহরি বাবা বুড়াশিবের পাকা মন্দির করিয়া দিবে। চণ্ডীমণ্ডপের আটচালার উপর তুলিবে পাকা নাটমন্দির। শ্রীহরির বাড়ীতে এখন একজন রাঁধুনী, একজন ছেলে পালন করিবার লোক!

তারাচরণ পরিশেষে বলিল—ওই যে হরিহরের দুই কন্যে—যারা ক'লকাতায় ঝি-গিরি ক'রতে গিয়েছিল—তারাই। বুঝলেন! তার মানে—রীতিমত বড়লোকের ব্যাপার, দু'জনকেই এখন ছিরু রেখেছে। বুঝলেন, একেবারে আমীরী মেজাজ! যখন ছোট মেয়েটা এল—ভয়ানক রোগা, শনফুলের মত রঙ। ক্রমে শোনা গেল—ক'লকাতায় বুঝলেন?

অর্থাৎ মাতৃত্ব-সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করিয়াছিল মেয়েটি। তাই গ্রাম্য-সমাজ তাহাদিগকে পতিত করিল। কিন্তু শ্রীহরি দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে। তাহারই অনুরোধে সমাজ তাহাদের ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়াছে। তারা বলিল—দু'টো মেয়ের ভাত-কাপড়—সখ-সামগ্রী তো সোজা কথা নয়, মশায়!....

বৃদ্ধ চৌধুরী শুধু আপন সংসারের সংবাদ দিলেন, দেবুর জেলের সুখ দুঃখের সংবাদ লইলেন। পরিশেষে আশীর্ব্বাদ করিলেন—পণ্ডিত, তুমি দীর্ঘজীবি হও। দেখ, যদি পার বাবা—তবে শ্রীহরির সঙ্গে ডাক্তারের, আর বিশেষ ক'রে কর্ম্মকারের মিটমাট করিয়ে দাও। অনিরুদ্ধ লোকটা নষ্ট হ'য়ে গেল!

রামনারায়ণ আসিয়া বলিল—ভাল আছ দেবু ভাই? আমার মা'টি মারা গিয়েছেন!

বৃন্দাবন দোকানী বলিল—চালের ব্যবসায় অনেক টাকা লোকসান গিয়েছে। জংসনের রামলাল ভকত তো লালবাতী জ্বেলে দিলে।

বৃদ্ধ মুকুন্দ একটি খোকাকে কোলে করিয়া আসিয়াছিল; বলিল হরেন্দর ছেলে দেখ, বাবা দেবু।···মুকুন্দের পুত্র গোবিন্দ, গোবিন্দের পুত্র হরেন্দ্র; সুতরাং হরেন্দ্রের ছেলে তাহার প্রপৌত্র।

সন্ধ্যার মুখে নিজে আসিল শ্রীহরি। শ্রীহরি এখন সম্ভ্রান্ত লোক। লম্বা চওড়া পেশী-সবল যে জোয়ান চাষী নগ্নদেহে কোদাল হাতে ঘুরিয়া বেড়াইত—দুর্দ্দান্ত বিক্রমে দৈহিক শক্তির আস্ফালন করিয়া ফিরিত, সামান্য কথায় প্রয়োগ করিত শক্তি, জোর করিয়া পরের সীমানা খানিকটা আত্মসাৎ করিয়া লইত, কর্কশ উচ্চ-কণ্ঠে ঘোষণা করিত—সে-ই গ্রামের প্রধান ব্যক্তি, তাহার অপেক্ষা বড় কেহ নাই, সেই ছিরু পালের সঙ্গে এই শ্রীহরির কোন সাদৃশ্য নাই। শ্রীহরি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ! তাহার পায়ে ভাল চটি, গায়ে ফতুয়ার উপর চাদর, গম্ভীর সংযত মূর্ত্তি; সে এখন গ্রামের গোমস্তা—মহাজন; বলিতে গেলে সে এখন গ্রামের অধিপতি।

—দেবুখুড়ো র'য়েছে না কি হে? · হাসিমুখে শ্রীহরি আসিয়া দাঁড়াইল।

—এস ভাইপো এস।···দেবুও তাহাকে সম্ভ্রম করিয়া স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইল। দেবু বাহির হইবারই উদ্যোগ করিতেছিল। অনিরুদ্ধের ওখানে যাইবার ইচ্ছা ছিল। ডেটিনিউ যতীনবাবু সেই তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অনিরুদ্ধও সেই চলিয়া গিয়াছে। সে নাকি এখন মাতাল, দুর্গার ঘরে রাত্রি যাপন করে, তাহার অন্ন-গ্রহণেও অরুচি হয় না তাহার, জমি নীলামে

উঠিয়াছে। অনি-ভাইয়ের জন্য দুঃখ হয়। কি হইয়া গেল সে! তাহার একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, চৌধুরীই বলিয়াছিলেন—পণ্ডিত, মা-লক্ষ্মীর নাম শ্রী। লক্ষ্মী যার আছে—তারই শ্রী আছে; যার মনে বল, চেহারায় বল, প্রকৃতিতে বল—সে-ই শ্রীমান্। শ্রীহরির পরিবর্ত্তন হবে বৈকি! অভাবেই অনি ভাইয়ের এমন দশা। তার ওপর কামার-বউ অসুস্থ হওয়ায় আরও বোধ হয় সে এমনটি হয়ে গেল।....

—এস খুড়ো, চণ্ডীমণ্ডপে এস। ওইখানেই এখন ব'সছি। চা হ'য়ে গিয়েছে। এস।

দেবু 'না' বলিতে পারিল না। চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া শ্রীহরি বলিয়া গেল অনেক কথা।..এই চণ্ডীমণ্ডপে বসিবার জন্যই গ্রামে স্কুল-ঘর করা হইয়াছে। স্কুল-ঘরের মেঝে-বারান্দা সব পাকা করিয়া দিবার ইচ্ছা আছে। একজন ডাক্তারের সঙ্গেও তাহার কথা হইয়াছে, তাহাকে আনিয়া সে গ্রামে বসাইতে চায়। শ্রীহরিই তাহাকে থাকিবার ঘর দিবে, খাইতেও দিবে। জগনকে দিয়া আর চলে না। উহার ওষুধ নাই—সব জল, সব ফাঁকি।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

সেটেল্‌মেন্টের, খানাপুরী,' 'বুঝারত' দুইটা শেষ হইয়া গিয়াছে। আর কোন গণ্ডগোল হয় নাই। এই সমস্তই দেবুর জন্য, তাহা সে অস্বীকার করিল না। বলিল—বুঝলে খুড়ো, শেষটা আমিন, কানুনগো 'আপনি' ছাড়া কথা ব'লত না। আমরা তোমার নাম করতাম। এইবার হবে তিন ধারা, তারপর পাঁচ ধারা।

শ্রীহরি আরো জানাইল দেবুর জমা-জমি সমস্তই সে নির্ভুল করিয়া সেটেল্‌মেণ্ট রেকর্ড করাইয়াছে। এমন কি, কঙ্কণার বাবুদের কর্ম্মচারী যে জমি-টুকরাটি আত্মসাৎ করিয়াছিল—সেটি পর্য্যন্ত উদ্ধার করিয়াছে।

উদ্ধার হইয়াছে?....দেবু বিস্মিত হইয়া গেল।

—হবে না! জমিদারী সেরেস্তার তামাম কাগজপত্র আমাদের হাতে, তার ওপর দাসজীর পাকা মাথা। আমি বললাম—দেবু-খুড়ো উপকার করলে দেশের লোকের, বাঘের দাঁত ভেঙে দিয়ে গেল; আমাদের এ উপকারটি না করলে চলবে না, আর তা ছাড়া—

তা ছাড়া; শ্রীহরি আকাশের দিকে চাহিয়া জোড়হাতে প্রণাম করিল—ভগবান যখন মানব-জন্মই দিয়েছেন, তখন উপকার ছাড়া অপকার কারুর ক'রব না, খুড়ো।—এই দেখ না, হরিহরের কন্যে দু'টিকে নিয়ে কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড! ক'লকাতায় তো খাতায় নাম লিখিয়েছিল। শেষে বিশ্রী কাণ্ড করে দেশে এল। গাঁয়ের লোক পতিত ক'রলে। আমি বুঝিয়ে-সুজিয়ে ক্ষান্ত ক'রে আমার বাড়ীতেই রেখেছি! লোকে বলে নানা কথা। তা' আমি মিথ্যে ব'লব না, খুড়ো তুমি তো শুধু খুড়ো নও, বন্ধুলোক,—একসঙ্গে পড়েছি! বাজারে খাতাতেই যারা নাম লিখিয়েছিল, তাদের যদি আমি ঐ জন্যেই রেখে থাকি তো কি এমন দোষ করেছি, বল?

গড়গড়ার নলটা দেবুর হাতে দিয়া শ্রীহরি বলিল—খাও খুড়ো।

—না। জেলখানায় গিয়ে বিড়ি তামাক ছেড়ে দিয়েছি।

—বেশ ক'রেছ।

শ্রীহরির কথা ফুরাইতেই চায় না; কাহার বিপদের সময় তাহার উপকারের জন্য কত টাকা সে ধার দিয়াছে, আর সে এখন দিবার নাম করিতেছে না—সেই ইতিহাস আরম্ভ করিল।

শ্রীহরিকে দোষ দেওয়া যায় না। টাকা খাকা পাপ নয়, বে-আইনী নয়। কাহারও বিপদে টাকা ধার দিলে, খাতক সে সময়ে উপকৃতই হয়; কিন্তু সুদে-আসলে আদায়ের সময় তাহার যে কদর্য্য রূপটা বাহির হইয়া পড়ে, সেজন্য শ্রীহরি কি করিবে? অথচ সুদের জন্য

তাহাকে ইন্‌কাম্‌ ট্যাক্স দিতে হয়; হক্‌ পাওনা আদায়ের জন্ত আদালতে কোর্ট ফি লাগে; ইউনিয়নকে দিতে হয় চৌকীদারী ট্যাক্স। সুদ সে ছাড়ে কি করিয়া?

দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। শ্রীহরির দিকটা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িয়া গেল—বাল্যকালের স্মৃতি। ঋণের দায়ে কঙ্কণার বাবুদের দ্বারা অস্থাবর-ক্রোধের কথা। সে শিহরিয়া উঠিল।

—এই দেখ, সেটেল্‌মেন্টের তিনধারা আসছে, পাঁচ ধারায় কোর্ট আসছে! ইদিকে প্রজাসমিতি ক'রে ডাক্তার ধুয়ো তুলেছে—এ গাঁয়ের সব জমী মোকররী জমা। এ মৌজায় নাকি কখনও বৃদ্ধি হয় নাই! তোমাকে আমি কাগজ দেখাব; বারো শো সত্তর সালের কাগজ; তামাম জমায় বৃদ্ধি দাবি আছে; একটা জমাও মোকররী দাঁড়াবে না। জমিদার বৃদ্ধি দাবি ক'রবে। হয় তো হাঙ্গামা বাধাবে ওরা। মামলা হবে। আইনে জমিদারেব প্রাপ্য—সে পাবেই। আইনে যখন প্রাপ্য; তখন আর তার অপরাধটা কোথায় বল? পঞ্চাশ বছরে ফসলের দাম তিনগুণ বেড়েছে! জমিদার পাবে না?

দেবু এ কথারও কোন উত্তর দিতে পারিল না। ফসলের দাম সত্যই বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রজাদের আয়ও বাড়ে নাই—সুখস্বাচ্ছন্দ্যও বাড়ে নাই। ইহার উপরে খাজনা বৃদ্ধি!

—শোন খুড়ো! দৈবের বিপাকে অনেক কষ্ট পেলে। আর বাবা, আর ওসব পথে যেও না তুমি। খাও-দাও, কাজ-কম্ম কর, লোকের উপকার কর,—তোমার উপর অনেক আশা লোকের। সেই কথাই আজ দারোগা বললেন, পণ্ডিতকে বারণ ক'রে দিয়ো, ঘোষ, ওসব যেন না করে।....একটা বণ্ড লিখে দাও তুমি—ওরা তোমাকে নিষ্কৃতি করে

দেবে! স্কুলের চাকরি—ও তোমারই আছে, একটা বণ্ড্ লিখে দিলেই তুমি পাবে। আর ওই নজরবন্দী ছোকরার সঙ্গে তুমি মিশো-টিশো না যেন। বুঝলে?

এবার দেবু হাসিয়া বলিল—বুঝলাম সব।

—তা হলে কালই চল আমার সঙ্গে।

—না, তা পারব না, ছিরু। আমি তো অন্যায় কিছু করি নি।

—কাজ ভালো ক'রছ না, খুড়ো। আচ্ছা, দু'দিন ভেবে দেখ তুমি

—আচ্ছা।....হাসিয়া দেবু উঠিয়া চলিয়া আসিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে পথের উপর নামিতেই জন দু'য়েক তাহাকে হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।

—কে, সতীশ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার?

—আজ্ঞে, আমাদের পাঁড়ায় একবার পদার্পন ক'রতে হবে আপনাকে।

—কেন? কি হ'ল?

—ঘেঁটু-গান? আজ থাক্ সতীশ—অন্য একদিন হবে।

—আজ্ঞে, আপনাকে শোনাবার জন্যে আসর পেতেছি আমরা।... তারপর ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—নজরবন্দী বাবুও আইচেন; তিনি ব'সে রইচেন। ডাক্তোর-বাবু রইচেন।

নজরবন্দী বাবুটিও আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, চল তবে।....

* * * *

চৈত্র মাসে 'ঘণ্টাকর্ণের' পূজা। ঘেঁটু পূজা,—পঞ্জিকার 'ঘণ্টাকর্ণ'

নয়। পঞ্জিকার 'ঘণ্টাকর্ণ'—বসন্ত রোগ-নিবারক মহাবল ঘণ্টাকর্ণের পূজা। এই 'ঘণ্টাকর্ণ'—ঘেঁটু, গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণু-বিরোধী শিবভক্ত ঘণ্টাকর্ণ ছিল পিশাচ—সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রুদ্র দেবতার এবং বিষ্ণু দেবতার উভয়েরই প্রসাদ লাভ করিয়াছিল! ভক্ত পিশাচ ঘণ্টাকর্ণের পূজা করে নিম্ন জাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ী বাড়ী বেড়ায়। চাল-ডাল সিধা মাগিয়া গাজনের সময় উৎসব করে।

চৈত্র মাসের সন্ধ্যা। ধর্ম্মরাজের স্থানে বকুলগাছ-তলায় আসন পড়িয়াছে। বকুল ফুলের গন্ধে সমস্ত জায়গাটা ভুরভুর করিতেছে। আকাশে চাঁদ ছিল—শুক্লপক্ষের দ্বাদশীর রাত্রি। একদিকে মেয়েরা অন্যদিকে পুরুষদের আসর। দুই আসরের মাঝখানে বসিল—নজরবন্দী বাবুটি, পণ্ডিতমশায়, ডাক্তারবাবু, হরেন ঘোষাল; চারিটা মোড়াও তাহারা যোগাড় করিয়াছে। বাসন্তী সন্ধ্যার জ্যোৎস্না—আকাশ হইতে মাটির বুক পর্য্যন্ত যেন এক স্বপ্নকুহেলিকায় আলোর জাল বিছাইয়া দিয়াছিল।

দেবুর মনে পড়িয়া গেল—বাল্যকালে তাহারা ঘেঁটু-গান শুনিতে এখানে আসিত। এমনই জ্যোৎস্নার আলোতে আসর বসিত। যাইবার সময় আঁচল ভরিয়া কুড়াইয়া লইয়া যাইত বকুল ফুল। তখন সতীশেরা সদ্য জোয়ান—উহারাই গাহিত গান—আর তাহাদের বয়সীরা ধুয়া গাহিত, নাচিত। তখন কিন্তু ঘেঁটুর আসর ছিল জম্‌জমাট। সে কত লোক! সে তুলনায় এ আসর অনেক ছোট। বিশেষ করিয়া পুরুষের দলই যেন অল্প। দেবু বলিল—সে আমলের মত কিন্তু আসর নাই তোমাদের, সতীশ।

সতীশ বলিল—পাড়ার সিকি মরদই এখনো আসে নাই, পণ্ডিতমশায়।

—কেন? কোথায় গিয়েছে।

—আজ্ঞে, প্যাটের দায়ে। গাঁয়ে চাকরি মেলে না; গেরস্তর ফেরার হ'য়ে গেল, মুনিষ-জন রাখতে পারে না। আমাদেরও ছেলে-পিলে বেড়েছে। এখন ভিন্‌গাঁয়ে চাকরি ক'রতে হয়। চাকরি সেরে ফিরতে একপহর রাত হ'য়ে যায়। তা' ঘেঁটু গান ক'রবে কখন—শুনবে কখন বলেন?

জগন বলিল—পেটেই তোদের আগুন লেগেছে রে, পেট আর কিছুতেই ভরছে না!

সতীশ হাত-জোড় করিয়া বলিল—তা আজ্ঞে আপুনি ঠিক ব'লেছেন ডাক্তোর বাবু, প্যাটে আগুনই নেগেছে বটে। মেয়েরা পর্য্যন্ত 'রোজ' খাটতে যাচ্ছে! কি ক'রব বলুন? পঞ্চায়েত ক'রে বারণ ক'রলাম। তা কে শুনেছে? ছুটেছে সব। আর যে অভাব হ'য়েছে—!

বাধা দিয়া যতীন বলিল—নাও নাও, গান আরম্ভ কর।

গায়ক ও বাদকের দল অপেক্ষা করিয়াই ছিল, তাহারা আরম্ভ করিয়া দিল।

ঢোলোকের বাজনার সঙ্গে মন্দিরার ধ্বনি; গায়কের দল আরম্ভ করিল—

শিব-শিব-রাম-রাম।

ছোট ছেলের দল নাচিতে নাচিতে হাতে তালি দিয়া ধুয়া ধরিল—

শিব-শিব-রাম-রাম।

গায়কেরা গান গাহিল—

'এক ঘেঁটু তার সাত বেটা।
সাত বেটা তার সাতায়;
এক বেটা তার মহান্ত।

মহান্ত ভাই রে,
ফুল তুলতে যাই রে।
যত ফুল পাই রে,
আমার ঘেঁটুকে সাজাই রে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক লাইনের পর ছেলেরা তালি দিয়া গান গাহিয়া গেল—শিব-শিব-রাম-রাম।

এই গান শেষ হইবার পর আরম্ভ হইল অন্য গান। স্থানীয় বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহাদেরই কবি যে গান রচনা করে—সেই গান। ময়ূরাক্ষীর বন্যাকে অবলম্বন করিয়া ইহাদের গান আছে—

হায় এ জল কোথায় ছিল।
জলে জলে-বাংলা মুলুক ভে-সে গেল।....

বহুদিন আগে যখন রেলওয়ে-লাইন, পড়িয়াছিল, সে গান আজও ইহারা গায়—

সায়েব রাস্তা বাঁধালে।
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে।

অজন্মার বৎসরের গান—

ঈশাণ কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা ক'রলে গুকো।
এক ছিলম তামুক দাওগো সঙ্গে আছে হুঁকো....

আজ তাহারা আরম্ভ করিল—

দেশে আসিল জরীপ।
রাজ-পেজা ছেলে-বুড়োর বুক টিপ্ টিপ্

ছেলেরা ধুয়া ধরিল—

হায় বাবা, কি করি উপায়?
প্রাণ যায় তাকে পারি—মান রাখা দায়।

গায়কেরা গাহিয়া চলিল—

পিওন এল, আমিন এল, এল কানুনগো।
বুড়োশিবের দরবারে মানত মানুন্ গো।
বুঝি আর মান থাকে না॥
হাকিম এল ঘোড়ায় চড়ে, সঙ্গেতে পেশ্‌কার,
আত্মারাম্ খাঁচা-ছাড়া হ'ল দেশটার।
বুঝি আর মান থাকে না॥
তাঁবু এল, চোয়ার এল, কাগজ গাড়ী গাড়ী,
নোয়ারই ছেকল এল চল্লিশ মণ ভারী।
ক্ষেতে বুঝি ধান থাকে না॥
তে-ঠেঙে টেবিল পেতে লাগিয়ে দূরবীন,
এখানে ওখানে পোঁতে চিনে মাটির পিন।
কুলীদের প্রাণ থাকে না॥
কুঁচবরণ রাঙা চোখ তারার মতন ঘোরে,
দস্তকড়মড়ি হাঁকে—এই উল্লুক ওরে!
হায় কলিতে মাটি ফাটে না॥
পণ্ডিতমশায় দেবু বাবু তেজীয়ান বিদ্বান্,
জ্ঞানের চেয়ে তার কাছে বেশী হল মান।
ও সে আর সইতে পারে না॥
কানুন্‌গো কহিল 'তুই', সে করে 'তুকারি'
আমার কাছে খাটবে না তোর কোন জুরি-জারি
দেবু কারুর ধার ধারে না॥
দেবু ঘোষের পাকা ধানে ছেকল চল্লিশ মণ,
টেনে নিয়ে চলে আমিন ঝন্-ঝন্-ঝন্।
ও সে কারুর মানা মানে না॥

দেবু হাসিল। বলিল—এ সব ক'রেছ কি সতীশ?

যতীন মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। গায়কেরা তাহার পরের ঘটনাও নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিল। শেষে গাহিল—

দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পুলিশ দারোগা,
বলে, কানুনগোর কাছে হাত জোড় করগা।
দেবু ঘোষ হেসে বলে 'না'॥
থাকিল পিছনে প'ড়ে সোণার বরণ নারী,
ননীর পুতলী শিশু ধূলায় গড়াগড়ি।
তবু ঘোষের মন টলে না॥

চোখ মুছিতে মুছিতে দুর্গা বলিল—তা তুমি পাষাণই বটে জামাই। মাগো, সে কি দিন।···শুধু দুর্গা নয়, সমবেত মেয়েগুলি সকলেই আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছিল। সেদিনের কথা তাহাদের মনে আছে।

ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে,
অধম সতীশ লুটায় এসে তাঁরই পদতলে।
দেবতা নইলে কেউ এ পারে না॥

গান শেষ হইল। সতীশ আসিয়া দেবু ঘোষকে প্রণাম করিল। দেবুর বুকেও একটা আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল; সে মুখে কিছু বলিতে পারিল না, সতীশকে সস্নেহে ধরিয়া তুলিল।

জগন বলিল—তোকে আমি একটা মেডেল দেব সতীশ!

হরেন বলিল—বাট্, মালাটা যে আমি দিয়েছিলাম, সে কথাটা বাদ গিয়েছে সতীশ।

যতীন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত অনুষ্ঠানটাই তাহার কাছে অদ্ভুত ভাল লাগিয়াছে। সতীশকে সে মনে মনে নমস্কার করিল। বলিল—তোমাদের গানগুলো আমাকে লিখে দেবে সতীশ?

—আজ্ঞে।....সতীশ অপ্রস্তুতের মত হাসিতে লাগিল।—আপনি নিকে নেবেন?

—হ্যাঁ।

—সত্যি ব'লছেন, বাবু!

—হ্যাঁ হে।

নিঃশব্দে আকর্ণবিস্তার হাসিতে সতীশের মুখ ভরিয়া গেল। সে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছে।

দেবু বলিল—আজ তো আপনার সঙ্গে আলাপ হ'ল না, কাল—

যতীন বলিল—আলাপ তো হ'য়েই গেছে। আলোচনা বাকি আছে। কাল আমিই আপনার বাড়ী যাব।

উনিশ

ওই একটি দিন। শুধু একটি দিনের জন্যই দেবু, কেবল দেবুই দেখিল—শিবকালীপুরের অদ্ভুত এক রূপ। শুধু রূপ নয়, তাহার স্পর্শ, তাহার স্বাদ—সবই একটি দিনের জন্য দেবুর কাছে মধুময় হইয়া দেখা দিল। পরের দিন হইতে কিন্তু আবার সেই পুরানো শিবকালীপুর। সেই দীনতা-হীনতা-হিংসায় জর্জ্জর মানুষ, দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগ-প্রপীড়িত গ্রাম। কালও গ্রামখানির গাছ-পালা-লতা-পাতা-ফল-ফুলের মধ্যে যে অভিনব মাধুর্য্য দেবুর চোখে পড়িয়াছিল, নাবি আমের মুকুলের গন্ধে সে যে তৃপ্তি অনুভব করিয়াছিল, আজ তাহার কিছুই সে অনুভব করিল না।

আপনার দাওয়ায় বসিয়া সে ভাবিতেছিল অনেক কথা—এলোমেলো বিচ্ছিন্ন ধারায়।...গ্রামের ধুলা। পাশেই ভবেশ-দাদার একটা ডোবায় জল মরিয়া আসিয়াছে, তাহার পানাগুলা পচিয়াছে। ইহার মধ্যেই গ্রামে জলের অভাব দেখা দিল। গরু, বাছুর, গাছপালা লইয়া

বৈশাখ-জৈষ্ঠ্যে আর কষ্টের পরিসীমা থাকিবে না। বাড়ীতে অনেক গুলি গাছ হইয়াছে, দৈনিক জল প্রয়োজন হইবে।...আর গাছ লাগাইয়া বা ফল কি? তাহার বাড়ীর যে কুম্‌ড়ার লতাটি প্রাচীর ভরিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেই গাছটার তিনটা কুমড়া কে ছিঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে কাল রাত্রে। তাহার বাড়ীর রাখাল ছোঁড়াটা গাছটা পুঁতিয়াছিল—সে তারস্বরে চীৎকার করিয়া গালি দিতেছে অজ্ঞাত-নামা চোরকে।....ছোঁড়া আবার মাহিনা-কাপড়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিলুরও কাপড় ছিঁড়িয়াছে। নিজেরও চাই।...পোষ্টা-পিসে সঞ্চয়ের টাকাগুলির আর অবশিষ্ট নাই।

ও-কি কোথায় কাহারা উচ্চ-কর্কশকণ্ঠে গালিগালাজ করিতেছে, কাহাদের ঝগড়া বাধিয়াছে। সম্ভবতঃ একটা কণ্ঠস্বর রাঙাদিদির। বুড়ীর আবার কাহার সঙ্গে কি হইল? বিলুকেই সে প্রশ্ন করিল—রাঙাদিদির কার সঙ্গে লাগ্‌ল বলতো?

বিলু হাসিয়া বলিল—লাগেনি কারু সঙ্গে। বুড়ী গাল দিচ্ছে নিজের বাপকে আর দেবতাকে। আজকাল রোজ সকালে উঠে দেয়। বুড়ো হ'য়েছে—একা কাজ-কর্ম্ম ক'রতে কষ্ট হয়, সকালে উঠে তাই রোজ ওই গাল দেবে। বাপকে গাল দেয়—বাঁশবুকো রাক্কোস, জমি-জেরাতগুলো সব নিজে পেটে ভ'রে গিয়াছে। আর দেবতাকে গাল দেয়—চোখ-খেগো, কাণা হও তুমি।

দেবু হাসিল; তারপর বলিল—কিন্তু আরও একজন যে গাল দিচ্ছে। কাঁসার আওয়াজের মত গলা!

—ও পদ্ম, কামার-বউ।

—অনিরুদ্ধের বউ?

—হ্যাঁ। ও বোধ হয় আমাদের ভাশুরপো—মানে শ্রীহরি ঘোষকে গাল দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে অমন দেয়। আজও দিচ্ছে বোধ হয়।

মাঝখানে তো পাগলের মত হ'য়ে গিয়েছিল। এখন একটুকু ভাল। ও-দিকে কম্মকার তো একরকম কাজের বার হ'য়ে গেল। এক-একদিন মদ খেয়ে যা করে। একটা লোহার ডাণ্ডা হাতে ক'রে বেড়ায়, আর চেঁচায়—খুন করেগা। যার-তার বাড়ীতে খায়।

—মানে দুর্গার বাড়ীতে তো?

—হ্যাঁ।

—ছি! ছি! ছি! দুর্গার ওই দোষটা গেল না। ওই এক দোষেই ওর সব গুণ নষ্ট হয়েছে।

বিলু বলিল—মদ খেয়ে মাতাল হ'য়ে খাব-খাব ক'রে হাঙ্গামা ক'রলে দুর্গা আর কি করবে বল? অবিশ্যি কিছুদিন দুর্গার ঘরে রাত কাটাত কম্মকার। কিন্তু আজকাল দুর্গা তো রাত্রে ঘরে ঢুকতে দেয় না। কামার তবু প'ড়ে থাকে ওদের উঠোনে, কোনদিন বাগানে; কোনদিন রাস্তায়। কোনদিন অন্য কোথাও।

—হ্যাঁ, আজকাল অনিরুদ্ধের তো পয়সা-কড়ি নাই! দুর্গা আর—

না—না—না, তা' ব'লো না। দুর্গা কোনদিনই পয়সা নেয় নাই কম্মকারের কাছে। ও-ই বরং দু'টাকা-চার-টাকা ক'রে দিয়েছে মধ্যে মধ্যে। আমার হাতে দিয়ে বলেছে—বিলু-দিদি, তুমি কামার-বউকে দিয়ো, আমি দিলে তো নেবে না!

—ছিঃ। তুমি ওই সব জঘন্য ব্যাপারের মধ্যে গিয়েছিলে।

বিলু কিছুক্ষণ নতমুখে থাকিয়া বলিল—কি ক'রব বল, কামার-বউ তখন ক্ষ্যাপার মত, তার ওপর খেতে পায় না; আমার হাতেও কিছুই ছিল না যে দোব। একদিন দুর্গা এসে—অনেক কাকুতি-মিনতি ক'রে ব'ললে! কি করব বল!

—হুঁ।....দেবুর একটা কথা মনে পড়িল! নজরবন্দীর জন্য

অনিরুদ্ধের ঘর দুর্গাই তো দারোগাকে ব'লে ভাঙা করিয়ে দিয়েছে শুনলাম।

—হ্যাঁ। নজরবন্দী ছেলেটি বড় ভাল, বাপু। কামার-বউকে মা বলে। গাঁয়ের ছেলেরাও ওর কাছে ভিড় জমিয়ে ব'সে থাকে।

—ব'স তুমি। আমি আসি একবার যতীনবাবুর সঙ্গেই দেখা ক'রে।

পথে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ডাকিল শ্রীহরি। চারিপাশে একটি ছোটখাটো ভিড়ও জমিয়া রহিয়াছে। দেবু অনুমানে বুঝিল, খাজনা আদায়ের পর্ব্ব চলিতেছে। চৈত্র মাসের বারোই-তেরোই, ইংরাজী আটাশে মার্চ্চ সরকার-দপ্তরে রাজস্ব-দাখিলের শেষদিন; তা ছাড়া চৈত্র-কিস্তি, আখেরী।

দেবু বলিল—ও বেলায় আসব ভাইপো।

শ্রীহরি বলিল—পাঁচ মিনিট। গ্রামের ব্যাপারটা দেখে যাও। যেন অরাজক হ'য়েছে।

দেবু উঠিয়া আসিল। দেখিল—বৈরাগীদের 'নেলো'—অর্থাৎ নলিনী হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ও-পাশে তাহার মা কাঁদিতেছে।

শ্রীহরি বলিল—ওই দেখ, ছোঁড়ার কাণ্ড দেখ। আঙুল দিয়া সে দেখাইয়া দিল চণ্ডীমণ্ডপের চুনকাম-করা একটি থাম। চুনকাম করা থামের সাদা জমির উপর কয়লা দিয়া আঁকা এক বিচিত্র ছবি। মা-কালীর এক মুর্ত্তি।

দেবু নেলোকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁরে তুই এঁকেছিস?

নেলো ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—চুনকাম-করা চণ্ডীমণ্ডপের ওপর কি ক'রেছে একবার দেখ দেখি? পাঠ এঁকেছেন।...ইহার পর নেলোকেই সে বলিল—চুনকামের খরচা দে, দিয়ে উঠে যা!

দেবু তখনও ছবিখানি দেখিতেছিল—বেশ আঁকিয়াছে নেলো। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কার কাছে আঁকতে শিখলি তুই?

নেলো রুদ্ধস্বরেই কোনমতে উত্তর দিলে—আপুনি-আপুনি, আজ্ঞে।

—নিজে নিজে শিখেছিস?

শ্রীহরি এই প্রশ্নের উত্তর দিল হ্যাঁ, হ্যাঁ। ছোঁড়ার ওই কাজ হ'য়েছে, বুঝলে কি না! লোকের দেওয়ালে, সিমেণ্টের উঠানে, এমন কি বড় বড় গাছের গায়ে পর্য্যন্ত কয়লা দিয়ে ছবি আঁকবে। ওই নজরবন্দী ছোকরা ওর মাথা খেলে! অনিরুদ্ধের বাইরের ঘরে ছোকরা থাকে, দেখো না একবার তার দেওয়ালটা একেবারে চিত্রি-বিচিত্রিতে ভর্ত্তি। এখন চণ্ডীমণ্ডপের ওপর লেগেছে। কাল দুপুর বেলায় কাজটি ক'রেছে।

দেবু হাসিয়া বলিল—নেলো অন্যায় ক'রেছে বটে, কিন্তু এঁকেছে ভাল, কালীমূর্ত্তিটি খাসা হ'য়েছে।

—নমস্কার, ঘোষ মহাশয়!...ওদিকের সিড়ি দিয়া পথ হইতে উঠিয়া আসিল ডেটিনিউ যতীন। দেবুকে দেখিয়া সে বলিল—এই যে আপনিও র'য়েছেন দেখ্‌ছি! আপনার ওখানেই যাচ্ছিলাম।

—আমিও যাচ্ছিলাম আপনার কাছেই।

দাঁড়ান্, কাজটা সেরে নি। ঘোষ মহাশয়, ওই থামটায় কালি ফেরাতে কত খরচ হবে?

শ্রীহরি বলিল—খরচ সামান্য কিছু হবে বৈকি। কিন্তু কথা তো তা নয়, কথা হ'চ্ছে নেলোকে শাসন করা।

হাসিয়া যতীন বলিল—আমি দু'একজনকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, তাঁরা ব'ললেন—চুন চার আনা, একটা রাজমিস্ত্রীর আধ রোজের

মজুরি চার আনা, একটা মজুরের আধ রোজ দু' আনা। মোট—এই দশ আনা কেমন?

—হ্যাঁ। তবে পাটও কিছু লাগবে পোঁচড়ার জন্যে।

—বেশ, সেও ধরুন দু'আনা। এই বার আনা।...একটি টাকা বাহির করিয়া যতীন শ্রীহরির সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বাকীটা আমায় পাঠিয়ে দেবেন।

সে উঠিয়া পড়িল। দেবুও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। যতীন হাসিয়া বলিল—আমার ওখানেই আসুন, দেবুবাবু; নলিনের আঁকা অনেক ছবি আছে, দেখবেন। এস নলিন—এস!

শ্রীহরি ডাকিল—খুড়ো, একটা কথা।

দেবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বল।

—একটু এধারে এস বাবা। সব কথা কি সবার সামনে বলা চলে?

শ্রীহরি হাসিল। ষষ্ঠীতলার কাছে নির্জ্জনে আসিয়া শ্রীহরি বলিল—গতবার চোত্ কিস্তি থেকেই তোমার খাজনা বাকী র'য়েছে, খুড়ো। এবার সমবৎসর। কিস্তির আগেই একটা ব্যবস্থা ক'রো বাবা।

দেবুর মুখ মুহূর্ত্তে অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। গতকালের কথা তাহার মনে পড়িল—বোধ হইল, শ্রীহরি তাহাকে শাসাইতেছে। সে সংযত-স্বরে বলিল—আচ্ছা, দোব। কিস্তীর মধ্যেই দোব।....

* * *

উনিশ-শো চব্বিশ খৃষ্টাব্দে বিশেষ ক্ষমতাবলে প্রণয়ন-করা আইন—আটক-আইন; নানা গণ্ডীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বিশেষ বিশেষ থানার নিকটবর্ত্তী পল্লীতে রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী-সন্দেহে বাঙালী তরুণদের আটক রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাঙলা সরকারের সেই আটক-আইনের বন্দী—যতীন। যতীনের বয়স বেশী নয়, সতেরো-আঠারো বৎসরের কিশোর, যৌবনে সবে পদার্পণ করিয়াছে।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ, রুক্ষ বড় বড় চুল, ছিপছিপে লম্বা, সর্ব্বাঙ্গে একটি কমনীয় লাবণ্য ; চোখ দু'টি ঝক্-ঝকে, চশমার আবরণের মধ্যে সে দু'টিকে আরও আশ্চর্য্য দেখায়।

অনিরুদ্ধের বাহিরের ঘরের বারান্দায় একখানা তক্তপোষ পাতিয়া, সেইখানে যতীন আসর করিয়া বসে। গ্রামের ছেলের দল তো এইখানেই পড়িয়া থাকে। বয়স্কেরাও সকলেই আসে—তারা নাপিত, গিরীশ ছুতার, গাঁজাখোর গদাই পাল, বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীও আসেন; সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করিয়া বৃন্দাবন দত্তও আসে; মজুর খাটিয়া কোনরূপে বাঁচিয়া আছে তারিণী—সে-ও আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কোন কোনদিন শ্রীহরিও পথে যাইতে-আসিতে এক-আধবার বসে। বাউড়ী-পাড়া, বায়েন-পাড়ার লোকেরাও আসে, গ্রাম্য বধূ ও ঝিউড়ি মেয়েগুলি দূর হইতে তাহাকে দেখে। বুড়ী রাঙাদিদি মধ্যে মধ্যে যতীনের সঙ্গে কথা বলে, কোনদিন নাড়ু, কোনদিন কলা, কোনদিন অন্য কিছু দিয়া সে যতীনকে দেখিয়া আপন মনেই পাঁচালীর একটি কলি আবৃত্তি করে :—

"অক্রুর পাষাণ হিয়া, সোনার গোপালে নিয়া
শূণ্য কৈল যশোদার কোল।"....

যতীনও মধ্যে মধ্যে আপনার মনে গুন্-গুন্ করিয়া আবৃত্তি করে—রবীন্দ্রনাথের কবিতা। দুইটা লাইন এই পল্লীর মধ্যে তাহার অন্তরীণ জীবনে অহরহ গুঞ্জন করিয়া ফেরে—

'সব ঠাঁই মোর ঘরে আছে'।....
'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়।'....

সমগ্র বাংলা দেশে যেন এই পল্লীটির ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে রূপায়িত হইয়া ধরা দিয়াছে তাহার কাছে। এখানে পদার্পণমাত্র গ্রামখানি একমুহূর্ত্তে তাহার আপন ঘরে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার

প্রতিটি মানুষ তাহার ঘনিষ্ঠতম প্রিয়জন, পরমাত্মীয়। কেমন করিয়া এমন হইল—এ তাহার কাছে আশ্চর্য্য লাগে। সহরের ছেলে সে, কলিকাতায় তাহার বাড়ী। জীবনে পল্লীগ্রাম কখনও দেখে নাই। আটক-আইনে গ্রেপ্তার হইয়া প্রথমে কিছুদিন ছিল জেলে; তারপর কিছুদিন ছিল বিভিন্ন জেলার সদরে অথবা মহকুমা সহরে। এই শেষোক্ত সহরগুলি অদ্ভুত। সেখানে পল্লীর আভাস কিছু আছে, কিছু কিছু মাঠ-ঘাট আছে, কৃষি এখনও সেখানকার জীবিকার একটা মুখ্য বা গৌণ অংশ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজও আছে। ঠিক সমাজ নয়—দল; সমাজ ভাঙিয়া—শিক্ষা, সম্মান ও অর্থ-বলের পার্থক্য লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত হইয়াছে; সঙ্কীর্ণ, আত্মকেন্দ্রিক, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। সেখানে পল্লীর আভাস তৈল-চিত্রের রঙের প্রলেপে অবলুপ্ত কাপড়ের আভাসের মত—অস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে, প্রভাব নাই—প্রকাশ নাই।

তাই একেবারে খাঁটি পল্লীগ্রামে অন্তরীণ হইবার আদেশে সে অজানা আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভে সে আশ্বস্ত হইয়াছে; সর্ব্বত্র একটি পরমাশ্চর্য্য স্নেহস্পর্শ অনুভব করিয়াছে। অবশ্য এখানকার দীনতা, হীনতা, কদর্য্যতাও তাহার চোখ এড়ায় নাই। অশিক্ষা তো প্রত্যক্ষভাবে প্রকটিত। কিন্তু তবু ভাল লাগিয়াছে। এখানে মানুষ অশিক্ষিত, অথচ শিক্ষার প্রভাবশূন্য অমানুষ নয়। অশিক্ষার দৈন্যে ইহারা সঙ্কুচিত, কুশিক্ষা বা অশিক্ষার ব্যর্থতার দম্ভে দাম্ভিক নয়। শিক্ষা এখানকার লোকের না থাক্, একটা প্রাচীন জীর্ণ সংস্কৃতি আজও আছে,—অবশ্য মুমূর্ষুর মতই কোন মতে টিকিয়া আছে।

সহরকে সে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। ওইখানেই তো চলিয়াছে মানুষের জয়যাত্রা। কিন্তু সে—মফস্বলের ওই উকিল-মোক্তার-

আমলাসর্ব্বস্ব, কতকগুলা পান-বিড়ি-মনিহারী দোকানদার, ক্ষুদ্র চালের কলওয়ালা, তামাকের আড়ৎওয়ালা ও কাপড়ওয়ালাদের দল প্রধান ছোট সহর নয়। সে সহরের ঊর্দ্ধলোকে—শত শত কলকারখানার চিমনি উদ্যত হইয়া আছে—তপস্বীর ঊর্দ্ধবাহুর মত। অবিশ্বাস্য অপরিমেয় তাহাদের শক্তি; বন্দী দানবের মত যন্ত্রশক্তির মধ্য দিয়া কাজ করিতেছে—উৎপাদন করিতেছে বিপুল সম্পদ-সম্ভার। কিন্তু তন্ময় মরণোন্মুখ পল্লীকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। বিগত যুগের মুমূর্ষু প্রাচীন, যাহার সঙ্গে নব-যুগের পার্থক্য অনেক,—সেই মুমূর্ষু প্রাচীনের সকরুণ বিদায়-সম্ভাষণ যেমন নবীনকে অভিভূত করে, তেমনি এই মরণোন্মুখ প্রাচীন সংস্কৃতির আপ্যায়ন তাহার কছে যেমন মর্ম্মান্তিক—তেমনি মধুর বলিয়া মনে হইতেছে।

যতীন দেবুকে ওই তক্তাপোষের উপর বসাইল—বসুন। আপনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি।

দেবু হাসিয়া বলিল—কাল তো ব'ল্‌লেন—আলাপ হ'য়ে গিয়েছে।

—তা' সত্যি। এইবার আলোচনা হবে। দাঁড়ান, আগে একটু চা করি।···বলিয়া সে অনিরুদ্ধের বাড়ীর ভিতরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল—মা-মণি!

মা-মণি তাহার পদ্ম। মা-মণিটি তাহার জীবনে বিষামৃতের সংমিশ্রণে গড়া এক অপূর্ব্ব-সম্পদ। তাহার বিষের জ্বালা—অমৃতের মাধুর্য্য এত তীব্র যে, তাহা সহ্য করিতে যতীন হাঁপাইয়া উঠে। তাহার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য বেশী নয়, বোধ হয় পাঁচ-সাত বৎসরের। তবু সে তার মা-মণি। এক এক সময়ে যতীনের মনে পড়ে তাহার ছেলেবেলার কথা। খেলাঘরে তাহার দিদি সাজিত মা, সে সাজিত ছেলে। প্রাপ্তবয়সে সেই খেলার যেন পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে। সে যখন এখানে আসে—তখন পদ্ম প্রায় অর্দ্ধোন্মাদ। মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছারোগে চেতনা

হারাইয়া উঠানে, ধূলামাটিতে অসংবৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। অনিরুদ্ধ তাহার পূর্ব্ব হইতেই বাউণ্ডুলে—ভবঘুরে, বাড়ীতে থাকিত না। যতীনকেই অধিকাংশ সময় চোখে-মুখে জল দিতে হইত। তখন হইতেই যতীন ডাকে—মা বলিয়া। মা ছাড়া আর কোন সম্বোধন সে খুঁজিয়া পায় নাই। সেই মা সম্বোধনের উত্তরেই পদ্ম একদিন প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহাকে ডাকিল ছেলে বলিয়া। সেই হইতেই এই খেলাঘর পাতা হইয়াছে। পদ্ম এখন অনেকটা সুস্থ, অহরহ ছেলেকে লইয়াই ব্যস্ত। অনিরুদ্ধের ভাবনা সে যেন ভাবেই না। ক্বচিৎ কখনও আসিলে, তাহাকে যত্নও বিশেষ করে না।

বাড়ীর ভিতরে তখন কলরব চলিতেছিল ; একপাল ছেলে ছুটোপাটি ছুটোছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। পদ্ম একজনের চোখ গামছায় বাঁধিয়া বলিতেছিল—ভাত করে কি ?

টগ্-বগ্ !....ছেলেটি উত্তর দিল।

—মাছ্ করে কি ?

—ছ্যাক ছোঁক।

—হাটে বিকোয় কি ?

—আদা।

—তবে, ধরে আন্ তোর রাঙা রাঙা দাদা।....

কাণামাছি খেলা চলিতেছে। যতীনের কাছে ছেলের দল আসে। যতীন না থাকিলে—তাহারা পদ্মকে লইয়া পড়ে ; পদ্মও যতীনের অনুপস্থিতিতে ছেলেদের খেলার মধ্যে বুড়ী সাজিয়া বসে।...

যতীন আবার ডাকিল—মা-মণি !

পদ্ম উঠিয়া পড়িল,—কি ? চাঁদ-চাওয়া ছেলের আমার আবার কি হুকুম শুনি ?

—চায়ের জলগরম আর একবার।

—হবে না। মানুষ কতবার চা খায় ?

—দেবু ঘোষমশায় এসেছেন। চা খাওয়াতে হবে না ?

—পণ্ডিত ?

—হ্যাঁ।

পদ্ম এক হাতে ঘোমটা টানিয়া দিল—চাপা গলায় বলিল—দি।

যতীন হাসিয়া বলিল—পণ্ডিত বাইরে। ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে ?

—ওই দেখ, তাইতো !···ঘোমটা সরাইয়া দিয়া পদ্ম অপ্রস্তুতের মত একটু হাসিল।

বাহিরে আসিয়া যতীন বলিল—একটা ভি-পি আনতে দেব আমি আপনার নামে।

দেবু একটু বিব্রত বোধ করিল—বেনামীতে ভি-পি—কিসের ভি-পি ? সে বলিল—ভি-পি ?

—হ্যাঁ। খানকয়েক ছবির বই, একটা রঙ-তুলির বাক্স। আমাদের নলিনের জন্য। পুলিশের মারফৎ আনানোর অনেক হাঙ্গামা। নলিন ছবি আঁকতে শিখুক। ওর হাত ভাল।

—তা বেশ। কিন্তু তার চেয়ে, নলিন, তুই পটুয়াদের কাছে শেখ না কেন ? প্রতিমা গড়তে শেখ, রং ক'রতে শেখ !

নলিন ছেলেটা অদ্ভুত লজ্জক, দুই চাবিটি অতি সংক্ষিপ্ত কথা তাহার। সে মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—পটুয়ারা শেখাল না; পয়সা লাগবে।

—পয়সা আমি দেব, তুমি শেখ।

—দু' টাকা ফি-মাসে লাগবে।

দেবু বলিল—আচ্ছা, সে আমি বলে দোব দ্বিজপদ পটুয়াকে। পরশু যাব আমি মহাগ্রামে। আমার সঙ্গে যাবি ?

নলিন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—বেশ!....কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—পয়সা দেবেন ব'লেছিলেন।

যতীন একটি সিকি তাহার হাতে দিয়া বলিল—তা' হলে পণ্ডিত মশায়ের সঙ্গে যাবে তুমি, বুঝলে?

নলিন আবার ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া নীরবেই উঠিয়া চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—এইবার আপনার সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ ক'রব। অনেককে জিজ্ঞেস ক'রেছি, কেউ উত্তর দিতে পারে নি। অন্তত সন্তোষজনক মনে হয়নি আমার।

—কি বলুন?

—আপনাদের ওই চণ্ডীমণ্ডপটি। ওটি কার?

—সাধারণের।

—তবে যে বলে জমিদার মালিক?

—মালিক নয়। জমিদার দেবোত্তরের সেবাই ব'লে চণ্ডীমণ্ডপের রক্ষণাবেক্ষণ করেন তিনি।

—রক্ষণাবেক্ষণও তো, আমি যতদূর শুনেছি, গ্রামের লোকই করে।

—হ্যাঁ, তা' করে; কিন্তু তবু ওই রকম হ'য়ে আসছে আর কি! ওটা জমিদারের সম্মান। তা ছাড়া, শূদ্রের গ্রাম, ব্রাহ্মণ জমিদারই সেবাইৎ হ'য়ে আছেন। আরও ধরুন, গ্রামের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি হয় —দলাদলি হয়—এই কারণেই জমিদারকেই দেবোত্তরের মালিক স্বীকার ক'রে আসা হ'য়েছে। কিন্তু অধিকার গ্রামের লোকেরই।

—তবে প্রজা-সমিতির মিটিং ক'রতে বাধা দিলে কেন জমিদার-পক্ষ?

—বাধা দিয়েছে?

—হ্যাঁ, মিটিং ক'র্‌তে দেয় নি।

দেবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিল—বোধ হয় 'প্রজা-সমিতি' জমিদারের বিরোধী ব'লে দেয় নাই। তা ছাড়া ওটা তো আর ধর্ম্মকর্ম্ম নয়।

—প্রজা-সমিতি—প্রজার মঙ্গলের জন্য; প্রজার মঙ্গল মানে জমিদারের সঙ্গে বিরোধ নয়। কোন কোন বিষয়ে বিরোধ আসে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নয়। আর চণ্ডীমণ্ডপ তো প্রজারাই ক'রেছে, জমিদার ক'রে দেয় নি। জায়গাটা শুধু জমিদারের। সে তো পথের জায়গাও জমিদারের। তা' বলে' প্রজা-সমিতির শোভাযাত্রা চ'লতে পাবে না সে পথে? আর ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়া যদি অধিকার না থাকে, তবে জমিদারের খাজনা আদায়ই বা হয় কি ক'রে ওখানে? দারোগা-হাকিম এলেই বা মজলিশ হয় কেন?

দেবু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহারই মধ্যে ছেলেটি এত সংবাদ লইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে একটা সংশয়ও জাগিয়া উঠিল; চণ্ডীমণ্ডপের স্বত্বাধিকার সত্যই সমস্যার বিষয়! কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—আজ কথাটার উত্তর দিতে পারলাম না আপনাকে।

ভিতরে ঠুক্‌ঠুক্ করিয়া কড়া নাড়ার শব্দ হইল। যতীন বুঝিল—মা-মণি ডাকিতেছে। সে বলিল—আমি আর উঠতে পারছি না। তুমিই দিয়ে যাও, মা-মণি।

পদ্মের বিরক্তির আর সীমা রহিল না।....ছেলেটা যেন কি!

দেবু হাসিয়া কহিল—আমাকে লজ্জা ক'রছে না কি, মিতেনি?

ইহার পর আর বাহির না হইয়া উপায় রহিল না। দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবৃত করিয়া পদ্ম দুই কাপ চা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—তা ছাড়া লোকজন যাঁরাই ওখানে যান, তাঁদের

সাবধান করেন—এ ক'রবে না, ও ক'রবে না। লোকে মেনে নেয়; দুর্ব্বল নিরীহ মানুষ তারা—বোঝে না। টাকা দিয়ে শ্রীহরি ঘোষ মেঝে বাঁধিয়ে দিয়েছেন ব'লে সাধারণের অধিকার নিশ্চয়ই বিক্রী হ'য়ে যায় নি!

দেবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—উপায় কি বলুন? শ্রীহরি ধনী; সে এখন সমস্ত গ্রামেরই শাসনকর্ত্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জমিদার পর্য্যন্ত তার হাতে গোমস্তাগিরি ছেড়ে দিয়েছেন—পত্তনি-বিলির মত সর্ত্ত। ক'রবেন কি বলুন?

যতীন হাসিয়া বলিল—আমি তো কিছু ক'রব না; আমার ক'রবার কথাও নয়। ক'রতে হবে আপনাকে, দেবুবাবু। নইলে উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রছিলাম কেন?

দেবু স্থিরদৃষ্টিতে যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীনও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, সম্মুখের দিকে চাহিয়া।

সহসা কে ডাকিল—বাবু!

কে? যতীন ও দেবু দু'জনেই ফিরিয়া দেখিল—ভিতরের দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে দুর্গা!

দেবু হাসিয়া বলিল—দুর্গা?

—হ্যাঁ।

—কি খবর?

—কামার-বউ জিজ্ঞেস ক'রেছে, উনান ধরিয়ে দেবে কিনা? রান্নাবান্না—?

যতীন বলিল—হ্যাঁ। তা উনান ধরাতে বল-না।

—কি রান্না ক'রবেন?

—যা হয় ক'রতে বল।

সবিস্ময়ে দুর্গা বলিল—ক'রতে বলব কাকে?

—মা-মণিকে বল। না হয়—তুমিই দু'টো চড়িয়ে দাও।

দুর্গা মুখে-কাপড় দিয়া হাসিয়া সারা হইল। আপনি একটুকুন ক্ষ্যাপা বটেন বাবু।

—কেন দোষ কি? যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, সে যে জাতই হোক—তার হাতে খেতে দোষ নাই। জিজ্ঞেস কর পণ্ডিতমশায়কে।

—হ্যাঁ, পণ্ডিতমশায়?

দেবু হাসিয়া বলিল—জেলখানায় আমাদের যে রান্না ক'রত সে ছিল হাড়ি! যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—নামটি ছিল বিচিত্র —গান্ধারী হাড়ি।

যতীন বলিল—দ্রৌপদী হ'লেই ভাল হ'ত। চলুন, চান করতে যাব নদীতে।....সে জামাটা খুলিয়া ফেলিয়া গামছা টানিয়া লইল।

* * * *

দেবু মনে মনে স্থির করিয়াছিল—আর সে পাঁচের হাঙ্গামায় যাইবে না। জেল হইতে সেই সঙ্কল্প করিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু যতীন ছেলেটি তাহার সব সংকল্প ওলোট-পালোট করিয়া দিতে বসিয়াছে।

বাড়ী হইতে তেল মাখিয়া গামছা লইয়া, যতীনের সহিত নীরবে সে পথ চলিতেছিল। চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে আসিয়াই দেখা হইল— বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরীর সঙ্গে। লাঠি হাতে ঠুক্-ঠুক্ করিয়া বৃদ্ধ চণ্ডীমণ্ডপ হইতেই নামিয়া আসিলেন। বৃদ্ধ যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—চানে চলেছেন বুঝি?

যতীন হাসিয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—আপনি তো তেল মাখেন না শুনি?

—আজ্ঞে না।

—তবে পেনাম ··ঈষৎ হেঁট হইয়া বৃদ্ধ নমস্কার করিলেন।

যতীন একেবারে শশব্যস্ত হইয়া বলিল—না-না। ওকি? আপনাকে কতবার বারণ ক'রেছি আমি। বয়সে আমি আপনার চেয়ে—

কথার মাঝখানেই চৌধুরী মিষ্ট-হাসিয়া বলিলেন—শালগ্রামের ছোট বড় নাই, বাবা। আপনি ব্রাহ্মণ।

—না-না। ওসব আপনাদের সেকালে চ'লত, সেকাল চ'লে গেছে।

হাসিটি চৌধুরীর ঠোঁটের ডগায় লাগিয়াই থাকে। হাসিয়া তিনি বলিলেন—এখনকার কাল নতুনই বটে বাবা। সে কালের কিছু আর রইল না। কিন্তু আমরা জনকতক যে—সে কালের মানুষ অকালের মতন পড়ে র'য়েছি একালে; বিপদ যে সেইখানে!

বৃদ্ধের কথা কয়টি যতীনের বড় ভাল লাগিল। বলিল—সে-কালের গল্প বলুন আপনাদের।

—গল্প? হ্যাঁ, সেকালের কথা এ-কালে গল্প বৈকী। আবার ওপারে গিয়ে যখন কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা হবে, তখন একালে যা দেখে যাচ্ছি ব'ললে, সেও তাঁদের কাছে হবে গল্প। সেকালে আমরা গাই বিয়োলে দুধ বিলোতাম, ক্রিয়াকর্ম্মে বাসন বিলোতাম, পথের ধারে আম-কাঁটালের বাগান ক'রতাম, সরোবর-দীঘি কাটাতাম, দেবতা প্রতিষ্ঠে ক'রতাম, মহাপুরুষেরা ঈশ্বর দর্শন ক'ত্তেন,—সে আজ আপনাদের কাছে গল্প। আর অজকে আকাশে উড়ো-জাহাজ, জলের তলায় ডুবো জাহাজ, বেতারে খবর আসা, টাকায় দু'সের চাল হরেক রকম নতুন ব্যামো, দেবকীর্ত্তিলোপ,—এও সেকালের লোকের কাছে গল্প।

—আপনি দীঘি কাটিয়েছেন চৌধুরী মশায়?

—আমার কপাল, ভাঙা-ভাগ্যি, বাবা। তবে আমার আমলে বাবা কাটিয়েছেন—তখন আমি ছোট, মনে আছে। এক এক ঝুড়ি

মাটি—দশগণ্ডা কড়ি। একজন লোক কড়ি নিয়ে ব'সে থাকত—সে ঝুড়ি গুণে কড়ি দিত; বিকেলে সেই কড়ি নিয়ে পয়সা দিত।

—আধ পয়সা ঝুড়ি বলুন।

—হ্যাঁ।...হাসিয়া চৌধুরী বলিলেন—আমাদের কথা তো আপনারা তবু বুঝতে পারেন গো, আমরা যে আপনাদের কথা বুঝতেই পারি না! আচ্ছা বাবা, এত যে সব স্বদেশী হাঙ্গামা, বোমা-পিস্তল ক'রছেন—এ সব কেন ক'রছেন? ইংরেজ রাজত্বকে তো আমরা চিরকাল রাম-রাজত্ব ব'লে এসেছি।

একমুহূর্ত্তে যতীনের চোখ দুইটা টর্চ্চের আলোকের মত জ্বলিয়া উঠিল এক প্রদীপ্ত আভায়; পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু সে দীপ্তি নিভিয়া গেল; হাসিয়া বলিল—বোমা-পিস্তল আমি দেখি নি। তবে হাঙ্গামা হ'চ্ছে কেন জানেন? হাঙ্গামা, হ'চ্ছে ওই দীঘি-সরোবর কাটানো আপনাদের কালকে ওরা নষ্ট ক'রেছে ব'লে।

বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—বুঝতে ঠিক পারলাম না। হ্যাঁ গো, পণ্ডিত, আপনি এমন চুপচাপ যে?

চিন্তাকুলভাবেই হাসিয়া দেবু বলিল—এম্নি।

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বৃদ্ধ দেবুকে বলিলেন—আপনার কাছে আসব একবার ও-বেলায়।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ। কথা আছে। আপনি ছাড়া আর ব'লবই বা কাকে?

—অসুবিধে না হয় তো এখুনি বলুননা। আবার আসবেন কষ্ট ক'রে?....দেবু উৎকণ্ঠিত হইয়াই প্রশ্ন করিল।

যতীন বলিল—আমি বরং একটু এগিয়ে চলি।

—না-না-না।....বৃদ্ধ বলিলেন—বেলা হ'য়েছে ব'লেই ব'লছিলাম;

বুড়ো বয়সে আমার আবার লুকোবার কথা আছে নাকি?....চৌধুরী হাসিয়া উঠিলেন।—আপনি বোধ হয় শুনেছেন, পণ্ডিত?

—কি বলুন তো?

—গাজনের কথা।

—না, কিছু শুনি নি তো?

—গাজনের ভক্তরা ব'লছে এবার তারা শিব তুলবে না।

—শিব তুলবে না? কেন?

—ও, আপনি তো গতবার ছিলেন না। গতবার থেকেই সূত্রপাত। সেটেলমেণ্টের 'খানাপুরীতে' শিবের জমি হারিয়ে গেল।

—হারিয়ে গেল?

—জমিদার সরকার বের ক'রতে পারলে না। বের ক'রবে কি, পুরোহিতের জমি নিজেরাই বন্দোবস্ত ক'রেছে মাল ব'লে। এখন শিবের পূজোর খরচা জিম্মা ছিল মুকুন্দ মণ্ডলের কাছে। শিবোত্তর জমি ভোগ ক'রত ওরা। এখন মুকুন্দের বাবা সে জমি বেচে দিয়ে গিয়েছে মাল ব'লে। জমিদারও খাজনা খারিজ ফি'র জন্য তা স্বীকার করেছে। মুকুন্দ এত সব জানত না, সে শিবের খরচ জুগিয়েই আসছিল; এখন জরীপের সময় যখন দেখলেন শিবোত্তর জমিই নাই, তখন সে ব'ললে—জমিই যখন নাই, তখন খরচও আমি দেব না। গতবার কোনও রকমে চাঁদা করে পূজো হয়েছে। এবার ভক্তরা ব'লছে, ও-রকম যেচে-মেগে পূজোতে আমরা নাই। তাই একবার শ্রীহরির কাছে এসেছিলাম—পূজার কি হবে তাই জানতে। এখনও বেঁচে আছি—বেঁচে থাকতেই গাজন বন্ধ হবে বাবা!

—শ্রীহরি কি ব'ললে?

—জমিদারের পত্র দেখালেন—জমিদার খরচ দেবেন না। পূজো বন্ধ হয় হোক।

—হুঁ।

চৌধুরী বলিলেন—গতবার থেকে পাতু ঢাক বাজায় নাই, পাতু জমি ছেড়ে দিয়েছে, বায়েন অবশ্য হবে। অনিরুদ্ধ বলি করে নাই। বলে, একটা পাঁঠার ঠ্যাং নিয়ে ও-জমি করতে পারব না; ক'রব না....শেষে ও-ই থোঁড়াঠাকুর বলি করে। এবার সে ব'লেছে—বলি ক'রতে হ'লে দক্ষিণে চাই। নানান রকমের গোল লেগেছে পণ্ডিত। এ সবের মীমাংসা তো পথে হয় না। তাই ব'লছিলাম—ও-বেলায় আসব।

দেবু হাঁপাইয়া উঠিতেছিল, সে বলিল—এর আর আমি কি ক'রব চৌধুরীমশায় ?

—এ কথা আপনার উপযুক্ত হ'ল না, পণ্ডিত; আপনার মত লোক যদি না করে, তবে কে ক'রবে ?

দেবু স্তব্ধ হইয়া গেল।

চৌধুরী কালীপুরের পথে বিদায় লইল। দেবু ও যতীন—মাঠ অতিক্রম করিয়া গিয়া নামিল ময়ূরাক্ষীর গর্ভে। দেবু নীরবেই স্নান করিল, নীরবেই গ্রাম পর্য্যন্ত ফিরিল। যতীন দুই-চারিটা কথা বলিয়া উত্তর না পাইয়া গুণ-গুণ করিয়া কবিতা আবৃত্তি করিল।

পাশে যারা আছে তাদেরই হারায়ে ফিরে প্রাণ সারা গগনে।
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে ক'ব তা' কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণদলে....

* * *

বাসায় ফিরিয়া যতীনের সে এক বিপদ। পদ্ম মূর্চ্ছিত হইয়া জলে-কাদায় উঠানের উপর পড়িয়া আছে। মাথার কাছে বসিয়া কেবল দুর্গা বাতাস করিতেছে। তাহারও সর্ব্বাঙ্গে জল-কাদা লাগিয়াছে।

ও-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছে মাতাল অনিরুদ্ধ। মাথাটা বুকের উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছে, আপন মনেই বিড়্ বিড়্ করিয়া সে বকিতেছে। রান্না-বান্নার কোন চিহ্নই নাই।

দুর্গা বলিল—আপনারা চ'লে গেলেন, কামার-বউ একেবারে ক্ষ্যাপার মতন হয়ে আমাকে ব'ললে—বেরো, বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে বেরো। আমার সঙ্গে দু'-চারটে কথা কাটাকাটি হ'য়ে গেল। আমি মশায়, বাড়ী যাব ব'লে যেই এখান থেকে বেরিয়েছি, আর শব্দ হ'ল দড়াম্ ক'রে। পেছন ফিরে দেখি এই অবস্থা। ছুটে এসে জল দিয়ে বাতাস ক'রে কিছুই হ'ল না। খানিক পরে হঠাৎ কম্মকার এল; এসে, ওই দেখুন না, খানিকটা চেঁচামেচি ক'রে ওই বসেছে—এইবার মুখ গুজ্ড়ে পড়বে।

দেবু অনিরুদ্ধকে ঠেলা দিয়া ডাকিল—অনিরুদ্ধ!

একটা গর্জ্জন করিয়া অনিরুদ্ধ চোখ মেলিয়া চাহিল—এ্যাও!… কিন্তু দেবুকে চিনিয়া সে সবিনয়ে বলিল—ও, পণ্ডিত!

হ্যাঁ, শুন্‌ছ?

আলবৎ, একশবার শুনব, হাজারবার শুনব!….পরক্ষণেই সে হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমার অদেষ্ট দেখ পণ্ডিত; তুমি বন্ধুনোক, ভাল নোক,—গাঁয়ের সেরা নোক; পাতঃস্মরণীয় নোক তুমি—তুমি দেখ আমার শাস্তি। পথের ফকির আমি! আর ওই দেখ পদ্মর অবস্থা।

—জগনকে ডেকে আন অনিরুদ্ধ। ডাক্তার ডাক।

অতি কঠিন-স্বরে অনিরুদ্ধ বলিল—ডাক্তার কি ক'রবে, ভাই? এ ওই ছিরে—ছিরে শালার কাজ! আমার গুপ্তি কই? আমার গুপ্তি? খুন ক'রব শালাকে। আর ওই দুগ্‌গাকে। ওই পদ্মকে। দুগ্‌গা আমাকে বাড়ী ঢুকতে দেয় না পণ্ডিত আমার। সঙ্গে ভাল করে' কথা কয় না।

তারপর সে আরম্ভ করিল অশ্লীল গালিগালাজ। দুর্গা নতশির হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল!

দেবু বলিল—যতীনবাবু, আসুন, আমার ওখানেই দু'টো খাবেন। আমরা গিয়ে বরং জগনকে ডেকে দেব'খন।

দেবু ও যতীন চলিয়া যাইতেই অনিরুদ্ধ আবার আরম্ভ করিল—আর, ওই নজরবন্দী ছোঁড়াকে কাটব। ওকেই আগে কাটব। ও-ব্যাটাই আমার ঘরের—

দুর্গা এবার ফোঁস করিয়া উঠিল—এই দেখ কম্মকার, ভাল হবে না ব'লছি। ভালমানুষের ছেলেকে নিয়ে আকথা কুকথা ব'ল না ব'লছি!

অনিরুদ্ধ চৌকাঠের উপর নিষ্ঠুরভাবে মাথা ঠুকিতে আরম্ভ করিল—ওই নে, ওই নে, ওই নে।

দুর্গা বারণ পর্য্যন্ত করিল না।

কুড়ি

'ফাগুনে আট চৈত্রের আট
সেই তিল দায়ে কাট।'

ফাগুনের দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে চৈত্রের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তিলের বীজ ছড়াইলে সেবার চূড়ান্ত ফসল হয়; সে তিল-ফসল দা' ভিন্ন কাস্তেতে কাটা যায় না। এবার তিল নাবি, সবে এই ফুল ধরিতেছে, পাকিতে বৈশাখের প্রথম সপ্তাহ। কাজেই ফসল হইবে না।

ভোরবেলায় মাঠ ঘুরিয়া দেবু ফিরিতেছিল। এ বৎসর মাঘ মাস হইতে আর বৃষ্টি হয় নাই; বৃষ্টির অভাবে এখনও কেহ আখ লাগাইতে পারে নাই। ময়ূরাক্ষীর জল একেবারে শীর্ণ ধারায় ওপারে জংসন সহরের কোল ঘেঁসিয়া বহিতেছে; বাঁধ দিয়া জল এপারে আনিতে পারিলে সিচ্ করিয়া চাষের কাজ চলিত। কিন্তু এ বাঁধ

বাঁধা বড় কষ্টসাধ্য। এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত ময়ূরাক্ষীর গর্ভে বাঁধ দিতে হইবে; অন্তত চার-পাঁচ হাত উঁচু না করিলে চলিবে না। সে করিবে কে? দুই-তিনখানা গ্রামের লোক সমবেত না হইলে সম্ভব নয়। এখন আখ লাগাইলে সে আখের বিনাশ থাকিত না; বর্ষা পড়িবার পূর্ব্বেই হাত দু'য়েক না হোক; অন্তত দেড় হাত উঁচু হইয়া উঠিত। পটোল লাগানোও হইল না। 'পটোল রুইলে ফাল্গুনে ফল বাড়ে দ্বিগুণে।' শ্রীহরি কিন্তু সব লাগাইয়া ফেলিয়াছে। আপনার জমিতে দুই-তিন কাঁচা কুয়া কাটাইয়া, 'ঢেড়ায়' জল তুলিয়া সিচনের ব্যবস্থা করিয়াছে। শ্রীহরির কুয়া হইতে জল লইয়া ভবেশ-হরিশের কাজ হইয়াছে।

দেবু ভাবিতেছিল একটা কুয়া কাটাইবার কথা। পটোল যাক, কিন্তু আখ না লাগাইলে কি করিয়া চলিবে? বাড়ীতে গুড় না থাকিলে চলে? ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে অল্প খুঁড়িলেই জল অতি সহজে পাওয়া যাইবে; আট দশ হাত গর্ত্ত করিলেই চলিবে। টাকা পনেরো খরচ। কিন্তু এদিকে যে বিলুর হাতের মজুত টাকা সব শেষ হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু ধার হইয়া আছে। শ্রীহরির স্ত্রী গোপনে ধার দিয়াছে। দুর্গার মারফতে দোকানেও কিছু ধার হইয়া আছে। ধান এবার ভাল হয় নাই। মজুত যাহা আছে —বিক্রী করিতে ভরসা হয় না। সম্মুখে বর্ষা আছে, চাষের খরচ —সংসার খরচ—অনেক দায়িত্ব। গম-যব—তা-ও ভাল হয় নাই। গম দেড় মণ, যব মাত্র তিরিশ সের। কলাই যাহা হইয়াছে— সে-সংসারেই লাগিবে। আর স্কুলের চাকরী নাই, মাস-মাস নগদ আয়ের সংস্থান গিয়াছে। এখন সে কি করিবে? অথচ এই অবস্থায় গোটা গ্রামটাই যেন তাহাকে টানিতেছে—সহস্র সমস্যা লইয়া। যতীনের কথা মনে হইল; দ্বারকা চৌধুরীর কথা মনে হইল।

গ্রামে ঢুকিতেই দেখা হইল—ভূপালের সঙ্গে। চৌকিদারী পেটিটা

কাঁধে ফেলিয়া সে সকালেই বাহির হইয়াছে ভূপাল প্রণাম করিল—পেণাম।

প্রতি নমস্কার করিয়া দেবু চলিয়া যাইতেছিল, ভূপাল সবিনয়ে বলিল—পণ্ডিতমশায়!

—আমাকে কিছু বলছ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বাড়ীতে, ফিরে আসছি।

—কি? বল?

—আজ্ঞে, খাজনা আর ইউনান বোর্ডের ট্যাক্স।

—আচ্ছা, পাবে।

ভূপাল খুসী হইয়া বলিল—এই তো মশায়, মানুষের মতন কথা! তা' না—ডাক্তোর-বাবু তো মারতে এলেন। ঘোষাল-মশাই ব'লে দিলে—নেহি দেঙ্গা। আর সবাই তো ঘরে লুকিয়ে ব'সে থাকছে, মেয়েছেলেতে ব'লেছে—বাড়ীতে নাই। ইদিকে আমি গাল খাচ্ছি।

হাসিয়া দেবু বলিল—না থাকলেই মানুষকে চোর সাজাতে হয় ভূপাল।

—ই আপনি ঠিক ব'লেছেন।...ভূপাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কার ঘরে কি আছে বলুন? গোঠা মাঠটার ধানই তো ঘোষ মশাইয়ের ঘরে এসে উঠল গো। বর্ষার ধান শোধ দিতেই তো সব ফাঁক হ'য়ে গেল। সত্যি লোকে দেয় কি ক'রে? কিন্তু আমিই বা করি কি বলুন? আমারই হইছে মরণের চাকরি!....

বাড়ীতে আসিয়া দেবু দেখিল—বিলু তাহার জন্য চা করিয়া বসিয়া আছে। সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এ কি!

বিলু লজ্জিতভাবেই বলিল— দেখ দেখি হ'য়েছে কিনা। কামার-বউকে শুধিয়ে এলাম। নজরবন্দীর চা কামার-বউ করে কি না!

—তা না হয় হ'ল। কিন্তু ক'রতে ব'ললে কে?

—তুমি যে ব'ললে—জেলে রোজ নজরবন্দীদের কাছে খেতে।

—খেতাম। কিন্তু তাই ব'লে এখনও খেতে হবে—তার মানে কি? না, আর খরচ বাড়িয়ো না, বিলু।

—বেশ। এক কৌটো চা আনিয়েছি, সেটা ফুরিয়ে যাক, তারপর আর খেয়ো না।

—এক কৌটো চা আনিয়েছ?

—দুর্গা এনে দিয়েছে কাল সন্ধ্যে বেলা।

দেবুর ইচ্ছা হইল—চায়ের বাটিটা উপুড় করিয়া ফেলিয়া দেয়। কিন্তু বিলু ব্যথা পাইবে বলিয়া সে তাহা করিল না; বলিল—আজ ক'রেছ, কিন্তু কাল থেকে আর করো না। চা'র কৌটোটা থাক এখন, কেউ এলে—কি বর্ষায়-বাদলায় সর্দ্দি করলে খাওয়া যাবে।

—না।

দেবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—মানে?

—তোমার কষ্ট হবে।

—হবে না।

—হবে, আমি জানি।

—কি আশ্চর্য্য!...বিরক্তিতে বিস্ময়ে দেবু বলিল—আমার কষ্ট হবে কিনা আমি জানব না, তুমি জানবে?

—বেশ। ক'রব না চা।...মুহূর্ত্তে বিলুর চোখ দু'টি জলে ভরিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া সে চলিয়া গেল।

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। এই বোধ হয় তাহাদের জীবনে প্রথম দ্বন্দ্ব। বিলুকে আঘাত দেওয়ার দুঃখ বড় মর্ম্মান্তিক হইয়া দেবুর অন্তরে বাজিল।...

—মুনিব মশায়! দেবুর কৃষাণ আসিয়া দাঁড়াইল।

—কি রে ?

—আজ্ঞে, এবার তো একখানা কোদাল না হ'লে চলবে না।

—নতুন চাইই ? লোহা চাপিয়ে হবে না ?

—না, আজ্ঞে। গেল বারই লাগ্‌ত, তা' আপুনি ছিলেন না, লোহা দিয়ে কোন রকমে চালিয়েছি; ক্ষ'য়ে এই এতটুকুন হ'য়ে গেয়েছে। সার কেটে পালটানোই যাচ্ছে না।

—সার কাটছ নাকি ? জল দিচ্ছ তো ? চল দেখি।

চৈত্র মাসে 'সার' প্রস্তুতের গর্ত্তে সঞ্চিত আবর্জ্জনাগুলিকে কোদাল দিয়া উপরের নূতন না-পচা আবর্জ্জনা নীচে ফেলিয়া, নীচের পচা আবর্জ্জনা, যাহা 'সারে' পরিণত হইয়াছে—সেগুলিকে উপরে দেওয়ার বিধি, সঙ্গে সঙ্গে ভারে ভারে জল। দেবুর বাড়ীর সার কোনমতে কাটিয়া পাল্‌টানো হইয়াছে। কৃষাণটি কোদালটা দেখাইল। সত্যই সেটা ক্ষয় পাইয়া ছোট হইয়া গিয়াছে, উহাতে চাষের কাজ চলিবে না। চাষের কাজে ভারী বড় কোদাল চাই। সেকালে শক্তিমান চাষীরা যে কোদাল চালাইত, তাহার ওজন পাঁচ সেরের কম নয়, সাত-আট সের ওজনের কোদাল চালাইবার মত সক্ষম চাষীও অনেক ছিল।

দেবু বলিল—বেশ কোদাল একখানা—কি ক'রবে, বয়াত দিয়ে করাবে, না, কিনবে ?

—কেনা জিনিস ভাল হয় না, তবে সস্তা বটে।

—কিন্তু কামার কোথা ? অনিরুদ্ধ তো কাজের বার হ'য়েছে। অন্য কামার যাকেই দেবে—কাল দোব ব'লে দু-মাসের আগে দেবে না।

—তবে তাই কিনেই দেন। আর শন্ চাই। হালের 'জুতি' চাই। রাখালটা ব'লছিল—গরুর দড়িও ছিঁড়েছে।

দেবু একটা কাজ পাইয়া খুসী হইল। শন্ পাকাইয়া দড়ি করার কাজ—পল্লীগ্রামে নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম—বুড়ার কাজ। সে তখনই ঢেঁড়া-শন্

লইয়া আসিল দড়ি পাকাইতে পাকাইতে সে ভাবিতেছিল—কি করিবে সে ?

কৃষাণ কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া দাঁড়াইল। আর একটা কথা ব'লছিলাম কি, মুনিব-মশায়।

—কি, বল ?

—পাড়ার লোকে সবাই আসবে আপনার কাছে! তা' আমাকে ব'লেছে, তু ব'লে রাখিস্ পণ্ডিতমশায়কে।

—কি, ব্যাপার কি ?

আজ্ঞে চণ্ডীমণ্ডপ আটচালা ছাওয়াতে আমরা বেগার দি। তা' এবার ডাক্তোরবাবু, ঘোষাল—সব কমিটি ক'রছেন, ওঁরা বল্‌ছেন—পয়সা নিবি তোরা। বেগার ক্যানে দিবি ? চণ্ডীপণ্ডপ জমিদারের, জমিদারকে খরচ দিতে হবে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল। আপনার গৃহকর্ম্মে মন দিয়া দড়ি পাকাইতে বসিয়া সে ভবিষ্যতের কথা ভবিতেছিল—ভাবিতেছিল—একটা দোকান করিবে সে। কিছু না করিলে সংসার চলিবে কিসে ?

কৃষাণটা আবার বলিল—আমরা তাই ভাবছি। ডাক্তোরবাবু কথাটি মন্দ বলেন নাই; 'চণ্ডীমণ্ডপে জমিদারের কাছারি হয়, ভদ্দনোকের মজলিস হয়, তোদের সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপের 'লেপ চ' (সংস্রব) কি ? বিনি পয়সায় ক্যানে খাটবি ?' আবার ওদিকে ঘোষ মশায় লোক পাঠাচ্ছেন—কবে বেগার দিবি ? ঘোষ মশায় গাঁয়ের মাথার নোক, গোমস্তা বটে, ওঁর কথাই বা ঠেলি কি ক'রে ? তার ওপর গ্রাম-দেবতাও বটে। তাই সব ব'লছে পণ্ডিত মাশায়ের কাছে যাব। উনি যেমনটি ব'লবেন, তেমনটি শিরোধাষ্য আমাদের।

দেবুর মন-প্রাণ ঠিক গত কল্যকার মতই হাঁপাইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কৃষাণটি ডাকিল—মুনিব-মাশায় ?

—আমি এখন কিছু ব'লতে পারলাম না, নোটন।

—আপনি যা' ব'লবেন আমরা তাই ক'রব। সে আমাদের ঠিক হ'য়ে রইচে।....সে উঠিয়া গেল। দেবুর হাতের শন্-টেঁড়া নিশ্চল হইয়া গিয়াছিল—সে সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

চণ্ডীমণ্ডপের লোকজনের সাড়া উঠিতেছে। সেখানে খাজনা আদায় চলিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে খাতকদের কাছে শ্রীহরির পাওনার হিসাবও চলিতেছে। আখেরি কিস্তি, বৎসরের শেষ। তামাদি যাহাদের, তাহাদের উপর নালিশ হইবে। শ্রীহরির পাওনা হিসাব করিয়া উশুল বাদে যাহা থাকিবে, আগামী বৎসরে তাহার জের চলিবে; যাহার উশুল নাই, তাহার আসল-সুদ এক হইয়া আগামী বৎসরের জন্যে আসল হইবে।

শ্রীহরির গোয়াল-ঘরগুলি ছাওয়ানো হইতেছে। চালের উপর ঘরামিরা কাজ করিতেছে। চাষীদের ঘর-ছাওয়ানোর কাজ প্রায় হইয়া গিয়াছে। সকলে নিজেরাই বাড়ীর কৃষাণ-রাখাল লইয়া ঘর ছাওয়াইয়া লয়। দেবুরও অবশ্য ছাওয়ানোর কাজ না-জানা নয়। কিন্তু পণ্ডিতি গ্রহণ করিয়া আর সে একাজ করে নাই। এবার করিতে হইবে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

—সালাম, পণ্ডিতজী !....ইছু সেখ পাইকার আরও দুই-তিন জনের সঙ্গে পথ দিয়া যাইতেছিল; দেবুকে দেখিয়া সে সম্ভাষণ করিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে তাহার সঙ্গীরাও সম্ভাষণ করিল—সালাম !

—সেলাম। ভাল আছ, ইছু ভাই ? তোমরা ভাল আছ সব ?

—হ্যাঁ। আপনি সরীক্ ছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—তা'—আপনাকে আমরা হাজারবার সালাম ক'রেছি। হ্যাঁ—মরদের বাচ্ছা মরদ বটে। মছ্‌জেদে আমাদের হামেশাই কথা হয় আপনকার। মন্নু মিঞা, খালেক ছায়েব, গোলাম মের্জ্জা আসবে একদিন আপনকার সাথে মোলাকাৎ করতে।

দেবু প্রসঙ্গটা পাল্টাইয়া দিল—কোথার এসেছিলে?

—এই গাঁয়েই বটে। কিস্তীর সময়—ছাগল, গরু দু'চারটে বেচবে তো। তা' ধরেন—এ হ'ল আমার কেনাবেচার গাঁও—তাই টাকাকড়ি নিয়ে এসেছিলাম। আর কেনা তো উঠেই গিয়েছে। কিনুনেওয়ালা হ'য়ে গেল। আপনার তো একটা বলদ বুড়ো হ'য়েছে পণ্ডিতমাশায়; আপনি ল্যান ক্যানে একটা বলদ।

—এবার আর হয় না, ইছু ভাই।

—আপনি ল্যান, বুড়া বলদটা দ্যান আমাকে, বাকী যা থাকছে—দিবেন আমাকে ইয়ার পরে। না-হয় কিছু ধান ছেড়ে দ্যান, ধানের পাইকার আমার সাঁথে।

দেবু হাসিল।—না ভাই, থাক্।

—আচ্ছা, তবে থাক্।

ইছুর দল সালাম করিয়া চলিয়া গেল। পাকা ব্যবসাদার ইছু, মানুষের টাকার প্রয়োজনের সময় সে টাকা লইয়া উপস্থিত হইবেই। কাহার বাড়ীতে কোন্ জন্তুটি মূল্যবান্ সে তাহার নখাগ্রে। কিন্তু মন্নু মিঞা, খালেক সাহেব, গোলাম মির্জ্জা তাহার সহিত দেখা করিতে আসিবে কেন? সে মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করিল। ইহারা সম্রান্ত লোক, বড় চাষী-ব্যবসায়ী।

রাখাল ছোঁড়া আসিয়া দেবুর শিশুটিকে নামাইয়া দিয়া বলিল—আপুনি একবার ল্যান, মুনিব-মাশায়। আমাকে কিছুতেই ছাড়ছে না। গরু চরাইতে যাবে আমার সাথে।...ছোঁড়াটা হি-হি করিয়া হাসিতে

হাসিতে খোকাকে বলিল—লেকা-পড়া কর বাবার কাছে গরু চরাইতে যেতে নাই। ছি!

দেবু সাগ্রহে খোকাকে বুকে তুলিয়া লইল।

ছেলেটাও তেমনি, বিলু তাহাকে বেশ তালিম দিয়াছে, সে গম্ভীর মুখে আরম্ভ করিল—ক—ল কলো,ক—ল কলো!

* * * *

কি হচ্ছে পণ্ডিত!....অনিরুদ্ধ আসিয়া বসিল। এখন সে প্রকৃতিস্থ। মুখে মদের সামান্য গন্ধ উঠিতেছে, কিন্তু মাতাল নয়। হাতে একটা লোহার টাঙ্গি।

হাসিয়া দেবু বলিল—চেতন হ'য়েছে, অনি ভাই?

কোন লজ্জা বোধ না করিয়া অনিরুদ্ধ হাসিয়া বলিল—কাল একটুকু বেশী হ'য়েছিল বটে।

দেবু বলিল—ছি, অনি ভাই! ছি!

অনিরুদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তারপর অকস্মাৎ খানিকটা হাসিয়া বলিল—ও তুমি জান না, দেবু ভাই। রস তুমি পাও নাই—তুমি বুঝবে না।

তিরস্কার করিয়া দেবু বলিল—তোমার জমি নীলেমে উঠেছে, কি নীলাম হ'য়েছে, ঘরে পরিবারের অসুখ, আর তুমি মদ খেয়ে বেড়াও—পয়সা নষ্ট কর?

—পয়সা আর বেশী খরচ আমি করি না, এখন 'পচাই মদ' খাই। এখন জমি নীলেমের কথাই তোমাকে ব'লতে এসেছি। আর পরিবারের অসুখ তো আমি কত ভুগব বল?

—তুমি তো এমন ছিলে না অনি ভাই?

—কে জানে? মদ তো আমি বরাবরই একটু-আদটু খাই। আমি তো অন্যায় কিছু বুঝতে পারি না।

—বুঝতে পার না! পৈত্রিক ব্যবসা তুলে দিলে। ছোটলোকের মত পচাই ধ'রেছ। যেখানে-সেখানে খাও—শোও!

—কি ক'রব? অনি কামারের দা, ক্ষুর, গুপ্তি—কিনবে কে? কোদাল-কুড়ল-ফাল, তাও এখন বাজারে মেলে। সস্তা। গাঁয়ে কাজ ক'রলে শালারা ধান দেয় না। কি ক'রব? আর পচাই? পয়সায় কুলোয় না—কি ক'রব?

—কি ক'রবে? তোমার বোধশক্তিও লোপ পেয়েছে, অনি ভাই?

—কে জানে!

—দুর্গার ঘরে খাও অনি ভাই? তার ঘরে তুমি রাত কাটাও?

—দুর্গার নাম ক'র না পণ্ডিত। নেমকহারাম, পাজী, শয়তানের একশেষ! আমাকে আর ঘরে ঢুকতে দেয় না।

অনিরুদ্ধের এই নির্লজ্জ স্বীকারোক্তিতে দেবু চুপ করিয়া রহিল।

অনিরুদ্ধ বলিয়াই গেল—জান পণ্ডিত, দুর্গার জন্তে আমি জান্ দিতে পারতাম; এখনও পারি। দুর্গাই আমাকে নিজে থেকে ডেকেছিল। তখন আমার পরিবার পাগল। মিছে কথা ব'লব না, সে সময় দুর্গা আমার পরিবারের সেবা পর্য্যন্ত ক'রেছে, টাকাও দিয়েছে। দারোগা ওর এককালের আশনাইয়ের লোক—দারোগাকে ব'লে নজরবন্দীর জন্তে আমার ঘরখানা ভাড়া করিয়ে দিয়েছে। মাসে দশ টাকা ভাড়া। কিন্তু ওর সব চোখের নেশা। যাকে যখন ভালবাসে। এখন ওই নজরবন্দীর ওপর নজর পড়েছে।

—ছি, অনিরুদ্ধ! ছি।

—যতীনবাবুর দোষ আমি দিই না। ভাল লোক, উঁচু ঘরের ছেলে। পদ্মকে 'মা' বলে। আমি পরখ ক'রে দেখেছি! মরুক্ গে দুর্গা। এখন কি ক'রতে এসেছি, শোন। জমি আমার নীলামে চড়ছে। ও

আমি রাখবও না। এখন বিক্রী ক'রে দিয়ে যা' পাই। তোমাকে দেখে-শুনে বেচে দিতে হবে।

—বেচে দেবে?

—হ্যাঁ। খাজনা কাটান্ দিয়ে যা থাকে।

—তারপর?

—সে যা' হয় ক'রব। ছিরে গোমস্তাকে আমি খাজনা দোব না।

—পাগলামি ক'র না, অনি ভাই।

—পাগলামি? তবে এমনি ন'কড়া-ছ'কড়ায় নিলেম হ'য়ে যাবে?

—বাকী খাজনার টাকাটা জোগাড় কর। হয়, খাজনার পরিমাণ দামের মত জমি বেচে দাও, নয়, ধার যদি পাও তো দেখ।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—দেবু ভাই, বাপুতি সম্পত্তি ছেড়ে দোব মনে ক'রলে বুক ফেটে যায়! জ্ঞান পণ্ডিত, ওই চার বিঘে বাকুড়ি, ঠাকুরদাদার আমলে সাতখানা টুকরো টুকরো জমি ছিল—কেটে-কুটে সাতখানাকে ঠাকুরদাদা ক'রেছিল—তিনখানা। বাবা তিন-খানাকে কেটে করেছিল ছু'খানা, সাড়ে-তিন বিঘে বাকুড়ি —আর দশ-কাঠা ফালি। ছু'খানাকে কেটে আমি ক'রেছি একখানা বাকুড়ি।

টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় কয় ফোঁটা জল তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

—কেঁদো না, অনি ভাই। তুমি সক্ষম বেটা-ছেলে, তুমি মন দিয়ে কাজ ক'রলে তোমার কিছুর অভাব হয়?

হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—হাজার মন পাতিয়ে কাজ ক'রলেও কামারের কাজ ক'রে আর অভাব ঘুচবে না, পণ্ডিত। উপায় এক—কলে কাজ। তাই দেখব এবার। দুর্গা আমাকে ব'লেছিল একবার—

আমি গা করি নাই। কেশব কামারের ছেলে ছিতু কামারের নাতি—আমি কলের কুলী হব?—ওই সব কি-না-কি জাতের মিস্ত্রীদের তাঁবেদার হ'য়ে? জান দেবু, এমন দা' আমি গড়তে পারি যে, এক কোপে শেলেদা বাঘের গলা নেমে যাবে?

অনিরুদ্ধকে শান্ত করিবার জন্যই রহস্য করিয়া দেবু বলিল—সেই তো তোমার ভুল, অনি ভাই, ও দা' নিয়ে লোকে ক'রবে কি? বাঘ কাটতে যাবে কে বল?

অনিরুদ্ধ এবার হাসিয়া ফেলিল।

দেবু বলিল—টাকা যদি ধার পাও ত দেখ, অনি ভাই। জমি রাখতেই হবে। তারপর মন দিয়ে কাজ-কর্ম্ম কর। কলে—কলেই কাজ কর আপাতত। ক্ষতি কি?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তাই দেখি।

পথে বাহির হইয়া অনিরুদ্ধ বাড়ী গেল না। বাড়ী তাহার ভাল লাগে না। পদ্ম তাহাকে চায় না, সেও পদ্মকে চায় না। নিক্তির ওজনে চরিত্রবান্ সে কোনদিনই নয়; কিন্তু পদ্মের প্রতি ভালবাসার অভাব তাহার কোনদিন ছিল না। চরিত্রহীনতার ব্যভিচার ছিল খেয়াল পরিতৃপ্তির অঙ্গ; উন্মত্ত আনন্দ-লালসার নিবৃত্তি।' অকস্মাৎ জীবনে এক দুর্য্যোগ আসিয়া সব বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। সেই দুর্য্যোগের মধ্যে দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল মোহিনীর বেশে; শুধু মোহিনীর রূপ লইয়াই নয়—অফুরন্ত ভালবাসাও দিয়াছিল দুর্গা। সেবা যত্ন—এমন কি, নিজের পার্থিব সম্পদও সে তখন অনিরুদ্ধের জন্য ঢালিয়া দিতে চাহিয়াছিল. কিছু দিয়াছেও।

তা ছাড়া দুর্গার সঙ্গ তাহাকে যে তৃপ্তি দিয়াছে, পদ্ম তাহার সুস্থ সবল যৌবন-পরিপূর্ণ দেহ লইয়াও সেরূপ তৃপ্তি দিতে পারে নাই। তাহার বুকে আছে এক বোঝা মাদুলী; চিরদিন সে তাহাতে বেদনা

অনুভব করিয়াছে। আচার-বিচার-ব্রত-বার পালনের আগ্রহে—শুচিতা-বোধের উগ্রতায় পদ্ম তাহাকে অস্পৃশ্যের মত দূরে ঠেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার ভালবাসায় যত্নের আধিক্য, মমতার আতিশয্য অনিরুদ্ধকে পীড়া দিয়াছে। সঙ্কোচশূন্য অধীরতায় দুর্গার মত বুকে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সে কোনদিনই পারে নাই। সমস্ত দিন আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়া তাহারই সম্মুখে বসিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া, সে বাড়ী ফিরিয়া একটু করিয়া মদ খাইত; কিন্তু ওই দেহ-মন লইয়া পদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইলেই তাহার নেশার আগ্রহ সব যেন হিম হইয়া যাইত।

দুর্গার মধ্যে আছে আগুন ও জল—দুই-ই, একাধারে জ্বলিবার ও জুড়াইবার উপাদান! তাহার যৌবনে আবেগময়ী মানবীর ঈষদুষ্ণ স্বাদ!—তাহা অনিরুদ্ধকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। কামারশালা অচল হইলে, কর্ম্মহীন অনিরুদ্ধ বিশ্বগ্রাসী অবসাদ হইতে বাঁচিবার জন্য সবে মদ ধরিবার সময়টিতেই দুর্গা তাহাকে হাত ধরিয়া টানিয়াছিল। সে চরম আত্মসমর্পণের মধ্যে দুর্গার নিকট আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু দুর্গা সহসা একদিন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে—নূতনের মোহে। দুর্গা তুষানল ও মরীচিকা—দুই-ই; সে পাষাণী, বিশ্বাসঘাতিনী, মায়াবিনী!....

এমন সময় অনিরুদ্ধ দেখিল—সে অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে একেবারে বায়েন-পাড়াতেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ওই-যে দুর্গার ঘর। দুর্গা উঠানে দুধ মাপিতেছে, রোজের দুধ দিতে যাইবে।

তাড়াতাড়ি পাড়াটা পার হইয়া সে মাঠের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। দুর্গা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, সে-ই বা দুর্গার পিছনে ঘুরিবে কেন? সে-ও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। দেবু তাহাকে ঠিক কথাই বলিয়াছে। এখন যেন সে বুঝিতে পারিতেছে—তাহার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছি—ছি! কেশব কর্ম্মকারের ছেলে—হিতু কামারের

নাতি—সে মুচির মেয়ের ঘরে পড়িয়া থাকে তাহার এককণা অনুগ্রহের লোভে! ছি! সে-না সক্ষম বেটাছেলে—একজন নাম-করা লোহার কারিগর?

পরক্ষণেই সে হাসিল। লোহার কারিগরের আর মান নাই—নাম নাই। চার আনার বিলাতি চাকু-ছুরিতেই নামের গলা দু-ফাঁক হইয়া গিয়াছে। সে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যাক্—নাম যাক্—মান যাক্, চাল-কলে তেল-কলে নাট্‌বল্টু কষিয়া হাতুড়ি ঠুকিয়া মিস্ত্রী তো হইতে পারিবে সে? জমিটা বাঁচাতেই হইবে। ঠাকুরদার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নিজের হাতে কাটা জমি, বাবার কাটা জমি, তাহার নিজের হাতে কাটা ওই বাকুড়ি—তাহার সোণার বাকুড়ি, 'লক্ষ্মী-জোল' তাহার মা অন্নপূর্ণা!

আপনা হইতেই তাহার দৃষ্টি সম্মুখের শস্যশূন্য মাঠের উপর দিয়া প্রসারিত হইয়া নিবদ্ধ হইল চার বিঘা বাকুড়ির উপর। সে চলিতে আরম্ভ করিল; আসিয়া বাকুড়ির আইলের উপর বসিল! আইলের মাথায় একটা কয়েৎ বেলের গাছ। গাছটা লাগাইয়াছিল তাহার পিতামহ। বাল্যকালে তাহার বাপ চাষ করিত—সে আসিত বাপের ও কৃষাণের খাবার লইয়া; আসিয়া ওই গাছতলায় বসিত! জ্বর-জ্বালার পর কতদিন এখানে আসিয়া নুন দিয়া কয়েৎ-বেল খাইয়াছে! লক্ষ্মী-পূজাতে, পর্ব্বে-পার্ব্বণে এই ধানের চালে হইয়াছে অন্ন, ওই কয়েৎ-বেল গুড়-নুন দিয়া মাখিয়া হইয়াছে চাটনী!...অনিরুদ্ধ সঙ্কল্প লইয়া উঠিল—জমি সে রাখিবেই।

সে চলিল—'আকুলিয়া' গ্রামের কাবুলী চৌধুরীর কাছে। ক্যালা-রাম চৌধুরী, কঙ্কণা ইস্কুলের মাষ্টার, তাহার সুদি কারবার আছে। অতি চড়া সুদের ভয়ঙ্কর তাগাদার জন্য অনেক লোকে তাহাকে বলে 'কাবুলী'। অনেকে বলে 'অজগর'—তাহার গ্রাসে পড়িলে নাকি

বাহির হওয়া যায় না! অনেক বলে 'খুনে'। একবার একটা চোর ধরিয়া চৌধুরী চোরটাকে খুন করিয়া ফেলিয়াছিল। ভাল সম্পত্তি হইলে চৌধুরী টাকা দিবেই।...সে আকুলে গ্রামের পথই ধরিল।

চৌধুরী লেখাপড়া-জানা লোক, বি-এ পাশ, এদিকে আবার সংস্কৃতেও কি একটা পরীক্ষা দিয়াছে, ইস্কুলে সে হেড্ পণ্ডিত। কিন্তু আসলে সে একজন প্রথম শ্রেণীর আঙ্কিক। সুদ কষিতে তাহার কাগজ-কলম দরকার হয় না, চক্রবৃদ্ধি হারে দশ-বিশ বৎসরের সুদ মুখে মুখে হিসাব করিয়া দেয়! তবে সুদকে আসলে পরিণত করিয়া সেটা উশুলের বিষয় হিসাবে আলোচনার সময়—দুই-চারিটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া—অঙ্কগুলাকে রসায়িত অথবা পরমার্থিক তত্ত্বমণ্ডিত করিয়া দেয়।

অনিরুদ্ধ বলিল—আমি ঠিক সময়ের মধ্যে টাকা শোধ ক'রব, চৌধুরী মশাই—আমি ফাঁকিবাজ নই। আর পালিয়ে বেড়িয়ে দেখা ক'রব না, সে স্বভাবও আমার নয়।

চৌধুরী হাসিল—ফাঁকি দেবার উপায় নাই, বাবা। আর পালিয়েই বা যাবি কোথায়?...বলিয়া সে একটা শ্লোক আওড়াইয়া দিল—"গিরৌ কলাপী গগনে চ মেঘো, লক্ষান্তরেঽর্ক সলিলে চ পদ্মম্"! বুঝলি অনিরুদ্ধ, মেঘ থাকে আকাশে আর ময়ূর থাকে পাহাড়ে, দূর অনেক; কিন্তু মেঘ উঠলেই ময়ূরকে বেরিয়ে এসে পেখম মেলতেই হবে। আর সুয্যি থাকে আকাশে, জলে পদ্মের কুঁড়ি; কিন্তু সুয্যি উঠলেই পদ্মকে বাপ বাপ বলে পাঁপড়ি খুলতেই হবে। খাতক-মহাজন সম্বন্ধ হ'লে যেখানে থাকিস না কেন, হাজির হ'বি—পালাবি কোথা?

অনিরুদ্ধ কথাগুলা ভাল করিয়া বুঝিল না, সে দাঁত মেলিয়া শুধু নিঃশব্দে হাসিল।

চৌধুরী মুখেই হিসাব করিল—বিঘেতে চল্লিশ টাকা দিলে, তিন বছরে চল্লিশ তো বাটে গিয়ে দাঁড়াবে। তা'র ওপর নালিশের খরচা

চাপ্‌লে মহাজনের থাকবে কি বল্‌? খাতক আবার যদি বাকী খাজনা ফেলে যায়, তবে তো আমাকে রঘু রাজার মত ভাঁড়ে জল খেতে হবে।

অনিরুদ্ধ তাহার পায়ে ধরিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, এক বছরের মধ্যেই সব টাকা শোধ ক'রব আমি।

পা টানিয়া লইয়া চৌধুরী বলিল—পায়ে ধরিস না, অনিরুদ্ধ, পায়ের ফাটে হাত-মুখ ছিঁড়ে যাবে তোর। ছাড়।....মিথ্যা বলে নাই চৌধুরী। চৌধুরীর কালো কর্কশ চামড়ায়, কোন ব্যাধির জন্যই হউক বা শরীরে কোন উপাদানের অভাব হেতুই হউক, বারোমাস ফাট ধরিয়া থাকে। শীতকালে সাদা ফাটগুলা রক্তাভ হইয়া উঠে। সব চেয়ে ভয়ঙ্কর, চৌধুরীর পায়ের তলাকার ফাট, শুষ্ক কঠিন চামড়া ছুরির মত ধারালো। তারপর সান্ত্বনা দিয়া বলিল—এক বছরেই যখন শোধ ক'রবি, তখন ছ'বিঘে কেন দশ-বিঘে বন্ধক দিতেই বা আপত্তি কিসের তোর? কাগজে লেখা থাকবে বইতো নয়।

অনিরুদ্ধ চুপ করিয়া রহিল; সে ভাবিতেছিল দেহের গতিকের কথা, দেবতার গতিকের অর্থাৎ বৃষ্টি অনাবৃষ্টির কথা।

—কিছু ভয় করিস না।...চৌধুরী তার মনের ভাব ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এক বছরে শোধ করিস আর পাঁচ বছরে করিস—তোকে ম'রতে আমি দোব না। সুদ আমি বাকী রাখি না, রাখবও না। বাকী থাকলে আসলই থাকবে! তাতে বেইমানি করিস, তা'হলে ব্রাহ্মণের গণ্ডুস।...চৌধুরী হাসিতে লাগিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—সুদ আপনি মাসে মাসে পাবেন।

—ঠিক তো?

—তিন সত্যি করছি আপনার চরণ ছুঁয়ে!

—তবে দিন তিনেক পরে আসিস্‌! আমি সব খোঁজ-খবর ক'রে দেখি।

—খোঁজ ক'রবেন? কি খোঁজ ক'রবেন?

—আর কোথাও বন্ধক-টন্ধক দিয়েছিস কি না।

—আপনার চরণ ছুঁয়ে ব'লছি—

চৌধুরী বলিল—এইবার চরণ দু'টিকে আমাকে সিকেয় তুলতে হবে, বাবা। তাতে তোরই ভাল হবে না। রেজেষ্টী আফিস-যাওয়া হবে না, তুইও টাকা পাবি না। খোঁজ না ক'রে আমি টাকা কাউকে দিই না, দোবও না।

অনিরুদ্ধ তবু উঠিল না। শ্রান্ত ক্লান্ত দেশান্তরী উদাসীনের অকস্মাৎ প্রিয়জনকে মনে পড়িয়া যেমন বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ জাগে, অনিরুদ্ধের আজ তেমনি ব্যাকুল আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে আবার সেই পূর্ব্বের-সংযত সচ্ছল সংসার-জীবনে ফিরিবার জন্য। ফিরিবার পাথেয় চাই তাহার! চার বছরের বাকী খাজনা সালিয়ানা পঁচিশ টাকা দশ আনা হিসাবে একশত আড়াই টাকা; সিকি সুদ পঁচিশ টাকা দশ আনা—একুনে একশো আটাশ দু'আনা খরচা লইয়া একশো চল্লিশ-কি-পঁয়তাল্লিশ, দেড়শো টাকাই ধরিয়া রাখা ভাল। আরও একশো চাই। সে বলদ এক জোড়া কিনিবে। জমি ভাগে না দিয়া, একটি কৃষাণ রাখিয়া সে বাপ-ঠাকুরদাদার মত ঘরে চাষ করিবে। তাহার নিজের জমি তের বিঘা। নিজের হাল থাকিলে অন্য কারও বিঘা-পাঁচেক সে ভাগে লইতেও পারিবে। জংসন সহরের ধান-কলে বা তেল-কলে একটা চাকরী লইবে। রাত্রি থাকেতে সে উঠিবে, গরু দুইটাকে আপন হাতে খাইতে দিবে। কৃষাণ হাল লইয়া যাইবে, সেই সঙ্গে সে-ও বাহির হইবে—একেবারে সারাদিনের মত সাজিয়া গুছাইয়া। জমিগুলি দেখিয়া-শুনিয়া ওই পথেই চলিয়া যাইবে সে জংসনে কলের কাজে। ফিরিবার পথে আবার একবার মাঠ ঘুরিয়া বাড়ী আসিবে। মদ খাইতে হয়—একটু না খাইলে সে বাঁচিবে না—

বোতল কিনিয়া আনিয়া বাড়ীতে রাখিবে, পল্ম মাপিয়া ঢালিয়া দিবে—ব্যাস্! কলের মাইনে দৈনিক আট আনা হিসাবে চারিটা রবিবার বাদ দিয়ে তের টাকা,—বৎসরে একশো ছাপান্ন টাকা নগদ আয়। ধান, কলাই, গুড়, গম, যব, তিসি, সরিষা হইবে চাষে। নজরবন্দীর বাড়ী-ভাড়া আছে মাসিক দশ টকা ওটা অবশ্য স্থায়ী আয় নয়। এ ছাড়াও সে বাড়ীতে আবার কামারশালা খুলিবে। রাত্রে যাহা পারে, যতটুকু পারে করিবে; দৈনিক দু'গণ্ডা পয়সা রোজগার হইলেও তাহাতেই তাহার দৈনিক নুন-তেলের খরচটা তো চলিয়া যাইবে। ঋণ-শোধ দিতে তাহার কয় দিন? ঋণ শোধ দিয়া সে আরম্ভ করিবে সঞ্চয়; সঞ্চয় হইতে সুদি কারবার। খৎ-তমসুকে কারবার নয়, জিনিষ-বন্ধকী কারবার। পড়তি নাই, ঘাটতি নাই, বৎসরে একটি টাকা দুয়ে পরিণত হইবে! তাহার বাকুড়ির আরো আধ হাত মাটি তুলিয়া সে যদি গর্ত্ত করিতে পারে—তবে বাকুড়িতে হাজাশুকা থাকিবে না। মাটি তুলিয়া গাড়ি গাড়ি সার এবং মরা পুকুরের পাঁক ঢালিয়া দিবে। উনো ফসল দুনো হইবে।...

চৌধুরী বলিল—ব'সে থাকলে তো টাকা মিলিবে না, অনিরুদ্ধ। আমি খোঁজ-খবর করি, তারপর। এদিকে বেলাও যে দশটা হ'ল। আমার আবার ইস্কুল আছে।

অনিরুদ্ধ বলিল—বেশ আজই চলুন করুণা, রেজেষ্টারী অপিসে খোঁজ করুন।

হাসিয়া চৌধুরী বলিল—আজই? তোর অশ্বতর যে পক্ষীরাজের চেয়েও জিন্দে দেখেছি, থামতে চায় না। বেশ বস্ তুই। আমি চান ক'রে দুটো খেয়ে নি। চল্ আমার সঙ্গে। টিফিনের সময় খোঁজ ক'রব।

টিফিনেও খোঁজ শেষ হইল না। চৌধুরী বলিল—আবার সেই

শেষ ঘণ্টা, তিনটে-দশের পর আমার অবসর। তুই তা' হলে ব'স্।

শেষ ঘণ্টায় হেড্‌পণ্ডিত চৌধুরীর ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বক্তৃতার ক্লাস। ও ক্লাসটার সময় চৌধুরী প্রায়ই ছেলেদের স্বাধীনভাবে ধর্ম্মচর্চ্চার অবকাশ দিয়া রেজেষ্ট্রী আপিসের কাজগুলি সারিয়া থাকে। দলিল-দস্তাবেজ বাহির করে, কে কোথায় কি কিনিল—কি বেচিল, কে কি বন্ধক দিল ....ইত্যাদি সংবাদগুলি সংগ্রহ করে।

অনিরুদ্ধ সেই অপেক্ষা করিয়া রহিল। সমস্ত দিন খাওয়া হয় নাই; সে খানকয়েক বাতাসা কি দুই টুকরা পাটালীর প্রত্যাশায় পরান্ ময়রার দোকানে বসিয়া পরানের তোষামোদ করিতে আরম্ভ করিল; পাটালী-বাতাসা মিলিল না, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা সে ভুলিয়া গেল; পরানের বিধবা ভাগ্নী দোকান করে, তাহার সঙ্গে বেশ আলাপ জমাইয়া ফেলিল একটা হইতে তিনটা—দুই ঘণ্টা সময় যেন মেয়েটার হাসির ফুয়ে উড়িয়া গেল।

চৌধুরী আসিয়া বলিল—দেখা আমার হ'য়ে গেল, অনিরুদ্ধ,—বুঝলি ?

—হ'য়ে গেল আজ্ঞে ?

—হ্যাঁ। তোকে আর ডাকি নাই। দেখলাম—গল্পতে খুব জমে গিয়েছিস। রসভঙ্গ করা পাপ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ।...বলিয়া চৌধুরী হাসিল।

অনিরুদ্ধ একটু লজ্জিত হইল।

—টাকা আমি দোব।

—দেবেন ?...উৎসাহে অনিরুদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইল।

—হ্যাঁ। কিন্তু তোর তো আজ সারাদিন খাওয়া হ'ল না রে !

—তা—এই বাড়ী গিয়ে—এই তো কোশখানেক—কবে—আজ্ঞে।... অনিরুদ্ধ আনন্দের আবেগে কোন কথাই শেষ করিতে পারিল না।

—আচ্ছা, পরশু আসিস্। তাহ'লে শীগ্‌গির বাড়ী যা। মেঘ উঠ্‌ছে। ঝড়-জল হবে মনে হচ্ছে।....চৌধুরী চলিয়া গেল।

মেয়েটি বলিল—তুমি খাও নাই এখনো ?

—তা' হোক্! এই কতক্ষণ ? বোঁ বোঁ ক'রে চ'লে যাব।

—এই বাতাসা ক'খানা ভিজিয়ে জল খাও। খাও নাই—ব'লতে হয়। /

বাতাসা ভিজাইয়া জল খাইয়া অনিরুদ্ধ যেন বাঁচিল। টাঙিটা হাতে করিয়া সে পথে নামিয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ী চলিল। কিন্তু কঙ্কণার প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিতে না পৌঁছিতে ঝড় উঠিয়া পড়িল। পৌষের পর হইতে বৃষ্টি হয় নাই। চারিদিক রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, চৈত্রমাসের মাঝামাঝিতেই যেন বৈশাখের চেহারা দেখা দিয়াছে। অকালেই উঠিয়া পড়িয়াছে কালবৈশাখীর ঝড়। দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল; দুর্দ্দান্ত ঝড়ের তাড়নায় পিঙ্গল ধূলায় ধূসর হইয়া উঠিল—পৃথিবী হইতে আকাশ পর্য্যন্ত। তাহার উপর ঘনাইয়া আসিল—দ্রুত আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ঘন ছায়া; দু'য়ে মিলিয়া সে এক বিচিত্র পিঙ্গলাভ অন্ধকার। গোঁ গোঁ শব্দ করিয়া ঝড়ের সে কি দুর্দ্দান্তপনা!

অনিরুদ্ধ আশ্রয় লইল একটা গাছতলায়। শিলাবৃষ্টি, বজ্রপাতও হইতে পারে। কিন্তু উপায় কি ? আবার কে এখন এই দুর্য্যোগে গ্রামের মধ্যে ছুটিয়া যায়। আর মরণ তো একবার!

সোঁ-সোঁ শব্দে প্রবল ঝড়। ঝড়ে চালের খড় উড়িতেছে, গাছের ডাল ভাঙিতেছে। বিকট শব্দে ওই কার টিনের ঘরের চাল উড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই নামিল ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি; দেখিতে দেখিতে চারদিক আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বর্ষণ। আঃ পৃথিবী যেন বাঁচিল! ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধ। বৈশাখের আগে

এ অকাল-বৈশাখী ভাল নয়। "চৈতে কথর মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর, জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে।" ভাগ্য ভাল, শিল পড়িল না। তবে একটা উপকার হইল, জমিতে চাষ চলিবে। এ সময়ের একটা চাষ পাঁচ-গাড়ি সারের সমান। কাটা ধানের গোড়াগুলি উল্টাইয়া দিবে, সেগুলি মাটির ভিতর পচিতে পাইবে; রোদে বাতাসে মাটি ফোঁপরা নরম হইবে। হাতে তুলিয়া ধরিতেই এলাইয়া পড়িবে আদরিণী মেয়ের মত!

* * *

ঝড়-জল থামিতে সন্ধ্যা ঘুরিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি, ক্রোশখানেক দীর্ঘ মেঠো পথ, মাঠে কাদা হইয়া উঠিয়াছে, গর্তে জল জমিয়াছে; জায়গায় জায়গায় জলের স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়া জমিয়াছে খড়-কুটা-পাতা—নানা আবর্জ্জনা। চারিদিকে ব্যাঙগুলো জলের সাড়ায় ও স্বাদে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে বিষধর সরীসৃপের সাড়া পাওয়া যাইতেছে,—সুদীর্ঘ দেহ লইয়া সর্-সর্ শব্দে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু অনিরুদ্ধের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। টাঙিটা হাতে করিয়া সে নির্ভয়ে চলিতে চলিতে গান ধরিল। সাপ! সাপের প্রাণের ভয় নাই? উচ্চকণ্ঠে গান শুধু তাহার আনন্দের অভিব্যক্তি নয়, সরীসৃপদের প্রতি সরিয়া যাইবার নোটিশ। সে নোটিশ সত্ত্বেও যদি কাহারও দুর্ম্মতি হয়—মাথা তুলিয়া গর্জ্জন করে, তবে তাহার হাতে আছে এই টাঙি। সাপ!....সে হাসিল। যেবার সে দুইখানা জমি কাটিয়া বাকুড়িটাকে একখানা বাকুড়িতে পরিণত করে, সেবারে একটা পুরাণো পগার কাটিবার সময় কাল কেউটে মারিয়াছিল বারোটা। তাহার মধ্যে পাঁচটা ছিল চার হাত করিয়া লম্বা। সাপ কি জানোয়ারকে সে ভয় করে না। ভয় তাহার মানুষকে। চৌধুরী ভীষণ জীব। ছিরুকে আগে গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু শ্রীহরি এখন আসল কাল্-কেউটে!...

ঝড়ে গ্রামটা তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়াছে।

গাছের ডাল ভাঙিয়াছে, পাতায় খড়ে পথে-ঘাটে আর চলা যায় না। চণ্ডীমণ্ডপের ষষ্ঠীতলায় বকুলগাছটার বড় ডালটাই ভাঙিয়া পড়িয়াছে। চালের খড় সকলেরই কিছু-না-কিছু উড়িয়াছে। হরেন্দ্র ঘোষাল একখানা ঘর করিয়াছিল গম্বুজের মত, উঁচুতে প্রায় মাঝারি তালগাছের সমান; সেইখানার চালটাকে একেবারে উপড়াইয়া হরিশ মোড়লের পুকুরের জলে ফেলিয়া দিয়াছে। বায়েন-পাড়া—বাউড়ী-পাড়ার দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। তালপাতা এবং খড়ে-ছাওয়ানো ঘরগুলির আচ্ছাদন বলিতে কিছু রাখে নাই। তাহার উপর বর্ষণে দেওয়াল গলিয়া মেঝে ভিজিয়া কাদা সপ-সপ করিতেছে।

যাক্, দেবু-ভায়ের কিছু যায় নাই। আহা, বড় ভাল লোক দেবু ভাই! জগনের কেবল ডাক্তারখানার বারাণ্ডার চালটা আধখানা উল্টাইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য, শ্রীহরি বেটার কোন ক্ষতি হয় নাই! টিনের ঘরে, বেটা লোহার দড়ির টানা দিয়াছে!....এই রাত্রেই রাঙাদিদি ঘরের কুটাকাটা পরিষ্কার করিতে করিতে দেবতাকে গাল পাড়িতেছে।

আপনার বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া অনিরুদ্ধ দাঁড়াইল।

দাওয়ায় বসিয়া ছিল যতীন। সে বই পড়িতেছিল; প্রশ্ন করিল—কে?

—আজ্ঞে, আমি। অনিরুদ্ধ।

—কোথায় ছিলেন সমস্ত দিন?

—কাজে গিয়েছিলাম, বাবু।....অনিরুদ্ধ অন্ধকারের মধ্যেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চালের দিকে চাহিল। যতীন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেল—অনিরুদ্ধ আজ সুস্থ কথাবার্ত্তা বলিতেছে। এ অবস্থাটা যেন অনিরুদ্ধের পক্ষে অস্বাভাবিক। সে আবার প্রশ্ন করিল—শরীর ভাল আছে তো? কি দেখ্‌ছেন?

—দেখছি চালের অবস্থা। নাঃ, উড়ে নাই কিছু।·· কেবল কোঠা ঘরের পশ্চিম দিকের চালের খড়গুলা আতঙ্কিত সজারুর কাঁটার মত উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়াছে।

—আসছি বাবু। অনেক কথা আছে!····সে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। কিছু খাইতে হইবে! পেট হু-হু করিয়া জ্বলিতেছে।

পদ্ম উঠান-পথ-ঘাট ইহারই মধ্যে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে।···· ওই ওপাশের দাওয়ায় বসিয়া পদ্ম। কাছে বসিয়া ওটা কে? একটা ছেলে! কে? ও—বাউণ্ডুলে তারিণীর সেই ছেলেটা। জংসনে ভিক্ষা করিতে করিতে এখানে আসিয়া জুটিল কি করিয়া? পদ্মের কাছে আসিয়া বলিল—ওটা কোথা থেকে এল?

অনিরুদ্ধকে সুস্থ দেখিয়া পদ্মও অবাক হইয়া গেল। অনিরুদ্ধ এবার ছেলেটাকে বলিল—এখানে কোথা থেকে এসে জুটলি?

হাসিয়া পদ্ম বলিল—নজরবন্দী নিয়ে এসেছে আজ জংসন থেকে, বাবুর চাকর হবে।

—হুঁ, যত মড়া গাঙের ঘাটে জড়ো! দে, এখন খেতে দে দেখি!

পদ্ম সঙ্গে সঙ্গেই উঠিল। যাইতে যাইতে বলিল—জংশন-ইষ্টিশানে কার কি চুরি ক'রেছিল, লোকে ধ'রে মারছিল—নজরবন্দী ছেলে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে।

অনিরুদ্ধ বিরক্ত হইয়া উঠিল। কোন্‌দিন আবার তাহার বাড়ীর কিছু কিংবা ওই নজরবন্দীর কিছু চুরি করিয়া না পালায় ছেলেটা! সে রূঢ়স্বরে বলিল—এই ছোঁড়া, কোথায় চুরি ক'রেছিলি? কি চুরি ক'রেছিলি?

ছোঁড়া ভীত অথচ ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত মাথা হেঁট করিয়া আড়-চোখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

পদ্ম বলিল—কি ধারার মানুষ গো তুমি? নিয়ে এসেছে অক্ষ

একজনা, তোমার বাড়ীতে তো আসে নাই ও। তুমি ব'কছ কেনে বল তো? তা ছাড়া, ছেলেমানুষ, অনাথ,—ওর দোষ কি? যা রে বাবা, তুই উঠে তোর মুনিবের ওই দিকে যা।

ছোঁড়াটা কিন্তু তেমনি ভঙ্গিতে সেইখানে বসিয়া রহিল, নড়িল না।

একুশ

'চাষ আর বাস' পল্লীর জীবনে দুইটা ভাগ। মাঠ আর ঘর—এই দুইটি ক্ষেত্রেই এখানে জীবনের সকল আয়োজন—সকল সাধনা। আষাঢ় হইতে ভাদ্র—এই তিনমাস পল্লীবাসীর দিন কাটে মাঠে কৃষির লালন-পালনে; আশ্বিন হইতে পৌষ সেই ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে—সঙ্গে সঙ্গে করে রবি ফসলের চাষ; এ সময়টাও পল্লীজীবনের বারো আনা অতিবাহিত হয় মাঠে। মাঘ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তাহার ঘরের জীবন। ফসল ঝাড়িয়া, দেনা-পাওনা মিটাইয়া সঞ্চয় করে, আগামী চাষের আয়োজন করে; ঘরের ভিতর-বাহির গুছায়; প্রয়োজন থাকিলে নূতন ঘর তৈয়ারী করে, পুরানো ঘর ছাওয়ায়, মেরামত করে; সার কাটিয়া জল দেয়, শন্ পাকাইয়া দড়ি করে। গল্প-গান-মজলিস করে, চোখ বুঁজিয়া হরদম তামাক পোড়ায়, বর্ষার জন্য তামাক কাটিয়া গুড় মাখিয়া হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া জলের ভিতর পুঁতিয়া পচাইতে দেয়। চাষার পরিবারের যত বিবাহ এই সময়ে—মাঘ ও ফাল্গুনে, জের বড় জোর বৈশাখ পর্য্যন্ত যায়। হরিজনদের চৈত্রমাসেও বাধা নাই, পৌষ হইতে চৈত্রের মধ্যেই বিবাহ তাহারা শেষ করিয়া ফেলে।

অকালে—চৈত্রমাসের মাঝামাঝি এই অকাল—কাল-বৈশাখীর ঝড়জলে সেই বাঁধা-ধরা জীবনে একটা ধাক্কা দিয়া গেল। ভোরবেলায় শনের দড়ি পাকানো ছাড়িয়া সবাই মাঠে গিয়া পড়িল। প্রবীণদের

সকলের হাতেই হুঁকা। অল্পবয়সীদের কোঁচড়ে অথবা পকেটে বিড়ি-দেশলাই, কানে আধ-পোড়া বিড়ি। সকলে আপন আপন জমির চারিপাশের আইলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। উঁচু ডাঙ্গা জমিতে দুই-চারিজন আজই লাঙলের চাষ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিম্নভূমি—জোলান্ জমিগুলিতে এখনও জল জমিয়া আছে, দুই-চারিদিন গিয়া খানিকটা না শুকাইলে এ সব জমিতে চাষ চলিবে না। ময়ূরাক্ষীর চরভূমিতে তরি-তরকারির চারাগুলি মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শীর্ণকায় শিশুর মত এতদিন কোনমতে বাঁচিয়াছিল—এইবার মহীরাবণের পুত্রের মত দশ-দিনে দশ-মূর্ত্তি হইয়া উঠিবে। তিলের সবে ফুল ধরিতেছে, জলটায় তিলের খানিকটা উপকার হইবে। তবে অপকারও কিছু হইয়া গেল,—যে ফুলগুলি সদ্য ফুটিয়াছিল, এই বর্ষণে তাহার মধু ধুইয়া যাওয়ায় তাহাতে আর ফল ধরিবে না। এইবার আখ লাগানো চলিবে। জলটায় উপকার হইয়াছে অনেক। গ্রামে ঘর-বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আর কি করা যাইবে?

গ্রামের মেয়েরা ঝড়ে বিপর্য্যস্ত বাড়ী-ঘর পরিষ্কারে ব্যস্ত। কোমরে কাপড় বাঁধিয়া খড়-কুটা জড়ো করিতেছে,—সমস্ত সারে ফেলিতে হইবে। ছেলের দল আমবাগানে ছুটিয়াছে সেই ভোরবেলায়, কোঁচড় ভরিয়া আমের গুটি কুড়াইতেছে। হরিজনদের মেয়েরা ঝুঁড়ি-কাঁখে পথে, ঘাটে, বাগানে—পাতা, খড়, কাঠি শুকনা ডাল-পাতা সংগ্রহ করিয়া, প্রকাণ্ড বোঝা বাঁধিয়া ঘরে আনিয়া ফেলিতেছে; জ্বালানি হইবে। তাহাদের নিজেদের ঘর-দুয়ার এখনও সাফ হয় নাই। পুরুষরা যে-যার কাজে গিয়াছে। কেহ চাষী-গৃহস্থ-বাড়ীতে বাঁধা কাজে, কেহ জংসনে কলের কাজে, কেহ ভিন্-গাঁয়ে দিন-মজুরিতে।

দুর্গা আপনার ঘরে বসিয়াছিল! তাহার বাঁধা-ধরা কাজ,—সে এই সব পাতা-কুটা কুড়াইতে কখনও যায় না। জ্বালানি সে কেনে।

সে ভোরবেলায় একদফা দুধ দোহাইয়া নজরবন্দী বাবুকে দিয়া আসিয়াছে; পথে বিলু-দিদিকেও খানিকটা দিয়া, সেইখানেই চা খাইয়া, বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে। আগে-আগে কিছুদিন সে চা খাইত কামার-বউয়ের বাড়ীতে; কামার-বউ নজরবন্দী বাবুর চা করিত, নজর-বন্দীকে চা দিয়া বাকিটা পদ্ম এবং দুর্গা খাইত। কিন্তু সেদিন পদ্মের সেই রূঢ় কথার পর আর সে কামার বউয়ের বাড়ীর ভিতর যায় না। বাহিরে বাহিরেই নজরবন্দীবাবুর দুধের যোগান দিয়া, দুই-চারিটা কাজ-কর্ম্ম করিয়া দিয়া চলিয়া আসে। নজরবন্দীও আজ কয়েক দিন তাহাকে কোন কথা বলে নাই! সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, কাল হইতে সে আর নিজে দুধ দিতে যাইবে না; মাকে দিয়া পাঠাইয়া দিবে।

দুর্গার মা উঠান সাফ করিতেছিল; বউটা ডাল-পাতা-খড়কুটা কুড়াইতে গিয়াছে। পাতু আপনার ছেলেটাকে লইয়া বসিয়া আছে দাওয়ার উপর। লোকে বলে ছেলেটা নাকি দেখিতে অনেকটা হরেন ঘোষালের মত হইয়াছে, কিন্তু তবু পাতু ছেলেটাকে বড় ভালবাসে। বছর খানেকের মধ্যে পাতুর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। অবস্থা এবং প্রকৃতি দুয়েরই। পূর্ব্বে পাতু বায়েন বেশ মাতব্বর লোক ছিল। আচারে-ব্যবহারে বেশ একটু ভারিক্কী চাল দেখাইয়া চলিত। তখন পাতুর চালচলতি দেখিয়া লোকে হিংসা করিত। ভাগাড়ের চামড়া হইতেই তাহাদের ছিল মোটা আয়। চামড়া বেচিত, কতক চামড়া নিজে পরিষ্কার করিয়া ঢোল, তবলা, বাঁয়া, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ছাইয়া দিত। পাতুর ছাওয়া খোল-তবলার শব্দের মধ্যে কাঁসার আওয়াজের মিঠা বেশ বাজিত। এই ভাগাড় হইতেই আসিত তাহার আয়ের বারো আনা। বাকী সিকি আয় ছিল চাকরান্-জমির চাষ এবং এখানে-ওখানে ঢাকের বাজনা হইতে। ভাগাড়টা এখন

হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে; জমিদার টাকা লইয়া বন্দোবস্ত করিয়াছে। বন্দোবস্ত লইয়াছে আলেপুরের রহমৎ সেখ এবং কঙ্কণার রমেন্দ্র চাটুজ্জে। চাকরান-জমিও পাতুর গিয়াছে, সে-জমি এখন জমিদারের খাস্‌খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত। জমিটা পাতু নিজেই ছাড়িয়া দিয়াছে। না দিয়াই বা উপায় কি। তিন বিঘা জমি লইয়া বারমাস পালে-পার্ব্বণে ঢাক বাজাইয়া কি হইবে? যেদিন বাজাইতে হইবে সেই দিনটাই মাটি। তার চেয়ে সে বরং নগদ মজুরিতে এখানে-ওখানে বাজনা বাজাইয়া আসে—সেই ভাল। বায়না থাকিলে পরিষ্কার কাপড়ের উপর চাদর বাঁধিয়া ঢাক কাঁধে লইয়া পাতু বাহির হয়, ফিরিয়া আসে দুই-একটি টাকা লইয়া; উপরন্তু দুই-একটা পুরানো জামা-কাপড়ও লাভ হয়। প্রায় বারোটা মাসই সে এখন বেকার। জন-মজুর খাটিতেও পারে না। বাদ্যকর-বায়েন বলিয়া তাহার একটি সম্ভ্রম আছে, সে জন-মজুর খাটিবে কেমন করিয়া? বসিয়া বসিয়া সে ভাগাড় বন্দোবস্ত লওয়ার কথা ভাবে। তাহাদেরই স্বজাতি নীলু বায়েন—এখন অবশ্য নীলু দাস! চামড়ার ব্যবসা করিয়া লক্ষপতি ধনী হইয়াছে। এখন সে কলিকাতায় থাকে, মস্ত বড় চামড়ার ব্যবসা। এম-এ, বি-এল্ পাশ একজন সরকারী হাকিম—সরকারী চাকরি ছাড়িয়া তাহার ম্যানেজারি করিতেছে। প্রকাণ্ড বসত-বাড়ী, ঠাকুর-বাড়ী, হাওয়াগাড়ী আছে। দেশে আপনার গ্রামে কঙ্কণার বাবুদের মত ইস্কুল ও হাসপাতাল করিয়া দিয়াছে। তাহার ছেলে নাকি লাটসাহেবের মেম্বর। পাতু ভাগাড় বন্দোবস্ত লইবার কল্পনা করে, সঙ্গে সঙ্গে এমনি ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন দেখে।

বারোমাস জীবন ধারণের ব্যবস্থা করে তাহার স্ত্রী এবং দুর্গা। যে পাতু একদা দুর্গাকে কঠিন ক্রোধে লাঞ্ছিত করিয়াছিল—ছিরুপালের প্রতি প্রীতির জন্য, সেই পাতু হরেন ঘোষালের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও

ছেলেটাকে ভালবাসে—দিনরাত আদর করে। মধ্যে মধ্যে ঘোষালের কাছে যায়, আবদার করিয়া বলে—আজ চার আনা পয়সা কিন্তু দিতে হবে, ঘোষাল-মশায়!

দুর্গা নৈশ-অভিসারে যায় কঙ্কণায়, জংসনে—; প্রতীক্ষমান ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে-সঙ্গে কে ও? অন্ধকারের অস্পষ্ট মূর্ত্তিটি সরিয়া যায়, দুর্গা বলে—ও আমার সঙ্গে এসেছে।

—কে?

—আমার দাদা!

অস্পষ্ট মূর্ত্তি হেঁট হইয়া নীরবে নমস্কার করে।

দুর্গা বলে—একটা সিগরেট দেন, ও ততক্ষণ ব'সে ব'সে থাক্।

বাবুদের বাগান-বাড়ীর কোন গাছতলায় অথবা বারান্দায় সিগারেটের আগুনের আভায় পাতুকে তখন চেনা যায়। আসিবার সময় সে একটা মজুরি পায়—চার আনা হইতে আট আনা; দুর্গা আদায় করিয়া দেয়।

পাতু বার বার দুর্গাকে বলে—পঁচিশ টাকা বই তো লয়! দে না দুগ্‌গা, ভাগাড়টা জমা লি।

দুর্গা বললে—সে তো পরের কথা। এখন দু'টো গাছের তালপাতা কেটে আন্‌গা দিকি, ঘরটা তো ঢাকতে হবে।

এই তাহাদের চিরকালের ব্যবস্থা। উড়িলে কি পুড়িলে ঘরের জন্ম ইহারা ভাবে না। পুড়িলে কাঠ-বাঁশের জন্ম তবু ভাবনা আছে; উড়িলে সেটা ইহারা গ্রাহ্য করে না। মাঠে খাস-খামারের পুকুরের পাড়ের অথবা সরকারী নদীর বাঁধের তালগাছ হইতে পাতা কাটিয়া আনিয়া ঘর ছাইয়া ফেলে। শুধু পুরুষদের ফিরিবার অপেক্ষা,—কাজ হইতে ফিরিয়া তাহারা গাছে উঠিয়া পাতা কাটিবে, মেয়েরা মাথায় তুলিয়া ঘরে আনিবে। দু-চারিজন মেয়েও গাছে চড়িয়া পাতা কাটে।

দুর্গাও এককালে তালগাছে চড়িতে পারিত। কিন্তু এখন আর গাছে চড়ে না। প্রয়োজনও নাই, তাহার কোঠা-ঘরের চালে বেশ পুরু খড়ের ছাউনি—মজবুত বাঁধনে বাঁধা। তাহার চালের খড় কিছু বিপর্য্যস্ত হইয়াছে—বিশৃঙ্খল হইয়াছে; কিন্তু উড়িয়া যায় নাই। ওগুলাকে আবার সমান করিয়া বসাইতে অবশ্য গোটা দু'য়েক মজুর লাগিবে। এ কাজ পাতুকে দিয়াই হইবে, তাহাকেই বরং দুই দিনের মজুরি দিবে।

দুর্গার কথার উত্তরে পাতু বলিল—হুঁ!

—হুঁ তো উঠ্।

—বউটা আসুক আগে।

—বউ এলে পাঠিয়ে দোব, বউকে—মাকে; তুই এখন যা দিকি।

দুর্গার মা উঠান পরিষ্কার করিতে করিতে বলিল—মা লারবে বাছা। তুমি খেতে দিছ—তোমার 'তিলগুনো' খাটছি উপায় নাই. আবার বেটার খাটুনি খাটতে লারব আমি। ক্যানে, কিসের লেগে? কখুনো মা ব'লে দুগণ্ডা পয়সা দেয়, না—এক টুকরা ট্যানা দেয় যে আমি খাটব উয়ার তরে।

পাতু হুঙ্কার দিয়া উঠিল—আমরা দিই না তো তোর কোন বাবা দেয় শুনি?

—শুনলি দুগ্গা, বচন শুন্‌লি 'খাল্‌ভরার'?

দুর্গা বাধা দিয়া বলিল—থাম বাপু তোরা। তোর গিয়েও কাজ নাই, চেঁচিয়েও কাজ নাই। বউ আসুক—আমরা দুজনায় যাব। দাদা, তু এগুয়ে চল।

কোমরে কাটারি গুঁজিয়া পাতু আসিয়া উঠিল নদীর ধারে। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের গায়ে সারি-বন্দী অসংখ্য তালগাছ। বাছিয়া বাছিয়া চলকো পাতা দেখিয়া সে একটা গাছে চড়িয়া বসিল।

ওই খানিক দূরে একটা গাছের উপর 'আখ্‌না অর্থাৎ রাখহরি বাউরি পাতা কাটিতেছে! তার ওধারে গাছটায়—ও কে? পুরুষ নয়, মেয়ে। আখনার বউ পরী। এ পাশে ওই গাছটায় এটা কে? —পাতু ঠাওর করিতে না পারিয়া ডাকিল—কে রে উখানে?

—আমি গণা।...অর্থাৎ গণপতি।

—আর কে বটে?

—আমার পাশে বাঁকা, হুই রইছে ছিদাম। হুই মতিলাল।

গাছে চড়িয়াই সবাই আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। সহসা এদিকে আখ্‌না চীৎকার করিয়া উঠিল—হুই! হুই! হুস ধা! হুস ধা! উঃ, বাবারে, মেরে ফেলাবে লাগচে! হিশ্‌ ঠোঁটের ঢাড় কিরে বাবা!...আখ্‌নার জিহ্বার একটু জড়তা আছে, স্পষ্ট কথা বাহির হয় না।

আখ্‌নাকে দুইটা কাক আক্রমণ করিয়াছে। মাথার উপর কা-কা করিয়া উড়িতেছে, আর চঞ্চুর ঠোকর মারিতেছে। গাছটায় কাকের বাসা আছে। ও-পাশে পরী, স্বামীকে গাল পাড়িতেছে—ডাকরা বাঁশবুকোকে দশবার যে মানা ক'রলাম্‌, কাগের বাসা আছে, উঠিস্‌ না! কেমন হইছে?...বলিতে বলিতে আখ্‌নার বিব্রত অবস্থা দেখিয়া সে খিল্‌-খিল করিয়া হাসিয়া সারা হইল।

দূরে ছুম্‌ করিয়া একটা শব্দ উঠিল! সর্ব্বনাশ! কে পড়িয়া গেল? ওঃ, ভাদ্র মাসের পাকা তালের মত পড়িয়াছে! ফাটিয়া গেল না তো? না, মরে নাই, নড়িতেছে! যাক—উঠিয়া বসিয়াছে। বাপরে! আচ্ছা শক্ত জান্‌! নদীর ধারের ভিজা মাটি—তাই রক্ষা! কিন্তু লোকটা কে?...কে বটিস্‌ রে?

লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জবাব দিল—সাপ!

—সাপ?

—খরিশ! যেমন ইদিকের পাতায় উঠতে যাব—অমনি শালা—ফোঁস ক'রে ফণা নিয়ে উঠেছে উদিকের পাতায়। কি ক'রব লাফিয়ে পড়লাম।

ফড়িং বাউড়ী! ছোঁড়া খুব শক্ত। খুব বাঁচিয়াছে আজ। সাপটা পাখীর ডিমের সন্ধানে খেড়ো বাহিয়া গাছে উঠিয়াছে।....ওরে বাবা! পাতুরও জ্বালা কম নয়; একটা পাতা কাটিতেই অসংখ্য পিঁপড়ে বাহির হইয়া ছাঁকিয়া ধরিয়াছে! পাতু গামছাটা খুলিয়া গামছার আছাড়ে সেগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল। দূর্ শালা-দূর! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ! ধ্যেৎ!

* * *

দুর্গা আয়না দেখিয়া নরুণ দিয়া দাঁত চাঁচিতেছিল। পরিষ্কার-পরিষ্কার দুর্গার একটা বাতিক। তাহার দাঁতগুলি শাঁখের মত ঝক্-ঝক্ করা চাই। মধ্যে মধ্যে দাঁতে একটু আধটু পানের ছোপ পড়ে, খুব ভাল করিয়া দাঁত মাজিলেও যায় না; তখন সে নরুণ দিয়া সেই ছোপের দাগ চাঁচিয়া ফেলে। বউ ফিরিলেই সে বউকে লইয়া পাতা বহিয়া আনিতে যাইবে। হাঙ্গামা অনেক; মাথায় চুলে ময়লা লাগিবে, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ভরিয়া যাইবে, কাপড়খানা আর পরা চলিবে না। কিন্তু তবু উপায় কি? মায়ের পেটের ভাই।

মা বলিল—বউ রোজগার করছে, কখুনো একটা পয়সা দেয় আমাকে; শাশুড়ী ব'লে ছেদ্দা করে?

দুর্গা হাসিয়া বলিল—থাক্ মা, আর বলিস না; ওই পয়সা তোকে ছুঁতে হয়?

মা এবার ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ও-লো, সীতের বেটি সাবিত্তিরি আমার! তারপর সে আরম্ভ করিল তিন কালের কথা, তাহার নিজের মা-শাশুড়ীর আমলের শ্রুতি-কথা, নিজেদের কালের স্মৃতি-কথা,

বর্ত্তমান যুগের প্রত্যক্ষ বধূ-কন্থার বিবরণ-কাহিনী। অবশেষে বলিল—বউ হারামজাদী সাবিত্তিরির তখন ক্ষণা কত? কত ব'লেছিলাম, তা নাক ঘুরিয়ে তখন ব'লত—ছি! এখন তো সেই 'ছি' তপ্তভাতে ঘি হইছে। সেই রোজগারে প্যাট চ'লছে—পরণ চ'লছে!

পাড়ার ভিতর হইতে কে গালি দিতে দিতে আসিতেছিল। দুর্গা বলিল—থাম্ মা, থাম্, আর কেলেঙ্কারী করিস না। নোক আসছে।

চীৎকার করিয়া গালি দিতেছিল রাঙাদিদি।

—হবে না, দুগ্‌গতি হবে না, আরও হবে। এর পর বিনি ঝড়ে উড়ে যাবে, বিনি আগুনে পুড়ে যাবে! ধানের ভেতর চাল থাকবে না, শুধু 'আগরা' হবে।

দুর্গা হাসিয়া প্রশ্ন করিল—কি হ'ল রাঙাদিদি?

রাঙাদিদি সেই সুরের ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—ধম্মকে সব পুড়িয়ে খেলে মা! পিরথিমিতে ধম্ম ব'লে আর রইল না কিছু!

চীৎকার করিয়া দুর্গা বলিল—কি হ'ল কি? কে কি ক'রলে?

—ওই গাঁদা মিনসে গোবিন্দে! এতকাল দিয়ে এসে আজ বলছে না।

—কি?

—কি? ক্যানে, তুই আবার বেলাত থেকে এলি নাকি? পাড়ার নোক জানে, গাঁয়ের নোক জানে, তুই জানিস্ না? বলি তুই কেলা ছুঁড়ি? একে তো চোখে দেখতে পাই না, তার ওপর মুখপোড়া সুয্যির রোদের ছটা দেখ ক্যানে? চিনতে লারছি তুই কে?

—আমি—দুগ্‌গা গো।

—দুগ্‌গা? মরণ! আপন ঠেকারেই আছিস। পরের কথা মনে থাকে না—ক্যানে? গোবিন্দের বাবা আমার কাছে দু'টাকা ধার

নিয়েছিল—জানিস না? বুড়ো কি মাসে দু'আনা সুদ আমাকে দিয়ে আসত ; তা ছাড়া—যখন ডেকেছি, তখনি এসেছে। ঘরে গোঁজা দিয়েছে, বর্ষার নালা ছাড়িয়ে দিয়েছে। সে ম'ল, তারপর গোবিন্দে দশ-বারো বছর মাসে মাসে সুদ দিয়েছে, ডাকলে এসেছে। আজ ডাকতে এলাম, তা' বলে কি না—মোল্লান্, অনেক দিয়েছি ; আর সুদও দোব না, আসলও দোব না, বেগারও দোব না!....আমি চললাম দেবুর কাছে। চার পো কলি, মা। এখন যদি সবাই এই বলে তো—আমার কি দুগ্গতি হবে!

এমন খাতক বৃদ্ধার অনেকগুলি আছে, অন্ততঃ দশ-বারো জন. দুই কুড়ির উপর টাকা পড়িয়া আছে। পুরুষানুক্রমে তাহারা সুদ গণিয়া যাইতেছে, বৃদ্ধা কখনো আসল আদায় করে না, তাহারাও দেয় না। তাহাদের ভরসা, বৃদ্ধা মরিলে আর আসল লাগিবে না। তবে এমন মহাজন গ্রামে আরও কয়েকজন আছে। সকলেই প্রায় স্ত্রীলোক এবং তাহাদের ওয়ারিশ আছে। আসলে ইহাদের ঋণ-আইনের ধারাই এমনি।

বৃদ্ধা যাইতে যাইতে আবার দাঁড়াইল—বলি দুগ্গা শোন্।

—কি বল?

—এক জোড়া 'মাকুড়ি' আছে, লিবি? সোনার মাকুড়ি।

—মাকুড়ি? কার মাকুড়ি? কার জিনিস বটে?

—আয় আমার সঙ্গে। খুব ভাল জিনিস। জিনিস একজনার বটে, কিন্তু সে লেবে না। তা' মাকুড়ি কি করব আমি? তু লিস্ তো দেখ।

—না দিদি, আজ হবে না। আজ এখন তালপাতা আনতে যাব।

—মরণ, তুই আবার তালপাতা নিয়ে কি ক'রবি?

—আমার নয়, দাদার লেগে।

—ও-রে, দাদা-সোহাগী আমার! দাদার লেগে ভেবে ভেবে তো

মরে গেলি।....বুড়ী আপন মনেই বক্ বক্ করিতে করিতে পথ ধরিল। কিছুদূর গিয়া একটা গর্ত্তের কাদায় পড়িয়া বৃদ্ধা মেঘকে গাল দিল, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স-আদায়কারীকে গাল দিল, কয়েকটা ছেলে কাদা লইয়া খেলিতেছিল—তাহাদের চতুর্দ্দশ পিতৃপুরুষকে গাল দিল। তারপর জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানার সম্মুখে ওষুধের গন্ধে নাকে কাপড় দিয়া ওষুধকে গাল দিল, ডাক্তারকে গাল দিল, রোগকে গাল দিল, রোগীকে গাল দিল। টাকা মারা যাইবার আশঙ্কায় বৃদ্ধা আজ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবুর বাড়ীর কাছে আসিল সে ডাকিল—দেবু পণ্ডিত।

কেহ সাড়া দিল না। বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধা বাড়ী ঢুকিল—বলি কানের মাথা খেয়েছিস নাকি তোরা? অ-দেবু!

বিলু বাহির হইয়া আসিল—কে, রাঙাদিদি?

—আমার মতন কানের মাথা খেয়েছিস, চোখের মাথা খেয়েছিস? শুনতে পাস না? দেখতে পাস্ না?

বিলু ঠোঁটের কোনে ঈষৎ হাসিল; এ কথার কোন উত্তর দিল না। বুঝিল রাঙাদিদি বেজায় চটিয়াছে।

সেই দেবা ছোঁড়া কই? দেবা?

—বাড়ীতে নেই, রাঙাদিদি!

—কি ব'ললি—চেঁচিয়ে বল্। গাড়ীতে কোথা গেল আবার?

—গাড়ীতে নয়। বাড়ীতে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে গেল।

—চণ্ডীমণ্ডপে?

—হ্যাঁ।

আচ্ছা। সেখানেই যাচ্ছি আমি। বিচার হয় কিনা দেখি। ভালই হ'ল, দেবুও আছে—ছিরুও আছে। কান ধ'রে নিয়ে আসুক হারামজাদাকে। এত বড় বাড়্ হয়েছে। ধর্ম্ম নাই, বিচার নাই।

বুড়ী বকিতে বকিতে চলিল চণ্ডীমণ্ডপের দিকে।

চণ্ডীমণ্ডপে তখন জমজমাট মজলিস !

ভূপাল বাগদী লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। ষষ্ঠীতলায় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে—পাতু, রাখহরি, পরী, বাঁকা, ছিদাম, ফড়িং আরও জন কয়েক। পাশে পড়িয়া আছে কয়েক আঁটি তালপাতার বোঝা। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ জমিদারের সম্পত্তি ; সেখানকার তালগাছও জমিদারের। সেই গাছ হইতে পাতা-কাটার অপরাধে ভূপাল সকলকে ধরিয়া আনিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীর মুখে গড়্‌গড়া টানিতেছে। দেবু একধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে ডাকিয়া আনিয়াছে পাতুদের দল। হরেন ঘোষাল নিজেই আসিয়াছে ; সে প্রজা-সমিতির সেক্রেটারী। চীৎকার করিতেছিল সে-ই।

'—ওরা চিরকাল পাতা কেটে আসছে, বাপ-পিতামহের আমল থেকে। ওদের স্বত্ব জন্মিয়ে গেছে।'

ঘোষালের কথায় শ্রীহরি জবাবই দিল না। পাতু—সে বহুদিন হইতেই শ্রীহরির সঙ্গে মনে মনে একটি বিরোধ পোষাণ করিয়া আসিতেছে—সে একটু উষ্ণভাবেই বলিল—পাতা তো চিরকাল কেটে আসা যায়, মশায়। এ তো আজ নতুন নয়।

—চিরকাল অন্যায় করে আসছিলি বলে—আজও অন্যায় করবি গায়ের জোরে ? কাটিস, চুরি করে কাটিস।

দেবু এতক্ষণে বলিল—চুরি একে বলা চলে না, শ্রীহরি ! আগে আপত্তি ক'রত না, ওরা কাটত। এখন আপত্তি ক'রছ—বেশ আর কাটবে না। এর পর যদি না-বলে কাটে, তখন চুরি বলতে পারবে।

ঘোষাল বলিল—নো, নেভার। ও তুমি ভুল কথা ব'লছ, দেবু। গাছের পাতা কাটাবার স্বত্ব ওদের আছে। তিন পুরুষ ধ'রে কেটে আসছে। তিন বছর ঘাটে সর্‌লে, পারে কেউ ঘাট বন্ধ করতে—না পথ বন্ধ করতে ?

হাসিয়া শ্রীহরি বলিল—গাছ ওটা, পুকুর নয় ঘোষাল, পথও নয়।

—ইয়েস্, গাছ ইজ্ গাছ য়্যাণ্ড্ পথ ইজ্ পথ ; বাট্ ম্যান্ ইজ্ ম্যান্ আফ্‌টার অল্।

—কাল যদি জমিদার গাছগুলি বেচে দেয়, ঘোষাল, কি কেটে নেয়, তখন, পাতার অধিকার থাক্‌বে কোথা ? বাজে ব'কো না। শুধু খাস-খামারের গাছ্ নয়, মাল জমির ওপর গাছ্ পর্য্যন্ত জমিদারের ; প্রজা ফল ভোগ ক'রতে পারে, কিন্তু কাটতে পারে না !

দেবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহার বুকের মধ্যে মুহূর্ত্তে জাগিয়া উঠিল—একটা বিস্মৃত ক্ষোভ। তাহাদের খিড়কির ঘাটে একটা কাঁটাল গাছ ছিল, কাঁটাল অবশ্য পাকিত না, কিন্তু ইচড় হইত প্রচুর। তাহার আবছা মনে পড়ে। আসবাব তৈয়ারা করিবার জন্য জমিদার ঐ গাছটি কাটিয়াছিল। কিছু দাম নাকি দিয়াছিল, কিন্তু প্রথমে তাহার বাপ আপত্তি করায় ওই আইন-বলে জোর করিয়াই কাটিয়াছিল। কতদিন তাহার বাবা আক্ষেপ করিত—আঃ, ইচড় হ'ল গাছ-পাঁঠা। আর স্বাদ কি ইচড়ের !

দেবু বলিল—তা' হ'লে তাই কর, শ্রীহরি, গাছগুলো সব কেটে নাও। প্রজারা ফল খাবে না।

শ্রীহরি হাসিল—তুমি মিছে রাগ ক'রছ, দেবু খুড়ো। ওটা আমি আইনের কথা—কথায় কথায় ব'ললাম। জমিদার তা' ক'রবেন কেন ? তবে প্রজা যদি রাজার সঙ্গে বিরোধ করে, তখন আইনমত চললে রাজারই বা দোষ কি ? বে-আইনী বা অন্যায় তো হবে না !

—কিন্তু এ গরীব প্রজারা কি বিরোধ ক'রলে শুনি ? হঠাৎ এদের এ রকম ধ'রে আনার মানে ?

—ওদের জিজ্ঞেস কর। ওই প্রজা-সমিতির সেক্রেটারী বাবুকে

জিজ্ঞেস কর।···তারপর হরিজনদের দিকে চাহিয়া শ্রীহরি বলিল—কি রে? চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়াতে পয়সা নিবি না তোরা?

কথাটা এতক্ষণে স্পষ্ট হইল! সকলেই স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু সকলেই অন্তরে অন্তরে একটা জ্বালা অনুভব করিল! সর্ব্বাপেক্ষা সেটা বেশী অনুভব করিল দেবু। তালপাতার মূল্য এবং চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়ানোর মজুরির অসঙ্গতি তাহার হেতু নয়; তাহার হেতু সমগ্র ব্যাপারটার মধ্যে শ্রীহরির ভঙ্গি!

রাঙাদিদি খানিকক্ষণ আগে এখানে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া-শুনিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কানে ভাল শুনিতে পায় না, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ব্যাপারটা সে বুঝিল। তারপর বলিল—হ্যাঁ ড্যাকরারা, চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়াবি না তোরা? আস্পদ্দা দেখ, মাগো কোথা যাব!

হরেন ঘোষাল সুযোগ পাইয়া রাঙাদিদিকে ধমক দিল—যা বুঝ না, তা নিয়ে কথা ব'ল না, রাঙাদিদি। চণ্ডীমণ্ডপ এখন কার? চণ্ডীমণ্ডপ থাকল না থাকল তা' ওদের কি? ওদের তো ওদের—গাঁয়ের লোকেরই বা কি অধিকার আছে? চণ্ডীমণ্ডপ জমিদারের। চণ্ডীমণ্ডপ নয়, এটা এখন জমিদারের কাছারি।

—তা' রাজারও যা পেজারও তাই। রাজার হ'লেই পেজার।

দেবু হাসিয়া বেশ জোর গলাতেই বলিল—সে তো ওই তালপাতাতেই দেখছ, রাঙাদিদি।

—কে? দেবু?

—হ্যাঁ।

—তা বটে ভাই। তা'—হ্যাঁ ছি-হরি তালপাতা বই-তো লয়! তা যদি ওরা রাজার না লেবে তো পাবে কোথা?

শ্রীহরি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ধমক দিল—যাও, যাও, তুমি বাড়ী যাও। এসব কথায় তোমায় কথা বলতে কেউ ডাকে নাই। বাড়ী যাও!

রাঙাদিদি আর সাহস করিল না। গ্রামের কাহাকেও সে ভয় করে না, কিন্তু শ্রীহরিকে সে সম্প্রতি ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে! বৃদ্ধা ঠুক্‌ঠুক্‌ করিয়া চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ডাকিল,—দেবু বাড়ী আয়। ছেলেটা কাঁদছে তোর।....মিথ্যা বলিয়া সে দেবুকে ডাকিল, —যে মানুষ দেবু! আবার কোথায় কি হাঙ্গামা করিয়া বসিবে। দেবুকে সে দিন-দিন যেন বেশী করিয়া ভালবাসিতেছে।

দেবু সে ডাক শুনিল না; সে শ্রীহরিকে বলিল—ভাল, শ্রীহরি, তুমি এখন কি ক'রতে চাও শুনি?

—মানে?

—মানে, এদের যদি চুরি ক'রেছে ব'লে চালান দিতে চাও, দাও। আর যদি তালপাতার দাম নিতে চাও, নাও। কুড়িখানা তালপাতায় ডোমেরা একখানা তালপাতার চ্যাটাই দেয়। দাম তার দু' পয়সা। সেই এক আনা কুড়ি হিসেবে দাম দেবে ওরা।

—তা হ'লে, ঝগড়াই ক'রতে চাস্ তোরা? কি রে?....শ্রীহরি প্রশ্ন করিল হরিজনদের।

—আজ্ঞে?

দেবু বলিল—গুণে ফেল্—কার কত তালপাতা আছে, গুণে ফেল্।

সকলে তালপাতা গুণিতে আরম্ভ করিল।

মুহূর্ত্তে শ্রীহরি ভীষণ হইয়া উঠিল; হিংস্র ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে সে এক হাঁক মারিয়া উঠিল—ব'স। রাখ্ তালপাতা!

তাহার আকস্মিক দুর্দ্দান্ত ক্রোধের এই সশব্দ প্রকাশের প্রচণ্ডতায় সকলে চমকিয়া উঠিল। হরিজনেরা তালপাতা ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কেবল পাতু তালপাতা ছাড়িয়াও সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ভবেশ, হরিশ, শ্রীহরির পাশেই বসিয়াছিল—তাহারা চমকিয়া উঠিল। হরেন ঘোষাল প্রায় আঁৎকাইয়া উঠিয়াছিল, সে কয়েক পা সরিয়া গিয়া

বিস্ফারিত চোখে শ্রীহরির দিকে চাহিয়া রহিল। দেবু চমকিয়া উঠিয়া ছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাউড়ি ও বায়েনদের কাছে আগাইয়া আসিয়া সে দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল—থাক্ তালপাতা পড়ে, উঠে আয় তোরা এখান থেকে। আমি ব'লছি, ওঠ্!

সকলে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল—তাহার শীর্ণ মুখখানির সে এক অদ্ভুত তেজোদীপ্ত রূপ। সে দীপ্তির মধ্যে বোধ করি তাহারা অভয় খুঁজিয়া পাইল। তাহারা সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইল।

শ্রীহরি ডাকিল—ভূপাল! আটক কর বেটাদের।

দেবু তাহার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল, তারপর পাতুদের বলিল—যে-যার এখান থেকে চ'লে যা। আমার গায়ে হাত না দিয়ে কেউ তোদের ছুঁতে পারবে না।

হরেন ঘোষাল দ্রুতপদে সকলের অগ্রগামী হইয়া পথ ধরিয়া বলিল—চ'লে আয়।

সকলের শেষে চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া আসিল দেবু।

শ্রীহরির পিঙ্গল চোখ দুইটি ক্রূর শনিগ্রহের মত হিংস্র হইয়া উঠিল।

ঠিক ওই মুহূর্ত্তেই রাস্তার উপর হইতে কে উচ্চকণ্ঠে তীক্ষ্ণ ব্যাঙ্গে বলিয়া উঠিল—হরি-হরি বল!....বলিয়াই হো হো করিয়া সে এক প্রচণ্ড উচ্চহাস্য!

সে অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ হাততালি দিয়া উচ্চ-হাসি হাসিয়া যেন নাচিতে লাগিল। শ্রীহরির এই অপমানে তাহার আর আনন্দের সীমা ছিল না।

শ্রীহরি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একটা ক্রুদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভবেশ, হরিশ প্রভৃতি প্রবীণ মাতব্বর—যাহারা তাহার অনুগত

তাহারাও এ ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল ! কিছুক্ষণ পর ভবেশই প্রথম কথা বলিল—ঘোর কলি, বুঝলে হরিশখুড়ো !

শ্রীহরি এবার বলিল—আমাকে কিন্তু আর আপনারা দোষ দেবেন না।

হরিশ বলিল—দোষ আর কি ক'রে দিই ভাই ; স্বচক্ষে তো সব দেখলাম।

—ভূপাল !....শ্রীহরি ভূপালকে ডাকিল।

—আজ্ঞে।

—তোমার দ্বারা কাজ চ'লবে না, বাবা ।

—আজ্ঞে !....ভূপাল মাথা চুলকাইতে আরম্ভ করিল।

ভবেশ বলিল—এতগুলা লোকের কাছে ভূপাল কি ক'রত, বাবা ছি-হরি ? ও বেচারার দোষ কি ?

—আজ্ঞে, তার ওপর আমি চৌকিদার, ফৌজদারি আমি কি ক'রে করি ? আপনি ইউনান্ বোর্ডের মেম্বর। আপনিই বলুন হুজুর।

শ্রীহরি বলিল—তুই একবার কঙ্কণায় যা ; বাঁড়ুয্যে বাবুদের বুড়ো চাপরাসী নাদের সেখের কাছে যাবি। তাকে ব'লবি—'তোমার ছেলে কালু সেখকে ঘোষমহাশয়ের কাছে পাঠিয়ে দাও ; ঘোষমশায় রাখবেন !'

—কালু সেখ ?....সভয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল ভবেশ।

—হ্যাঁ, কালু সেখ।

নাদের সেখ এককালের বিখ্যাত লাঠিয়াল ; কালু তাহার উপযুক্ত পুত্র। তরুণ জোয়ান, শক্তিশালী, কৌশলী, দুর্দান্ত সাহসী। দাঙ্গা করিয়া সে একবার কিছুকাল জেল খাটিয়াছে ; তারপর ডাকাতি অপরাধের সন্দেহে চালান গিয়াছিল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে খালাস পাইয়াছে। কালু সেখ ভয়ঙ্কর জীব।

শ্রীহরি বলিল—অন্যায় আমি ক'রব না, হরিশ-দাদা। কারু অনিষ্টও

আমি ক'রতে চাই না। কিন্তু আমার মাথায় যে পা দেবে, তাকে আমি শেষ ক'রব, সে অন্যায়ই হোক আর অধর্ম্মই হোক।....আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—এই ছোট লোকের দল—বর্ষায় আমি ধান দিই তবে খায়—আজ আমাকে অমান্য ক'রে উঠে গেল। —ওই দেবু ঘোষ, সেটেল্‌মেণ্টের সময় আমি ওর জমি-জমা সমস্ত নির্ভুল করে লিখিয়েছি। দু-বেলা খোঁজ ক'রেছি ওর ছেলের. পরিবারের। জান, হরিশ দাদা, ফের যাতে ওর ইস্কুলের কাজটি হয় —তার জন্যেও চেষ্টা ক'রছিলাম। প্রেসিডেণ্টকেও ব'লেছি।

ভবেশ বলিল—কলিতে কারু ভাল ক'রতে নাই, বাবা।

—কাল হ'য়েছে ওই নজরবন্দী ছোঁড়া। ও-ই এই সব ক'রছে। কামার বউটাকে নিয়ে ঢলাঢলি ক'রছে। আর ওই শালা কর্ম্মকার— ...শ্রীহরি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল।—নেমকহারামের গ্রাম। এক এক সময়ে মনে হয়—এ গাঁয়ের কোন উপকার ক'রব না।

হরিশ বলিল—তা' ব'ললে চ'লবে ক্যানে ভাই। ভগবান তোমাকে বড় ক'রেছেন, ভাণ্ডার ভ'রে দিয়েছেন, তোমাকে ক'রতে হবে বৈ কি। এ-কথা তোমাকে সাজে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, শ্রীহরি সহজ-স্বরেই বলিল—হরিশ দাদা, ষষ্ঠীকাকাকে বলুন, এইবার কাজ আরম্ভ করে দিক। ইট তো তোমার পুড়ে র'য়েছে। ইস্কুলের মেঝে না-হয় দশদিন পরে হবে, জল পড়ুক ভাল ক'রে;—নইলে ফেটে যাবে মেঝে। কিন্তু সাঁকোটা এখন আর না ক'রলে কখন্ ক'রবে? তার ওপর ওটা আমার কাজ নয়, আমি অবিশ্যি দশ টাকা দিয়েছি; কিন্তু সে ইউনিয়ন বোর্ডকে দিয়াছি—সাঁকো ক'রবার জন্যে। ইউনিয়ন বোর্ডকে আমি ব'লব কি?

হরিশের ছেলে ষষ্ঠী শ্রীহরির পৃষ্ঠপোষকতায় ঠিকাদারির কাজ

করিতেছে। ইউনিয়ন বোড হইতে শিবকালীপুরের রাস্তায় একটা সাঁকো হইবে, শ্রীহরি নিজে ইস্কুলের মেঝে বাঁধাইয়া দিবে। ঠিকাদার ষষ্ঠীচরণ।

হরিশ বলিল—তোমার কাজেই সে এখন ব্যস্ত, ভাই। খাতাপত্র নিয়ে সকালে বসে, ওঠে সেই রাত্রে। তামাদির হিসেব, হিসেব তো কম নয়।

ষষ্ঠীচরণ শ্রীহরির গোমস্তাগিরির কাগজপত্রও সারিয়া দেয়। চৈত্র মাসে বাকি-বকেয়ার হিসাব হইতেছে; যাহাদের চার বৎসরের বাকি, তাহাদের নামে নালিশ হইবে। শ্রীহরির নিজের ধানের টাকার হিসাব আছে, তাহার তামাদি তিন বৎসরে; সে সব হিসাবও হইতেছে।

ভূপাল চলিয়া গিয়াছিল; বরাত খাটিবার উপযুক্ত অন্য কেহও ছিল না। নিরুপায়ে ভবেশ নিজেই তামাক সাজিতে বসিয়াছিল। ষষ্ঠীতলার ধারে কাঠের ধুনি জ্বলে,—সেইখানে বসিয়া কল্কেতে আগুণ তুলিতে তুলিতে ভবেশ কাহাকে ডাকিল—কে রে? ও—ছেলে!

একটি ছেলে একগুচ্ছ লালফুল হাতে করিয়া যাইতেছিল, ডাকিতে সে দাঁড়াইল।

—কে রে? কি ফুল হাতে? অশোক নাকি?

ছেলেটি বৈরাগীদের নলিন, সে গিয়াছিল মহাগ্রামে পটুয়াদের বাড়ী। ঠাকুরদের বাগানে অশোক ফুল ফুটিয়াছিল, সেখান হইতে অশোক ফুলের একটি তোড়া বাঁধিয়া আনিয়াছে—নজরবন্দীকে দিবে। আরও কতকগুলি কলি সে আনিয়াছে, পণ্ডিতের বাড়ীতে—প্রতিবেশীদের বাড়ীতে বিলাইবে। দুই দিন পরেই অশোকষষ্ঠী। অশোকের কলি চাই।···নলিন অভ্যাসমত কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হাঁ, অশোকের কলি।

—দিয়ে যা তো, বাবা। একটা ডাল দিয়ে যা তো।

নলিন অশোকের কয়েকটি ফুল নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

শ্রীহরি বলিল—আমার পুকুরপাড়ের বাগানেও অশোকের চারা লাগিয়েছি।

সে একটা পুকুর কাটাইয়াছে। তাহার পাড়ে সখ করিয়া নানা জাতীয় গাছ লাগাইয়াছে। সবই প্রায় ভাল ভাল কলমের চারা।

বাইশ

অশোক-ষষ্ঠীর দিন। এই ষষ্ঠী যাহারা করে, তাহাদের নাকি সংসারে কখনও শোক প্রবেশ করে না; "হারালে পায়, ম'লে জীয়োয়" অর্থাৎ কিছু হারাইলেই ফিরিয়া পায়—কেহ মরিলে পুনরায় জীবিত হয়। মেয়েরা সকাল হইতে উপবাস করিয়া আছে। ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিয়া ব্রতকথা শুনিবে, অশোক ফুলের আটটি কলি খাইবে; প্রসাদী দই হলুদ মিশাইয়া—তাহারই ফোঁটা দিবে ছেলেদের কপালে। তারপর খাওয়া-দাওয়া; সে সামান্যই। অন্নগ্রহণ নিষেধ।

বারোমাসে তেরো ষষ্ঠী। মাসে মাসে স্বর্গ হইতে আসে ষষ্ঠীদেবীর নৌকা; বারো মাসে তেরো রূপে তিনি মর্ত্ত্যলোকে আসেন—পৃথিবীর সন্তানদের কল্যাণের জন্য সিঁথীতে ডগমগ্ করে সিঁদূর, হাতে ঝলমল্ করে শাঁখা, সর্ব্বাঙ্গে হলুদের প্রসাধন, ডাগর চোখে কাজল; পরের সাত পুতকে কোলে রাখেন, নিজের সাতপুত থাকে পিঠে। বৈশাখ মাসে চন্দন-ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য-ষষ্ঠী, আষাঢ়ে বাঁশ-ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন বা লোটন-ষষ্ঠী, ভাদ্রে চর্পটা বা চাপড়া-ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা-ষষ্ঠী, কার্ত্তিকে কাল-ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে অখণ্ড-ষষ্ঠী—সংসারকে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যান; পৌষে মূলা-ষষ্ঠী, মাঘে শীতলা-ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোবিন্দ-ষষ্ঠী, চৈত্রে অশোক হখন ফুলভারে

ভরিয়া উঠে, তখন শোক-দুঃখ মুছিয়া দিতে আসেন মা অশোক-ষষ্ঠী। তাঁহার কল্যাণ-স্পর্শে আনন্দে সুখে ওই ফুলভরা অশোক গাছের মতই সংসার হাসিয়া উঠে। অশোকের পর আছে নীল-ষষ্ঠী। গাজন সংক্রান্তির পূর্ব্ব-দিন। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও—ওই দিন হয় নীল-ষষ্ঠী।....

পদ্ম সকালবেলা হইতেই গৃহকর্ম্ম সারিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত। কাজ সারিয়া স্নান করিবে; ষষ্ঠীর পূজা আছে, ব্রতকথা শুনিতে যাইবে বিলুব বাড়ী। তারপর অশোকের কলি খাইতে হইবে। তাহার আবার মন্ত্র আছে। এ হেন দিনে আবার অনিরুদ্ধ কাজের ঝঞ্ঝাট বাড়াইয়া দিয়াছে। কামারশালা মেরামতে লাগিয়াছে। হাপর, নেয়াই, হাতুড়ি, সাঁড়াশী ইত্যাদি লইয়া টানাটানি সুরু করিয়াছে। কামারশালার বহুকালের পুরানো ঝুল, কালি, কয়লা সাফ করা একদণ্ডের কাজ নয়। ইহার উপর কয়লার সঙ্গে মিশিয়া আছে লোহার টুকরা,—ছুতারের রেদায় চাঁচিয়া-তোলা কাঠের আঁশের মত পাতলা কোঁকড়ানো লোহাগুলি সাংঘাতিক জিনিস, বিঁধিলে বঁড়শীর মত বিঁধিয়া যাইবে। ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিয়া আবার গোবর-মাটির প্রলেপে নিকাইতে হইবে। পদ্মের সঙ্গে তারিণীর সেই ছেলেটাও কাজ করিতেছিল। ছেলেটাকে যতীন খাইতে দেয়। দুই-একটা কাজ-কর্ম্ম অবশ্য ছেলেটা করে, কিন্তু অহরহই পদ্মের কাছে থাকে। অনিরুদ্ধ দুই-একটা ধমক দিলেও ছেলেটা আর বিশেষ কিছু বলে না। বিপদ হয়—ছোঁড়াটা বাহিরে গেলেই! গেলে আর সহজে ফেরে না। যতীন, উহাকে দিয়া দেবুকে কোন খবর পাঠাইলে, দেবু আসে, কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যায়—কিন্তু ছেলেটার পাত্তা আর পাওয়া যায় না। অবশেষে একবেলা পার করিয়া খাইবার সময় ফেরে; কোন-কোনদিন হরিজন-পাড়া,

কি, কোন বন-জঙ্গল খোঁজ করিয়া ধরিয়া আনিতে হয়। পদ্মই আনে।

অনিরুদ্ধ, কাবুলী চৌধুরীর কাছে টাকা পাইয়াছে। আড়াইশো টাকার জন্য অবশ্য চৌধুরী গোটা জোত্‌টাই বন্ধক না লইয়া ছাড়ে নাই। অনিরুদ্ধের মন খানিকটা খুৎ খুৎ করিয়াছিল ;—কিন্তু টাকা পাইয়া সে সব আপশোষ ছাড়িয়া, মহা উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বাকি খাজনার টাকাটা আদালতে দাখিল করিতে হইবে, আপোষে দিয়া বিশ্বাস নাই। আর আপোষেই বা সে দিবে কেন? পাচুন্দীর গরু-মহিষের হাট হইতে একজোড়া গরু কিনিবে। ইহারই মধ্যে সে কৃষাণও বহাল করিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গার ভাই পাতুকেই তাহার পছন্দ। তাহাকে সে চাকর রাখিয়াছে। তা' ছাড়া পাতুকে সে ভালও বাসে। দুর্গার কাছে পাতু অনেক ওকালতি করিয়াছিল অনিরুদ্ধের জন্য। অনিরুদ্ধের সঙ্গে কামারশালায়ও পাতু কাজ করিতেছে। মোটা মোটা লোহার জিনিসগুলি তাহারা দু'জনে বহিয়া বাহির করিতেছে। কাজ করিতে করিতেই চাষের সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছে। গরুর কথা। গরু কেমন কেনা হইবে—তাহা লইয়া আলোচনা।

পাতুর মতে দুর্গার নিকট হইতেই বলদ-বাছুরটা কেনা হউক, এবং হাট হইতে দেখিয়া-শুনিয়া তাহার একটা জোড়া কিনিয়া আনিলে —বড় চমৎকার হইবে!

অনিরুদ্ধ হাসিয়া বলিল—দুর্গার বাছুরটার দাম যে বেজায়!

—পাইকেরুরা একশো টাকা পর্য্যন্ত ব'লেছে! দুর্গা ধ'রে রইছে, —আরও পঁচিশ টাকা। তা তোমাকে সস্তা ক'রে দিবে। আমি শুদ্ধ আছি যখন।

হাসিয়া অনিরুদ্ধ বলিল—মোটে একশো টাকা আমার পুঁজি!

ও হবে না পাতু; ছোটখাটো গিঁঠ-গিঁঠ দুটো বাছুর কিনব। জমিও বেশী নয়—বেশ চ'লে যাবে।

—কিন্তু দধি-মুখো গরু কিনো বাপু। দধি-মুখো গরু ভারী ভালো—লক্ষণ-মান!

—চল না, হাটে তো দু'জনেই যাব।

পদ্ম বলিল তারিণীর ছেলেটাকে—হ্যাঁরে, আবার লোহার টুকরো কুড়োতে লাগ্‌লি? এই বুঝি তোর কাজ করা হ'চ্ছে?

ছোঁড়াটা উত্তর দিল না।

পাতু বলিল—এ্যাই-এ্যাই, ই তো আচ্ছা ছেলে রে, বাপু! এই ছেলে!

ছেলেটা দাঁত বাহির করিয়া পাতুকে একটা ভেংচি কাটিয়া দিল!

—ও বাবা, ই যে ভেংচি কাটতে লাগছে! বলিহারির ছেলে রে বাবা!

অনিরুদ্ধ বলিল—ধ'রে আন্! কানে ধ'রে নিয়ে আয় তো, পাতু।

পদ্ম হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল—ধ'রো না কামড়ে দেবে—কামড়ে দেবে।

ছোঁড়াটার ওই এক বদ অভ্যাস; কেহ ধরিলেই সঙ্গে সঙ্গে কামড় বসাইয়া দেয়। আর দাঁতগুলিতেও যেন ক্ষুরের ধার। অতর্কিত কামড়ে আক্রমণ-কারীকে বিব্রত করিয়া মুহূর্তে সে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া পলাইয়া যায়! ওই তাহার রণ-কৌশল। আজ কিন্তু পাতু ধরিবার আগেই ছোঁড়াটা উঠিয়া ভোঁ দৌড় দিল।

পদ্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—'উচিংড়ে,' 'উচিংড়ে,' ওরে অ 'উচিংড়ে,' যাস্ না কোথাও যেন, শুন্‌ছিস্?

ছেলেটার ডাকনাম 'উচ্চিংড়ে'; ভালনাম মা বাপে সখ করিয়া

একটা রাখিয়াছিল; কিন্তু সে তার বাপ মাই জানে, ছেলেটা নিজেও জানে না। উচ্চিংড়ে কিন্তু পদ্মের ডাক কানেই তুলিল না। তবে বাড়ীর দিকেই গেল—এই ভরসা। পদ্মও বাড়ীর দিকে চলিল।

অনিরুদ্ধ বলিল—চ'ল্‌লি কোথায়!

—দেখি, কোথায় গেল?

—যাক গে, মরুক গে। তোর কি? আপনার কাজ কর তুই!

—ষাট্‌। আজ ষষ্ঠীর দিন। তোমার মুখের আগল নাই?.... বড় বড় চোখে প্রদীপ্ত-দৃষ্টিতে চাহিয়া পদ্ম অনিরুদ্ধকে নীরবে তিরস্কার করিয়া চলিয়া গেল।

দাঁতে দাঁতে টিপিয়া অনিরুদ্ধও ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে পদ্মের দিকে চাহিয়া রহিল। পদ্ম কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না, বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। কথায় আছে—'না বিয়াইয়া কানুর মা', এ দেখিতেছি তাই! অনিরুদ্ধেরই মরণ।....

যাক, উচ্চিংড়ে অন্য কোথাও পালায় নাই। যতীনের মজলিসে গিয়া বসিয়াছে। যতীনের কথার সাড়া হইতেই পদ্ম উচ্চিংড়ের অস্তিত্ব অনুমান করিল।

—মা-মনি কোথায় রে?

—হুই কামারশালায়।

এই যে—তাহারই খোঁজ হইতেছে। পদ্ম হাসিল। কেন! মা-মনির খোঁজ কেন? ওই এক চাঁদ-চাওয়া ছেলে! এখন কি হুকুম হইবে কে জানে! সে ভিতরের দরজার শিকল নাড়িয়া সঙ্কেত জানাইল—মা-মণি মরে নাই, বাঁচিয়া আছে। ওপাশে যতীনের ঘরের বাহিরের বারান্দায় ভরপুর মজলিস চলিতেছে। দেবু, জগন, হরেন, গিরীশ, গদাই অনেকে আসিয়া জমিয়াছে। শিকল নাড়ার

শব্দ পাইয়া, হাসিয়া, যতীন বারান্দা হইতে ঘরে আসিয়া বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজায় দাঁড়াইল। কালি-ঝুলি-মাখা আপনার সর্ব্বাঙ্গ এবং কালো ছেঁড়া কাপড়খানার দিকে চাহিয়া পদ্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল—না না, ভেতরে এস না।

—আসব না?

—না, আমি ভূত সেজে দাঁড়িয়ে আছি।

হাসিয়া যতীন বলিল—ভূত সেজে?

(—হ্যাঁ। এই দেখ। দরজার ফাঁক দিয়া সে আপনার কালি-মাখা হাত দু'খানা বাড়াইয়া দেখাইল। এস না, জুজুবুড়ী! ভয় খাবে! সে একটি নূতন পুলকে অধীর হইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।)

যতীনও হাসিয়া বলিল—কিন্তু জুজু-মা, এখুনি যে চায়ের জল চাই। হাতটা কিন্তু ধুয়ে ফেলো।

পদ্ম এবার গজ্ গজ্ করিতে আরম্ভ করিল। চা—দিনের মধ্যে লোকে কয়বার খায়! তাহার যেমন কপাল। অনিরুদ্ধ মাতাল—যতীন মাতাল, ওই উচ্চিংড়েটা জুটল তো সেটা হইল দাঁতাল।

যতীন ফিরিয়া গিয়া মজলিসে বসিল। চা তাহার মজলিসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। হরেন ইহারই মধ্যে বার দুয়েক তাগাদা দিয়াছে।

—চা, কই মশায়? এ যে জমছে না।

মজলিসে আজ জগন বাংলা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের বক্তৃতা দিতেছে। উপস্থিত আলোচনা চলিতেছে প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন সম্ভাবনা সম্বন্ধে। বাংলা প্রদেশের আইন-সভায় প্রজাস্বত্ব আইন লইয়া জোর আলোচনা চলিতেছে। কথাটা উঠিয়াছে শ্রীহরি পালের সেদিনের সেই শাসন-বাক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে।...মাল জমি অর্থাৎ প্রজাস্বত্ববিশিষ্ট জমির উপর মূল্যবান বৃক্ষে প্রজার শুধু ফল ভোগের অধিকার ছাড়া আর কোন স্বত্ব নাই। গাছ জমিদারের।

জগন বলিতেছে—প্রজাস্বত্ব—আইনের সংশোধনে সে স্বত্ব হবে প্রজার। জমিদারের বিষ-দাঁত এইবার ভাঙল। সে দিন কাগজে সব বেরিয়েছিল—কি রকম কি সংশোধন হবে। আমি কেটে যত্ন করে রেখে দিয়েছি। ও আইন পাশ হবেই। ওঃ, স্বরাজ-পার্টির কী সব বক্তৃতা! একেবারে আগুণ ছুটিয়ে দিয়েছে।

গদাই জিজ্ঞাসা করিল—কি রকম কি সব হবে, ডাক্তার?

হরেন খবরের কাগজের কেবল হেড লাইনগুলি পড়ে আর পড়ে আইন-আদালতের কথা। বিস্তৃত বিবরণ পড়িবার মত ধৈর্য্য নাই; তবু সে বলিল—অনেক! সে অনেক ব্যাপার। ওই এত বড় একখানা বই হবে। বাঃ, অম্‌নি মুখে মুখেই—কি রকম কি সব হবে, ডাক্তার?

জগনেরও সব মনে নাই—সব সে বুঝিতেও পারে নাই, তবু সে অনেক বলিল।

প্রথমেই বলিল—গাছের উপর প্রজার স্বত্ব কায়েম হইবে।

হস্তান্তর আইনে জমিদারের উচ্ছেদ-ক্ষমতা উঠিয়া যাইবে।

খারিজ-ফিস্ নির্দ্দিষ্ট হইবে, এবং সে ফিস্ প্রজা রেজেষ্ট্রী আপিসে দাখিল করিবে।

মাল জমির উপরেও পাকা ঘর করিতে পাইবে।

মোট কথা, জমি প্রজার।

গদাই বলিল—কোর্ফার নাকি স্বত্ব হবে? ঠিকে ভাগেরও নাকি—

জগন বলিল—হ্যাঁ-হ্যাঁ। কোর্ফার স্বত্ব সাব্যস্ত হ'লে মানুষের আর থাকবে কি? নাকে তেল দিয়ে ঘুমো গিয়ে। ভাগে ঠিকের জমি সব তোর হয়ে যাবে।

দেবু আপন প্রকৃতি অনুযায়ী চুপ করিয়া বসিয়াছিল। কয়েক দিন হইতেই তাহার মনে অশান্তির শেষ নাই। সে ভাবিতেছে, সেদিনের সেই পাতু প্রমুখ বাউড়ি—বায়েনগুলির কথা। তাহার কথা শুনিয়া

তাহারা শ্রীহরিকে অমান্য করিয়া উঠিয়া আসিয়াছে। অচিরে শ্রীহরির শাসনদণ্ড কোন এক দিক দিয়া প্রচণ্ড আঘাতে তাহাদের মাথার উপর আসিয়া পড়িবেই। তাহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে; এবং তাহাকেই বাঁচাইতে হইবে। বাঁচাইতে সে ন্যায়ধর্ম্ম-অনুসারে বাধ্য। কিন্তু—,·· সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বিলু, খোকা, সংসার, জমাজমি সম্বন্ধে তাহার চিন্তা করিবার অবসর নাই। মধ্যে মধ্যে এমনি ভাবে ক্ষণিক দুশ্চিন্তার মত সাময়িকভাবে তাহাদিগকে মনে পড়িয়া যায়।

জগন বক্তৃতা দিয়াই চলিয়াছিল—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তা হ'লে আর দেখতে হ'ত না।

ওই নামটিতে আসরের সমস্ত লোকগুলির শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দেশবন্ধুর নাম, তাঁহার পরিচয় সকলেই জানে; তাঁহার ছবিও তাহারা দেখিয়াছে।

দেবুর চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল—তাঁহার মূর্ত্তি। দেশবন্ধুর ছবি সে বাঁধাইয়া ঘরে টাঙাইয়া রাখিয়াছে। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ছবির তলায় লিখিয়া দিয়াছেন—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥"

যতীন ভিতর হইতে ডাকিল—উচ্চিংড়ে।

মজলিসের মধ্যে বসিয়া উচ্চিংড়ের খেয়াল খুসীমত চাঞ্চল্য প্রকাশে সুবিধা হইতেছিল না। কিছুক্ষণ ধরিয়া পথের ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে একটা গিরগিটির শিকার দেখিতেছিল; দেখিতে দেখিতে যেই একটু সুস্থির শান্ত হইয়াছে, অমনি সেইখানেই শুইয়া ঘুমাইয়াছে। বেচারা!

হরেন তাহাকে ধমক দিয়া ডাকিল—এই ছোঁড়া, এই!

দেবু বলিল—ডেকো না। ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে।....সেই নিজেই ভিতরে উঠিয়া গিয়া যতীনকে বলিল—কি ক'রতে হবে বলুন।

যতীন বলিল—চায়ের বাটিগুলো দিয়ে দিন।

দেবুই সকলকে চা পরিবেশন করিয়া দিল। চা খাইতে খাইতে জগন আরম্ভ করিল—মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, জহরলাল নেহেরু, যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্রের কথা।

চা খাইয়া সকলে চলিয়া গেল। সকলের শেষে গেল দেবু। যাইবার জন্ম উঠিয়াছিল সর্ব্বাগ্রে সে-ই। কিন্তু যতীন বলিল—গোটা কয়েক কথা ছিল যে দেবুবাবু!

দেবু বসিল। সকলে চলিয়া গেলে যতীন বলিল—আর দেরি ক'রবেন না, দেবুবাবু! সমিতির কাজটা নিয়ে ফেলুন।

সমিতি—প্রজা-সমিতি। যতীন বলিতেছে, দেবুকে সমিতির ভার লইতে হইবে।

দেবু চুপ করিয়া রহিল।

—আপনি না' হলে হ'বে না, চ'লবে না। সকলেই আপনাকে চায়। হয়তো ডাক্তার মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হবে। হোক সে ক্ষুণ্ণ, কিন্তু একটা জিনিস গড়ে উঠেছে—সেটাকে ভাঙতে দেওয়া উচিত হবে না।

দেবু বলিল—আচ্ছা, কাল ব'লব আপনাকে।

যতীন হাসিল; বলিল—ব'লবার কিছু নাই। ভার আপনাকে নিতেই হবে।

দেবু চলিয়া গেল যতীন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।....

বাংলার পল্লীর দুর্দ্দশার কথা সে ছাত্র-জীবনে অনেক পড়িয়াছে, শুনিয়াছে সরকারী ষ্ট্যাটিষ্টিক্স এবং নানা গ্রন্থ-পত্রিকায় বর্ণনা পড়িয়াও কিন্তু এ-রূপ সে কল্পনা করিতে পারে নাই। সবে এই চৈত্র মাস,

কৃষিজাত শস্যসম্পদ এখনও সম্পূর্ণ শেষ হইয়া মাঠ হইতে ঘরে আসে নাই, ইহারই মধ্যে মানুষের ভাণ্ডার রিক্ত হইয়া গিয়াছে। ধান শ্রীহরির ঘরে গিয়াছে, জংসনের কলে গিয়াছে। গম, যব, কলাই, আলু—তাহাও লোকে বেচিয়াছে। তিল এখনও মাঠে কিন্তু তাহার উপরেও পাইকার দাদন দিয়া গিয়াছে। ইহারই মধ্যে একদিন শ্রীহরির খামারে একটি জনতা জমিয়াছিল, শ্রীহরি ধান-ঋণ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই গ্রামের মাঠে বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের প্রায় সবই নাকি মহাজনের কাছে আবদ্ধ। অধিকাংশই আবদ্ধ শ্রীহরির কাছে। পল্লীর প্রতিটি ঘর জীর্ণ, শ্রীহীন; মানুষগুলি মূক; পশুগুলি দুর্ব্বল। চারিপাশে কেবল জঙ্গল; খানায় খন্দকে পল্লীপথ দুর্গম। সেদিনের বৃষ্টিতে সমস্ত পথটাই কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। স্নানের ও পানের জলের পুকুর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। প্রকাণ্ড বড় দীঘি, কিন্তু জল আছে সামান্য খানিকটা স্থানে, গভীরতা মাত্র হাতখানেক কি হাত দেড়েক। সেদিন একটা লোককে সে পলুই চাপিয়া ওই দিঘীতে মাছ ধরিতে দেখিয়াছিল। পাকে-জলে ভাল করিয়া লোকটার কোমরও ডোবে নাই।

আশ্চর্য্য! ইহার মধ্যেই মানুষ বাঁচিয়া আছে!

বিশেষজ্ঞেরা বলেন—এ বাঁচা প্রেতের বাঁচা। অথবা ক্ষয়-রোগাক্রান্ত রোগীর দিন গণনা করিয়া বাঁচা। তিল-তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে—নিশ্চেষ্ট আত্ম-সমর্পণের মধ্য দিয়া।

এখানে প্রজা-সমিতি কি বাঁচিবে? সঞ্চয় সম্বলহীন চাষী গৃহস্থের সম্মুখে চাষের সময়—কঠিন গ্রীষ্ম, দুর্য্যোগ-ভরা বর্ষা! চোখের উপর শ্রীহরির খামারে রাশি রাশি ধান্য-সম্পদ। সেখানে প্রজা-সমিতি কি বাঁচিবে—না, কাহাকেও বাঁচাইতে পারিবে? সমিতির প্রত্যক্ষ এবং প্রথম সঙ্ঘর্ষ হইবে যে শ্রীহরির সঙ্গে। হইবে কেন, আরম্ভ তো হইয়াই গিয়াছে।

সম্মুখের দাওয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে 'উচ্চিংড়ে'!

ওই পল্লীর ভাবী পুরুষ! নিঃস্ব, রিক্ত, গৃহহীন, স্বজনহীন, আত্মসর্ব্বস্ব। যে-নীড়ের মমতায় মানুষ শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর তপস্যা করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে চায়—সে-নীড় তাহার ভাঙিয়া গিয়াছে।...

পদ্মের শাসন-বাক্যের ঝঙ্কারে তাহার চিন্তার একাগ্রতা ভাঙিয়া গেল। ষষ্ঠী-পূজার থালা হাতে সে ঝঙ্কার দিতে দিতে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার স্নান হইয়া গিয়াছে; পরণে পুরানো একখানি শুদ্ধ কাপড়। সে বলিল—কি ছেলে বাবা তুমি? পঞ্চাশবার শেকল নেড়ে ডাকছি, তা' শুনতে পাও না? যাক, ভাগ্যি আমার, সাঙ্গপাঙ্গরে দল সব গিয়েছে। নাও—ফোঁটা নাও। উঠে দাঁড়াও।

যতীন হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শুচিস্মিতা পদ্ম কপালে তাহার দই-হলুদের ফোঁটা দিয়া বলিল—তোমার মা আজ দরজার বাজুতে তোমাকে ফোঁটা দেবে।

ফোঁটা দিয়া পদ্ম ডাকিল—উচিঙ্গে! অ উচিঙ্গে! ওরে! দেখতে', ছেলের ঘুম দেখতো অসময়ে! এই উচিঙ্গে!

উচিংড়ের বেশ একদফা ঘুম হইয়াছিল, বেলায় ক্ষুধাও পাইয়াছিল, দুই তিনবার ডাকিতেই সে উঠিয়া বসিল!

—ওঠ্, উঠে দাঁড়া, ফোঁটা দি। ওঠ্ বাবা, ওঠ্!

উচ্চিংড়ে দাঁড়াইয়া প্রথমেই হাত পাতিল—পেসাদ! পেসাদ! দাও! পদ্ম হাসিয়া ফেলিল,—দাঁড়া, আগে ফোঁটা দি!

উচ্চিংড়ে খুব ভাল ছেলেটির মত কপাল পাতিয়া দাঁড়াইল; পদ্ম ফোঁটা পরাইয়া দিল।

যতীন বলিল—প্রণাম কর্, উচ্চিংড়ে। প্রণাম ক'রতে হয়। দাঁড়াও, মা-মণি' আমি একটা—।

—বাবারে বাবারে! আমাকে তুমি নরকে না পাঠিয়ে ছাড়বে না।

পদ্ম মুহূর্তে উচ্চিংড়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া একপ্রকার ছুটিয়াই ভিতরে চলিয়া গেল।

* * * *

চৈত্রের দ্বিপ্রহর। অলস বিশ্রামে যতীন দাওয়ার তক্তাপোষখানির উপর শুইয়াছিল। চারিদিক বেশ রৌদ্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। উত্তপ্ত বাতাস—এলোমেলো গতিতে বেশ জোরেই বহিতেছে। বড় বড় বট, অশ্বত্থ, শিরীষ গাছগুলি কচি পাতায় ভরা; উত্তাপে কচিপাতাগুলি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সেদিনের বৃষ্টির পর মাঠে এখন হাল চলিতেছে, চাষীরা এতক্ষণে হাল-গরু লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, ঘর্ম্মসিক্ত কালো চামড়া রৌদ্রের আভায় চক্-চক্ করিতেছে তৈলাক্ত লোহার পাতের মত; বাউড়ি-বায়েনদের মেয়েরা গোবর, কাঠ, কুটা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। সম্মুখেই রাস্তার ওপাশে একটা শিরীষ গাছের সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া কি একটা লতা—লতাটির সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া ফুল। চারিপাশে মৌমাছি ও ভ্রমরের গুনগুনানি যেন এক মৃদুতম ঐকতান-সঙ্গীতের একটা সূক্ষ্ম জাল বিছাইয়া দিয়াছে। গোটা-কয়েক মধুচটকি পাখী নাচিয়া নাচিয়া এ-ডাল, ও-ডাল করিয়া ফিরিতেছে। দূরে কোথায় ডাকিতেছে কোকিল। 'চোখ গেল' পাখীটার আজ সাড়া নাই। কোথায় গিয়া পড়িয়াছে—কে জানে! আকাশে উড়িতেছে—কয়েকটা ছোট ঝাঁকে—একদল বন-টিয়া; মাঠের তিল-ফসলে তাহাদের প্রত্যাশা। অসংখ্য বিচিত্র রঙীন প্রজাপতি ফড়িং ভাসিয়া ভাসিয়া ফিরিতেছে—দেবলোকের বায়ু-তাড়িত পুষ্পের মত।

গন্ধে—গানে—বর্ণচ্ছটায়—পল্লীর এই এক অনিন্দ্যরূপ। কবির কাব্যের মতই এই গন্ধে গানে বর্ণচ্ছটায় যেন একটা মাদকতা আছে, কেমন একটা হাতছানির ইসারা আছে। হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া সেই

ইসারার ডাকেই যেন মোহগ্রস্তের মত যতীন বাহির হইয়া পড়িল। কাছেই কোন গাছের মধ্যে ডাকিতেছে একটা পাখী। অতি সুন্দর ডাক। শুধু স্বরই সুন্দর নয়, ডাকের মধ্যে সঙ্গীতের একটা সমগ্রতা আছে; পাখীটা যেন কোন গানের গোটা একটি কলি গাহিতেছে। পাখীটার খোঁজেই যতীন সন্তর্পণে ওই জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। খানিকটা ভিতরে গিয়া পাইল সে অপূর্ব্ব মধুর গন্ধ। ধ্বনি এবং গন্ধের উৎসমূল আবিষ্কার করিবার জন্য সে অগ্রসর হইয়া চলিল। আশ্চর্য্য! পাখীটা এবং ফুলগুলি তাহার সঙ্গে কি লুকোচুরি খেলিতেছে? শব্দ এবং গন্ধ অনুসরণ করিয়া যত সে আগাইয়া আসিতেছে—তাহারাও যেন তত সরিয়া চলিয়াছে। মনে হয় ঠিক ওই গাছটা; কিন্তু সেখানে আসিলেই পাখী চুপ করে—ফুল লুকাইয়া পড়ে। আবার আরও দূরে পাখী ডাকিয়া উঠে। গন্ধ মনে হয় ক্ষীণ; উৎসস্থান আরও দূরে। মোহগ্রস্তের মত যতীন আবার চলে।

—বাবু!…কে ডাকিল? নারী-কণ্ঠ যেন।

যতীন পাশে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল—একটা গাছের শিকড়ের উপর বসিয়া দুর্গা।

—দুর্গা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।….আঁট-সাঁট করিয়া গাছ-কোমর বাঁধিয়া কাপড় পরিয়া দুর্গা বসিয়া কি যেন কুড়াইতেছে।

—ওগুলো কি? কি কুড়োচ্ছ?

এক অঞ্জলি ভরিয়া দুর্গা তাহার হাতে ঢালিয়া দিল! টোপা-টোপা স্ফটিকের মত সাদা—এগুলি কি? এই তো সেই মদির গন্ধ। ইহারই এক ছড়া মালা গাঁথিয়া দুর্গা গলায় পরিয়াছে। বিলাসিনী মেয়েটির দিকে যতীন অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গঠন-ভঙ্গিতে, চোখ-মুখের লাবণ্যে, রুক্ষ-চুলে মেয়েটার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া একটা অদ্ভুত রূপ আছে;

দুর্গা মৃদু হাসিয়া বলিল—মউ-ফুল !

—মউ-ফুল ?

—মহুয়া ফুল, বাবু, আমরা বলি মউ-ফুল !

যতীন ফুলগুলি তুলিয়া নাকের কাছে ধরিল ; সে এক উগ্র মদির গন্ধ—মাথার ভিতরটা যেন কেমন হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

—কুড়িয়ে রাখছি, বাবু, গরুতে খাবে,—দুধ বাড়বে। আবার···দুর্গা হাসিল।

—আর কি ক'রবে ?

—আর সে—সে আপনাকে শুনতে হবে না।

—কেন, আপত্তি কি ?

—আর আমরা মদ তৈরী করি।

—মদ ?

—হ্যাঁ।···পিছন ফিরিয়া দুর্গা হাসিতে লাগিল ; তারপর বলিল—কাঁচাও খাই, ভারী মিষ্টি।

যতীন টপ্ করিয়া একটা মুখে ফেলিয়া দিল। সত্যই চমৎকার মিষ্টি ; কিন্তু মিষ্টতার মধ্যেও ওই মাদকতা। আবার একটা সে খাইল। আবার একটা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহার কানের ভিতরটা যেন গরম হইয়া উঠিল ; নাকের ভিতর নিশ্বাস—উগ্র উত্তপ্ত। কিন্তু অপূর্ব্ব এই মধু-রস।

দুর্গা সহসা চকিত হইয়া বলিল—পাড়ার ভেতর গোল উঠেছে লাগছে ! হ্যাঁ তাইত !···সে তাড়াতাড়ি ঝুড়িটা কাঁখে তুলিয়া লইয়া বলিল—আমি চ'ললাম, বাবু ! পাড়াতে কি হ'ল দেখি গিয়ে।

যাইতে যাইতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—মউ আর খাবেন না, বাবু, মাদকে হবে।

—কি হবে ?

—মাদকে। নেশা—নেশা।…দুর্গা চলিয়া গেল।

নেশা। তাইতো তাহার মাথার ভিতরটা যেন ঝিম্-ঝিম্ করিতেছে। সর্ব্বশরীরে একটা জ্বালা, দেহের উত্তাপও যেন বাড়িয়া গিয়াছে।

—বাবু! বাবু!

আবার কে ডাকিতেছে? কে? জঙ্গলের ভিতর আসিয়া ঢুকিল—উচ্চিংড়ে।

—গাঁয়ে খুব গোল লেগে গিয়েছে বাবু। কালু স্যাথ বাউড়িদের গরু ধ'রে নিয়ে গ্যালো।

—গরু ধ'রে নিয়ে গেল?—কালু সেখ কে? নিল কেন?

—কালু স্যাথ—ছিরু ঘোষের প্যায়দা। দেখ না এসে—তোমাকে সব ডাকছে।

যতীন দ্রুতপদে ফিরিল। উচ্চিংড়ে চড়িয়া বসিল মহুয়া গাছে। একেবারে মগ ডালে উঠিয়া পাকা ফল পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল।….

শ্রীহরি ভুলিয়া যায় নাই, ভুলিবার তাহার কথাও নয়। এ গ্রামের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য লোকত ধর্ম্মত সে-ই দায়ী। প্রতিটি মুহূর্ত্তে সে দায়িত্ব শ্রীহরি উপলব্ধি করে, অনুভব করে। (বিপদে-বিপর্য্যয়ে সে তাহাদের রক্ষা করিবে, আর শৃঙ্খলা ভাঙিলে সে তাহাদের শাস্তি দিবে—বিদ্রোহকে কঠিন হস্তে দমন করিবে।) এ তাহার অধিকার। যখন সে অত্যাচারী ছিল, তখন তাহার অধিকার ছিল না—এ কথা সে স্বীকার করে। কিন্তু আজ সে কোন অন্যায় করে না—আজ সমস্ত গ্রামখানাতেই তাহার কর্ত্তব্যপরায়ণতার, ধর্ম্মপরায়ণতার পরিচয় শ্রীমণ্ডিত মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; চণ্ডীমণ্ডপ, ষষ্ঠীতলা, কূপ, স্কুল-ঘর—সব সে আপনা হইতে করিয়া দিয়াছে। রাস্তার ঐ নালাটা

আবহমান কাল হইতে একটা দুর্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন; সে নিজে হইতেই সে বিঘ্ন দূর করিবার আয়োজন করিতেছে। শিব-কালীপুরের সকল ব্যবস্থাকে সে-ই পরম যত্নে সুষ্ঠু করিয়া তুলিতেছে। সেই সুব্যবস্থাকে অব্যবস্থায় পরিণত করিতে যে-বিদ্রোহ, সে বিদ্রোহ দমন করা কেবল তাহার অধিকার নয়—কর্ত্তব্য। তবে প্রথমেই সে কঠিন শাস্তি দিতে চায় না। চণ্ডীমণ্ডপ ছাওয়ানোর জন্য যাহারা মজুরি চায়, বলে—জমিদারের চণ্ডীমণ্ডপ—তাহারা বিনা মজুরিতে খাটিবে কেন, তাহাদের সে বুঝাইয়া দিতে চায়—বিনা বিনিময়ে জমিদারের কতখানি তাহারা ভোগ করে। মাত্র ওই কয়খানা তালপাতাই তাহারা লয় না। জমিদারের খাস পতিত ভূমি—তাহাদের গরু-বাছুরের একমাত্র চারণ-ভূমি। তাই সে নব-নিযুক্ত কালু সেখ চাপরাশীকে হুকুম দিয়াছে—জমিদার-সরকারের বাঁধে কিংবা পতিত-জমিতে বাউড়ি-বায়েনদের গরু অনধিকারে প্রবেশ করিলেই গরুগুলিকে আগল করিয়া কঙ্কণার ইউনিয়ন বোর্ডের খোঁয়াড়ে দিয়া আসিবে। নব-নিযুক্ত কালু মনিবকে কাজ দেখাইতে উদ্‌গ্রীব, তাহার উপর এ-কাজটা লাভের কাজ;—খোঁয়াড়ওয়ালা এ-ক্ষেত্রে গরু-পিছু কিছু-কিছু প্রকাশ্য-চলিত ঘুষ দিয়া থাকে। সে ভূমি-নত এক সেলাম ঠুকিয়া তৎক্ষণাৎ মনিবের হুকুম প্রতিপালন করিতে চলিল। ভূপাল তাহাকে দেখাইয়া দিল—কোন্‌গুলি শ্রীহরির অনুগত লোকের গরু সেগুলি বাদ দিয়া, বাকি গরুগুলি সে ধরিয়া লইয়া গেল খোঁয়াড়ে।

শ্রীহরির গ্রাম-শাসনের এই দ্বিতীয় পর্য্যায়। ইহাতেও যদি লোকে না বুঝে, তবে আরও আছে। একেবারেই সে কঠিনতম দণ্ড দিবে না। অধর্ম সে করিবে না। লক্ষ্মী তাহাকে কৃপা করিয়াছেন, সে তাহার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল, সে উহার অপব্যবহার করিবে না। দানের

তুল্য পুণ্য নাই—দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই—শাস্তিবিধানের সময়েও সে কথা সে বিস্মৃত হইবে না। তাহার ইচ্ছা ছিল, গরুগুলাকে আটক করিয়া তাহার বাড়ীতেই রাখিবে, বাউড়ি-বায়েনের দল আসিয়া কান্নাকাটি করিলে তাহাদের অন্যায়টা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবে। তাহা হইলে গরীবদের আর খোঁয়াড়ের মাশুলটা লাগিত না; মাশুলও বড় কম নয়, গরু-পিছু চারি আনা হিসাবে চল্লিশ পঞ্চাশটা গরুতে দশ-বারো টাকা লাগিবে। আবার সামান্ত বিলম্ব হইলেই খোঁয়াড-ভেণ্ডার এক আনা হিসাবে খেয়াকি দাবি করিবে। অথচ খোরাকি এক কুটা খড়ও দেয় না—গরুগুলাকে অনাহারেই রাখে। খোরাকী হিসাবেও টাকা আড়াই-তিন লাগিবে। কিন্তু সে কি করিবে? আইন তাই বে-আইনী করিতে গেলেই—দেবু জগন হয়তো তাহাকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য মামলা বা দরখাস্ত করিয়া বসিবে।....চণ্ডীমণ্ডপে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সে অলস দৃষ্টিতে গ্রাম-হিতৈষীদের ব্যর্থ বিক্রম লক্ষ্য করিতেছিল। কিন্তু এত শীঘ্র খবরটা আনিল কে?

খবরটা আনিয়াছিল তারাচরণ নাপিত! কালু সেখ গরুগুলাকে আটক করিলে, রাখাল ছেলেরা মিনতি করিয়া কাঁদিয়া কালু সেখের পায়ে গড়াইয়া পড়িল।—ওগো স্যাখজী গো! তোমার পায়ে পড়ি, মশাই; ছেড়ে দ্যান্; আজকের মত ছেড়ে দ্যান!

সেখের ক্রোধ হয় নাই, ক্রোধ হইবার হেতুও ছিল না, তবু ছোঁড়াগুলার ওই হাতে-পায়ে ধরা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্যই কৃত্রিম ক্রোধে একটা ভয়ঙ্কর রকমের হাঁক মারিয়া উঠিল—ভাগো হিয়াসে।

ঠিক সেই সময়েই ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের উপর দিয়া আসিতে-ছিল তারাচরণ ভাণ্ডারী। সে থমকিয়া দাঁড়াইল। ছেলেগুলা সেখজীর হাঁকে ভয় পাইয়া খানিকটা পিছাইয়া গেলেও গরুগুলির সঙ্গ ছাড়িতে

পারিল না। জন দু'য়েক রাখাল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল,—ভাষাহীন হাউ হাউ করিয়া কান্না।

কালু বলিল—ওরে উল্লুক, বেকুব, ছুঁচারা সব, বাড়ীতে বুল্ গা যা। হাউ মাউ করে চিল্লাস্ না।

ছেলেগুলা সেকথা বুঝিল না, তাহারা ওই গরুগুলির মমতার আকর্ষণেই গরুর পালের পিছনে পিছনে চলিল। কান্নার বিরাম ছিল না।—ওগো, কি ক'রব গো!—কি হবে গো?

সেখ আবার পিছনে তাড়া করিল—ভাগ্ বুলছি!

ছেলেগুলা খানিকটা পিছাইয়া আসিল; কিন্তু সেখ ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারাও আবার ফিরিল।

তারাচরণ ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। কাল শ্রীহরির পায়ের নখের কোণ তুলিতে তুলিতে সে খানিকটা আভাসও পাইয়াছিল। তারাচরণ দ্রুতপদে গ্রামে ফিরিয়া দেবুর খিড়কীর দরজায় সন্তর্পণে ডাকিয়া সংবাদটা দিয়া চলিয়া গেল। বলিল—শীগ্গির ব্যবস্থা কর ভাই, নইলে এক আনা ক'রে ফাজিল লেগে যাবে। সে-ও আড়াই টাকা, তিন টাকা। ছ'টা বাজলে আজ আর গরু দেবেই না। কাল দু-আনা করে বেশী লাগবে গরুতে।

খিড়কীর দরজা দিয়াই সে বাহির হইয়া চলিয়া গেল। শ্রীহরি ঘোষ যে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। পণ্ডিতের বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিলেই ঘোষ ঠিক তাহাকে সন্দেহ করিয়া বসিবে। জঙ্গলের আড়াল হইতে তারাচরণ এক ফাঁক দিয়া চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার অনুমান অভ্রান্ত। এক ঝিলিক সকৌতুক হাসি তারাচরণের মুখে খেলিয়া গেল।

* * * *

দেবু কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আজ কয়েকদিন হইতেই যে-আঘাত সে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিল—সে-আঘাত আসিয়াছে। ইহার দায়িত্ব সমস্তটাই প্রায় তাহার। এ কথা সে কোন দিন মুহূর্তের জন্ম আপনার কাছে অস্বীকার করে নাই। আঘাতটা আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপন মাথা পাতিয়া দিয়া নির্দোষ গরীবদের রক্ষা করিবার জন্ম অহরহ সচেতন হইয়াই সে প্রতীক্ষা করিতেছে।।

গরীবেরা পয়সাই বা পাইবে কোথায়? তারাচরণ বলিয়া গেল, এক আনা হিসাবে বেশী লাগিলে—আড়াই টাকা, তিন টাকা বেশী লাগিবে। তাহা হইলে গরু অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশটি। মনে মনে সে হিসাব করিয়া দেখিল—দশ টাকা হইতে পনের টাকা দণ্ড লাগিবে। এ দণ্ড উহারা কোথা হইতে দিবে? জমি নাই, জেরাত নাই,—সম্বলের মধ্যে ভাঙা বাড়ী আর ওই গরু ছাগল। গাই গরুর দুধ বিক্রী করে, গোবর হইতে ঘুটে বিক্রী করে, গরু-বাছুর-ছাগল বিক্রী করে;—ওই পশুগুলিই তাহাদের একমাত্র সম্পদ। ইছুসেখ এ সময়ে টাকা দিতে পারে, কিন্তু তাহার একটাকার মূল্য হিসাবে অন্তত সে দুইটাকা আদায় করিয়া লইবে। তা'ছাড়া উহাদের এই বিপদের জন্ম দায়ী একমাত্র সে-ই। সে বেশ জানে, সেদিন ওই তালপাতা উপলক্ষ করিয়াই একটা মিটমাট হইয়া যাইত, উহারা শ্রীহরির বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া বাঁচিত। কিন্তু সে-ই তাহাদিগকে উঠিয়া আসিতে বলিয়াছিল। অন্যায়কে অস্বীকার করিতে সে-ও প্রেরণা দিয়াছিল। আজ নিজের বেলায় ন্যায়কে—ধর্ম্মকে মাথায় তুলিয়া না লইলে চলিবে কেন?

আরও কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিল—বিলু!

তারাচরণ ডাকিতেই বিলুও আসিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল। সংবাদটা দিয়া তারাচরণ চলিয়া গেলেও বিলু দেবুর সম্মুখে না আসিয়া

নীরবে সেই আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিল। ওই গরীবদের কথা ভাবিতে-ছিল। আহা, গরীব। উহাদের উপর নাকি এই অত্যাচার করে। এই স্তব্ধ দুপুরে বাউড়ি বায়েন-পাড়ায় মেয়েদের সকরুণ কান্না শোনা যাইতেছে। শুনিয়া বিলুরও কান্না পাইল, সে কাঁদিতেছিল। দেবুর ডাক শুনিয়া, তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

দেবু বিলুর সর্ব্বাঙ্গ অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। কোথাও এক টুকরা সোনা নাই। চাষীর ঘরে সোনার অলঙ্কারের বড় প্রচলন নাই; খুব জোর—নাকে নাকচাবি, কানে ফুল, গলায় বিছাহার, হাতে শাঁখাবাঁধা; বিলুর সে সব গিয়াছে।

বিলু বলিল—কি ব'ল্‌ছ?

—কিছুই নাই আর?

—কি?

—বাঁধা দিয়ে গোটা পনেরো টাকা পাওয়া যায়—এমন কিছু?

বিলু কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বোধ করি তাহার সকল ভাণ্ডার মনে মনে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল। তারপর সে ঘরের ভিতর গিয়া দুইগাছি ছোট বালা হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

দেবু দুই-পা পিছাইয়া গেল—খোকার বালা?

—হ্যাঁ।

এই বালা দুইগাছি দিয়াছিল বিলুর বাপ। দেবুর অনুপস্থিতিতে শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও বিলু এ দু'টিকে হস্তান্তর করিতে পারে নাই।

বিলু বলিল—নাও।

—খোকার বালা নেব?

—হ্যাঁ নেবে। আবার যখন হবে তোমার, তুমি গড়িয়ে দেবে।

—যদি খালাস্ না হয়, আর গড়াতে না পারি?

—প'রবে না খোকা।

দেবু আর দ্বিধা করিল না। বালা দুইগাছা লইয়া জামাটা গায়ে দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।...

গরুগুলিকে খালাস করিয়া ফিরিল সে সন্ধ্যার সময়! অর্দ্ধেকদিন রৌদ্রে ঘুরিয়া জামা-কাপড় ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে; তাহার উপর একপাল গরুর পায়ের ধূলায় সর্ব্বাঙ্গ কাদায় আচ্ছন্ন। যতীনের দুয়ারে তখন বেশ একটি মজলিস বসিয়া গিয়াছে।

সকলে প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল—কি হ'ল ?

—ছাড়ানো হ'য়েছে গরু।...দেবু তৃপ্তির হাসি হাসিল।

—কত লাগ্‌ল ?

সে কথার উত্তর না দিয়া দেবু বলিল—যতীন বাবু!

—বলুন।

—একটা কথা ব'লব আপনাকে।

—দাঁড়ান্; আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে একটু চা করি আপনার জন্য।

—না। এখনি বাড়ী যাব আমি। কথাটা ব'লে যাই।

যতীন দেবুকে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

/দেবু বলিল—প্রজা-সমিতির ভার নেব আমি। ✓

—দাঁড়ান্, চা খেয়ে তবে যেতে পাবেন।

সে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ডাকিল—মা-মণি! মা-মণি!

কেহ সাড়া দিল না।

পদ্ম বাড়ীতে নাই, সে গিয়াছে—উচ্চিংড়ের সন্ধানে; উচ্চিংড়ে এখনও ফিরে নাই, তাহাকেই খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

যতীন নিজেই চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

তেইশ

হরেন ঘোষালের উত্তেজনা—সে এক ভীষণ ব্যাপার। সে গোটা গ্রামটার পথে পথে ঘোষণা করিয়া দিল—প্রজা-সমিতির মিটিং! প্রজা-সমিতির মিটিং! স্থানটার উল্লেখ করিতে সে ভুলিয়াই গেল। ঠিক ছিল মিটিং হইবে ওই বাউড়ি-পাড়ার ধর্ম্মরাজতলায়। কিন্তু ঘোষাল সে-কথা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাওয়ায় লোকজন আসিয়া জমিল—নজরবন্দী বাবুর বাসার সম্মুখে। হরেন বলিল তবে এইখানেই হোক। আবার এখান থেকে ওখান; তা ছাড়া এখানে চা করা যাবে দরকার হ'লে। চেয়ার-টেবিল রয়েছে এখানে। এখানেই হোক।

সঙ্গে সঙ্গে সে যতীনের টেবিল-চেয়ার টানিয়া বাহিরে আনিয়া রীতিমত সভার আসর সাজাইয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে দুই গাছা মালাও সে গাঁথিয়া ফেলিয়াছে। ওটাতে তাহার ভুল হয় না।

লোকজন অনেক জমিয়াছে! বাউড়ি-বায়েনরা প্রায় সকলেই আসিয়াছে। গ্রামের চাষীরাও আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া আজিকার গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার জন্য সকলেই বেশ একটু উত্তেজিতও হইয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ জমিদারের খাস খতিয়ানের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ওই বাঁধ তৈয়ারী করিয়াছে তো প্রজারাই। সেখানে চিরকাল লোক গরু চরাইয়া থাকে। গ্রামের পতিত জমিও লোকে আবহমান কাল গোচারণ-ভূমি হিসাবে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। সেখানে গোচারণ করিবার অধিকার নাই—এই কথা সকলকেই উত্তেজিত করিয়াছে। আজ ওই অন্যায় আইন বাউড়ি-বায়েনদের পক্ষে প্রযুক্ত হইল—কাল যে সকলের পক্ষেই তাহা প্রযোজ্য হইবে।...বায়েন-বাউড়িরা এত বুঝে নাই। তাহারা শুনিয়াছে—পণ্ডিত মশায় কমিটির কর্ত্তা হইবেন। তাই শুনিয়াই তাহারা সকৃতজ্ঞ চিত্তে

আসিয়াছে। তাহাদের জন্ত পণ্ডিত আজ যাহা করিয়াছে, সে যে তাহাদের কল্পনাতীত, কেহ কখনও তাহা করে না। তাহারা সকৃতজ্ঞ চিত্তে আসিয়াছে, নির্ভয়ে আসিয়াছে।

তাহাদের পাড়ায় আজ ঘরে ঘরে পণ্ডিতের কথা। দুর্গার মা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতেছে।—মাথার চুলের মত পেরমাই হবে, সোনার দোত-কলম হবে, বেটার কোলে বেটা হবে, লক্ষ্মী উথলে উঠবে। সোনার মানুষ, পণ্ডিত সোনার মানুষ!...

সন্ধ্যার সময় আপনার ঘরে বালিশে বুক রাখিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিয়া দুর্গাও ওই কথা ভাবিতেছিল—সোনার মানুষ, পণ্ডিত সোনার মানুষ! বিলু-দিদি তাহার ভাগ্যবতী! আজ ওই সুকুমার নজরবন্দী বাবুটিও পণ্ডিতের তুলনায় হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা হইল—একবার মজলিসে যায়, দশের মধ্যে পণ্ডিত উঁচু মাথা করিয়া বসিয়া আছে, সেই দৃশ্যটি আড়ালে থাকিয়া দেখিয়া আসে। আবার ভাবিল—না, মজলিস ভাঙুক, সে বিলু দিদির বাড়ী যাইবে, গিয়া পণ্ডিত-জামাইয়ের সঙ্গে দুইটা রসিকতা করিয়া আসিবে। সে ভাবিতেছিল—কি করিয়া কথা আরম্ভ করিবে!

আবার ওদিকে নজরবন্দীকে বলিবার মত অনেক কথা তাহার মনে ঘুরিতেছে।

—মউ-ফুলের মধু কেমন লাগল বাবু?

আপন মনেই দুর্গা হাসিল। বাবুর চোখের কোণে লালচে আমেজ সে স্পষ্ট দেখিয়াছে।...

কিন্তু পণ্ডিতকে সে কি বলিবে!

দুর্গার কোঠার সম্মুখে অমর কুণ্ডার মাঠ, তারপরে নদীর বাঁধ;—বাঁধের উপর দিয়া একটা আলো আসিতেছে। আলোটা মাঠে নামিল।...

পণ্ডিত বড় গভীর লোক।...সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। তারপর সহসা সে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কথা সে খুঁজিয়া পাইয়াছে।....

—জামাই পণ্ডিত, তুমি ভাই আবার পাঠশালা খোল।

—কে পড়বে?

—কেউ না পড়ে আমি পড়ব। নেকাপড়া শিখব আমি।...।

ওঃ, আলোটা তাহাদের গ্রামেই আসিতেছে। হাতে ঝুলানো লণ্ঠনের আলোয় চলন্ত মানুষের গতিশীল পা দু'খানা বেশ দেখা যাইতেছে। কে? কাহারা? একজন লণ্ঠন হাতে আসিতেছে, পিছনে একজন—একজন নয়, দুইজন। বায়েন পাড়ার প্রান্ত দিয়া পথ আগন্তকেরা কাছে আসিয়া পড়িল।

এ কি! আলো হাতে ভূপাল থানদার, তাহার পিছনে ওযে জমাদারবাবু, জমাদারের পিছনে সেই হিন্দুস্থানী সিপাহীটি। ছিরুপালের বাড়ীতে চলিয়াছে নিশ্চয়। (ছিরুপালের নিমন্ত্রণে রাত্রে জমাদারের আগমন এমন কিছু নূতন কথা নয়। পূর্ব্বে এমন আসরে দুর্গারও নিমন্ত্রণ ছিল নিয়মিত। কিন্তু জমাদারের সঙ্গে সেপাহী থাকার কথা নয়। জমাদার বাবুর আজ এমন পোষাকই বা কেন? সে যে একেবারে খাঁটি জমাদারের পোষাক আঁটিয়া আসরে আসিতেছে! সিপাহীর মাথায়-পাগড়ী তা' ছাড়া শ্রীহরির নিমন্ত্রণের আসর তো প্রথম রাত্রে বসে না। সে আসর বসে মধ্যরাত্রে, বারোটা নাগাৎ;.... দুর্গা একটু চকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল নজরবন্দীকে, জামাই পণ্ডিতকে। কেন—সে তাহা জানে না। কিন্তু তাহাদের দুজনকেই মনে হইল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। শুক্লাষষ্ঠীর চাঁদ তখন অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার

আত্মগোপন করিয়া পথের পাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া সে তাহাদের অনুসরণ করিল।)

(চণ্ডীমণ্ডপ আজ অন্ধকার। ছিরু পাল আজ চণ্ডীমণ্ডপে বসে নাই। পালের—পাল নয়, আজকাল ঘোষ মহাশয়!—ঘোষ মহাশয়ের খামার বাড়ীর বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ভূপালের আলো গিয়া ওইখানেই প্রবেশ করিল। নিমন্ত্রণই বটে। চণ্ডীমণ্ডপ দেবস্থল সেখানে এ আসর চলে না। কিন্তু শ্রীহরি আজকাল নাকি—।... কথাটা মনে পড়িতেই দুর্গা না হাসিয়া পারিল না।

এক একটা গরু রাত্রে দড়ি ছিঁড়িয়া মাঠে যাইয়া ফসল খাইয়া ফিরে; যে গরু এ আস্বাদ একবার পাইয়াছে।—সে আর ভুলিতে পারে না। শিকল দিয়া বাঁধিলেও সে খুটা উপড়াইয়া রাত্রে মাঠে যায়। ছিরুপাল নাকি সাধু হইয়াছে। তাই সে হাসিল। কিন্তু নূতন নারীটি কে? একজন কেহ আছেই। সে কে? দুর্গা কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিল না। শ্রীহরির বাড়ীর গোপনতম পথের সন্ধান তাহার সুবিদিত, কত রাত্রে সে আসিয়াছে। চুরিগুলি হাতের উপরে তুলিয়া নিঃশব্দে, আসিয়া শ্রীহরির ঘরের পিছনে দাঁড়াইল!)

জমাদার বলিতেছিল—নির্ঘাৎ দুবছর ঠুকে দোব।

শ্রীহরি বলিল—চলুন তা' হলে—জোর কমিটি বসেছে। জগন ডাক্তার, শালা হরেন ঘোষাল, গিরূশে ছুতোর—অনে কামার তো আছেই। দেবুকে, নজরবন্দীকে সব ঘিরে বসেছে। উঠুন তা' হলে।

জমাদার বলিল—চা টা নিয়ে এস জল্‌দি! চা খাওয়া হয়নি আমার।

শ্রীহরিই খবর পাঠাইয়াছিল। নজরবন্দীর বাড়ীতে প্রজা-সমিতির কমিটি বসিয়াছে। জমাদার সাহেবের কাছে সেলাম পাঠানো হইয়াছিল, সেলামির ইঙ্গিতও ছিল। জমাদারের নিজেরও একটা প্রত্যাশা আছে।

ডেটিনিউটিকে হাতে নাতে ধরিয়া ষড়যন্ত্র বা আইনভঙ্গ—যে-কোন মামলায় ফেলিতে পারিলে চাকরিতে পদোন্নতি বা পুরস্কার—নিদেনপক্ষে বিভাগীয় একটা সদয় মন্তব্যলাভ অনিবার্য্য। সেলামিটা ফাউ। সেলামিটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

দুর্গা শিহরিয়া উঠিল। নিঃশব্দে দ্রুতপদে সে পথের উপরে আসিয়াই কয়েক মুহূর্ত্ত ভাবিয়া লইয়াই বেশ করিয়া চুড়ি বাজাইয়া ঝঙ্কার তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। ঠিক পরমুহূর্ত্তে প্রশ্ন ভাসিয়া আসিল—কে? কে যায়?

—আমি।

—কে আমি?

—আমি বায়েনদের দুর্গা দাসী।

—দুর্গা! আরে—আরে—শোন্—শোন্!

—না।

ভূপাল আসিয়া এবার বলিল—জমাদারবাবু ডাকছে।

এক মুখ হাসি লইয়া দুর্গা ভিতরে আসিয়া বলিল—আ মরণ আমার! তাই বলি চেনা গলা মনে হ'চ্ছে—তবু চিনতে লারছি? জমাদারবাবু! কি ভাগ্যি আমার! কার মুখ দেখে উঠেছিলাম আমি।

জমাদার হাসিয়া বলিল—ব্যাপার কি বল্ দেখি? আজকাল নাকি পিরীতে পড়েছিস? প্রথম শুনলাম অনে কামার, তারপর শুনছি নজরবন্দীবাবু!

দুর্গা হাসিয়া বলিল—ব'লেছে তো আপনার মিতে—পাল!... পরক্ষণেই সে বলিল—আজকাল আবার গোমস্তা মশাই বল্‌তে হবে বুঝি? ও গোমস্তা মশাই মিছে কথা ব'লেছে; মনের রাগে ব'লেছে।

বাধা দিয়া জমাদার বলিল—মনের রাগে? তা রাগ তো হতেই পারে। পুরানো বন্ধুলোককে ছাড়লি কেন তুই?

দুর্গা বলিল—মুচি-পাড়াকে পাড়া আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলে আপনার মিতে। ঘরে টিন দেবার জন্য টাকা চাইলাম! তা' আমাকে বুড়ো আঙল দেখিয়ে দিলে আপনার বন্ধুনোক। সত্যি মিথ্যে শুধোন আপনি।

শ্রীহরির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। জমাদার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দুর্গা কি ব'লছে, পাল মশাই।....জমাদারের কণ্ঠস্বর মুহূর্ত্তে পাল্টাইয়া গেল।

দুর্গা লক্ষ্য করিয়া বুঝিল—একটা বুঝা-পড়ার সময় আসিয়াছে।....সে বলিল—ঘাটে থেকে আসি জমাদারবাবু।

জমাদার দুর্গার কথার কোন জবাব দিল না। সে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল শ্রীহরির দিকে। সে দৃষ্টির অর্থ দুর্গা খুব ভাল করিয়া জানে। জরিমানা আদায়ের পূর্ব্ব রাগ। এ পর্ব্বটা শেষ হইতে কিছুক্ষণ লাগিবে! ঘাটে যাইবার জন্য বাহির হইয়া, তখনি ফিরিয়া দুর্গা লীলায়িত ভঙ্গিতে দেহে হিল্লোল তুলিয়া বলিল—আজ কিন্তু মাল খাওয়াতে হবে দারোগাবাবু। পাকি মাল!....বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল ঘাটের দিকে।

শ্রীহরির খিড়কীর পুকুরের পাড় ঘন-জঙ্গলে ভরা। বাঁশের ঝাড়, তেঁতুল, শিরীষ প্রভৃতি গাছ এমন ভাবে জন্মিয়াছে যে, দিনেও কখন রৌদ্র প্রবেশ করে না। নীচেটায় জন্মিয়াছে ঘন কাঁটা বন। চারিদিকে উই-ঢিবি। ওই উইঢিবিগুলির ভিতর নাকি বড় বড় সাপ বাসা বাঁধিয়াছে। শ্রীহরির খিড়কীর পুকুর সাপের জন্য বিখ্যাত। বিশেষ চন্দ্রবোড়া সাপের জন্য। সন্ধ্যার পর হইতেই চন্দ্রবোড়ার শিষ শোনা যায়। পুকুর-ঘাটে আসিয়া দুর্গা জলে নামিল না, সে প্রবেশ করিল ওই জঙ্গলে! নিশাচরীর মত নিঃশব্দে নির্ভয় পদক্ষেপে দ্রুতগতিতে সে জঙ্গলটা অতিক্রম করিয়া আসিয়া নামিল এ-পাশের

পথে। এখান হইতে অনিরুদ্ধের বাড়ী কাছেই। ওই মজলিসের আলো দেখা যাইতেছে। ছুটিয়া আসিয়া দুর্গা চকিতে ছায়াছবির মত অনিরুদ্ধের খিড়কীর দরজায় প্রবেশ করিল।

প্রজা-সমিতির সভাপতি পরিবর্ত্তনের কাজ তখন শেষ হইয়াছে। অনিরুদ্ধ চা পরিবেশন করিতেছিল! জগন ডাক্তার ভাবিতেছিল—বিদায়ী সভাপতি হিসাবে সে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিবে। দেবু ভাবিতেছিল—নূতন কর্ম্মভারের কথা। সহসা একটা মূর্ত্তি অন্ধকারের মধ্যে চকিতে অনিরুদ্ধের খিড়কীর দরজার দিকে চলিয়া যাইতে সকলে চমকিয়া উঠিল। আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা, দ্রুত লঘু পদধ্বনির সঙ্গে আভরণের ঠুন্‌ঠান্‌ শব্দ!—কে? কে?—কে গেল?

অনিরুদ্ধ দ্রুত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। পদ্ম? এমন করিয়া সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল? কোথায় গিয়াছিল সে?

—কম্মকার!

দুর্গা! দুর্গার কণ্ঠস্বর! ক্রোধে বিরক্তিতে অধীর হইয়াই অনিরুদ্ধ দুর্গার সম্মুখীন হইল।

(দুর্গা সংক্ষেপে সংবাদটা দিয়াই যেমন আসিয়াছিল তেমনি দ্রুতপদে আভরণের মৃদু-সাড়া তুলিয়া বিলীয়মান রহস্যের মত চকিতে মিলাইয়া গেল। ছুটিয়া সে-আবার সেই পুকুর পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল।)

ঘাটে হাত-পা ধুইয়া যখন শ্রীহরির ঘরে সে প্রবেশ করিল—তখন বোধ হয় ঘরে-আগুন-দেওয়ার মামলা মিটিয়া গিয়াছে। জমাদারের চোখে প্রসন্ন দৃষ্টি। জমাদার দুর্গার দিকে চাহিয়া বলিল—হাঁপাচ্ছিস কেন?

আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করিয়া দুর্গা বলিল—সাপ!

—সাপ ! কোথায় ?

—খিড়কীর ঘাটে। এই প্রকাণ্ড বড়। চন্দ্রবোড়া। এই দেখুন জমাদারবাবু। বলিয়া সে ডান পা খানি আলোর সম্মুখে ধরিল। একটা ক্ষত স্থান হইতে কাঁচা রক্তের ধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল।

জমাদার এবং শ্রীহরি উভয়েই আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ ! জমাদার বলিল—বাঁধ—বাঁধ ! দড়ি, দড়ি ! পাল, দড়ি নিয়ে এস।

শ্রীহরি দড়ির জন্য ভিতরে যাইতে যাইতে বিরক্তিভরে বলিল—কি বিপদ ! কোথা থেকে বাধা এসে জুটল দেখ দেখি ! দড়ি আনিয়া ভূপালের হাতে দিয়া শ্রীহরি বলিল—বাঁধ। (জমাদারবাবু, আসুন চট্ ক'রে ওদিকের কাজটা সেরে আসি।

(দুর্গা বিবর্ণমুখে করুণদৃষ্টিতে জমাদারের দিকে চাহিয়া বলিল—কি হবে জমাদারবাবু ?···চোখ তাহার জলে ছল ছল করিয়া উঠিল।)

জমাদার আশ্বাস দিয়া বলিল—কোন ভয় নাই !—ভূপালের হাত হইতে দড়ি লইয়া সে নিজেই বাঁধিতে বসিল। ভূপালকে বলিল—এক দৌড়ে থানায় গিয়ে লেক্সিন নিয়ে আয়। আর ওঝা কে আছে ডাক্ এক্ষুনি।

দুর্গা বলিল—আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, জমাদারবাবু। ওগো আমি মায়ের কোলে ম'রবো গো !

শ্রীহরি বলিল—সেই ভাল। ভূপাল ওকে বাড়ীতে দিয়ে আসুক। দীনু ওঝা, আর মিতে গড়াঞীকে ডাক। ছুটে যাবি আর আসবি। চলুন জমাদারবাবু।

যতীন জমাদারকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—ছোট দারোগাবাবু? এত রাত্রে ?

জমাদার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—গিয়েছিলাম অন্য গ্রামে। পথে ভাবলাম আপনার মজলিসটা দেখে যাই। কিন্তু কেউ কোথাও নেই যে!

যতীন হাসিয়া বলিল—আপনি এসেছেন,—ঘোষ মশায় এসেছেন, আবার বসুক মজলিস। ওরে উচ্চিংড়ে, চায়ের জল চড়িয়ে দে তো!

ভূপাল দুর্গাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া ঔষধ ও ওঝার জন্য চলিয়া গেল। দুর্গার মা হাউচাউ আরম্ভ করিয়া দিল। তাহার চীৎকারে পাড়ার লোক আসিয়া জুটিয়া গেল। পাতুর বৌ সকরুণ মমতায় বার বার প্রশ্ন করিল—কি সাপ ঠাকুরঝি? সাপ দেখেছ?

দুর্গা অত্যন্ত কাতর-স্বরে বলিল—ওগো তোমরা ভীড় ছাড় গো!.... সে ছট্‌ফট্ করিতে আরম্ভ করিল। এ-পাড়ার মাতব্বর সতীশ, সে সত্যই মাতব্বর লোক। সে অনেক ঔষধপাতির খবর রাখে। সাপের ঔষধও সে দুই-চারিটা জানে। সতীশ একরূপ ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল—ঔষধের সন্ধানে। কিছুকাল পর ফিরিয়া আসিয়া একটা শিকড় দিয়া বলিল—চিবিয়ে দেখ দেখি—তেতো লাগছে না মিষ্টি লাগছে?

দুর্গা সেটাকে মুখে দিয়া পরক্ষণেই ফেলিয়া দিল—থু-থু-থু!

[সতীশ আশ্বস্ত হইয়া বলিল—তেতো লেগেছে যখন তখন ভয় নাই।]

দুর্গা ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া বলিল—মিষ্টিতে গা বমি-বমি ক'রছে গো। বাবাগো—ওই কে আসছে—ওঝা নাকি দেখ গো!

ওঝা নয়। জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল, অনিরুদ্ধ এবং আরও কয়েকজন।

হরেন ঘোষাল চীৎকার করিয়া উঠিল—হঠ্‌ যাও, হঠ্‌ যাও! সব হঠ্‌ যাও।

জগন তাড়াতাড়ি বসিয়া দুর্গার পা-খানা টানিয়া লইল।—হু, স্পষ্ট দাঁতের দাগ।

পাতুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল; সে বলিল—কি হবে, ডাক্তার বাবু?

পকেট হইতে ছুরি বাহির করিয়া ডাক্তার বলিল—ওষুধ দিচ্ছি, দাঁড়া। অনিরুদ্ধ, এই পারামাঙ্গানেটের দানাগুলো ধর দেখি। আমি চিরে দি—তুমি দিয়ে দাও।

দুর্গা পা-খানা টানিয়া লইল—না, না গো।

—না—কি?

—না-না-না! মরার উপর আর খাঁড়ার ঘা দিয়ো না, বাপু।

—ঘোষাল! ধরতো পা-খানা।

....ঘোষাল চমকিয়া উঠিল। সে এই অবসরে পাতুর বউয়ের সঙ্গে কটাক্ষ বিনিময় করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

দুর্গা আবার দৃঢ়স্বরে বলিল—না-না-না!

জগন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল—তবে মর্!

(দুর্গা উল্টাইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া বোধ করি নীরবে কান্নায় সারা হইয়া গেল। সমস্ত দেহটাই কান্নার আবেগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।)

অনিরুদ্ধের চোখেও জল আসিতেছিল—কোনমতে আত্মসংবরণ করিয়া সে বলিল—দুগ্‌গা! দুগ্‌গা! ডাক্তার যা ব'লছে শোন।

দুর্গার কম্পমান দেহখানা অস্বীকারের ভঙ্গিতে নড়িয়া উঠিল।

জগন এবার রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অনিরুদ্ধ চলিয়া গেল ওঝার সন্ধানে। কুসুমপুরে একজন ভাল মুসলমান ওঝা আছে! হরেন একটা বিড়ি ধরাইল।

অনতিদূরে একটা আলো আসিয়া দাঁড়াইল। আলোর পিছনে জমাদার ও শ্রীহরি। ঘোষালও এইবার সরিয়া পড়িল।

দারোগা সতীশকে প্রশ্ন করিল—কেমন আছে?

—আজ্ঞে ভালো নয়। একবারে ছট্‌ফট্ ক'রছে।

—গড়াঞী আসে নাই?

—আজ্ঞে না।

—ঘোষ, আপনি আর একটা লোক পাঠিয়ে দিন। আমি থানা থেকে লেক্সিন পাঠিয়ে দিচ্ছি। আসুন।...দারোগা ও শ্রীহরি চলিয়া গেল।

দুর্গা আরও কিছুক্ষণ ছট্‌ফট করিরা খানিকটা সুস্থ হইল: বলিল—সতীশ দাদা, তোমার ওষুধ ভাল। ভাল লাগছে আমার।—আরও কিছুক্ষণ পর সে উঠিয়া বসিল।

সতীশ বলিল—ওষুদ আমার অব্যর্থ।

দুর্গা বলিল—আমাকে নিয়ে ওপরে চল, বউ!

(উপরে বিছানায় বসিয়া দুর্গা মাথার খোঁপার একটা বেলকুঁড়ির কাঁটা খুলিয়া আলোর সম্মুখে তাহার অগ্রভাগটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল।)

পাতুর বউ বলিল—সাপ তুমি দেখেছ, ঠাকুরঝি? কি সাপ?

দুর্গা বলিল—কাল সাপ।...অতি প্রচ্ছন্ন একটি হাসির রেখা তাহার ঠোঁটের কোণে খেলিয়া গেল। সাপে তাহাকে কামড়ায় নাই। কর্ম্মকারের বাড়ী হইতে ফিরিবার পথেই সে মনে মনে স্থির করিয়া ঘাটে আসিয়া বেলকুঁড়ির কাঁটাটা পায়ে ফুটাইয়া রক্তমুখী দংশন-চিহ্নের সৃষ্টি করিয়াছিল। নহিলে কি সকলে পালাইবার অবকাশ পাইত, না,—জমাদার তাহাকে নিস্কৃতি দিত? মদ খাইয়া জমাদারের যে মূর্ত্তি হয়—মনে করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

(কিন্তু নজরবন্দী, জামাই-পণ্ডিত তাহার এই অবস্থার কথা শুনিয়া একবার তাহাকে দেখিতে আসিল না?)

(কেহই তো সত্য কথা জানে না, তবু আসিল না? নজরবন্দীর না-হয়—রাত্রে বাহির হইবার হুকুম নাই। জমাদার হাজির ছিল গ্রামে, ছিরুপাল রহিয়াছে, তাই না নজরবন্দীর আসার কারণ আছে। কিন্তু জামাই-পণ্ডিত? জামাই-পণ্ডিত একবার আসিল না কেন?)

অভিমানে তাহার চোখে জল আসিল। জগন ডাক্তার আসিয়াছিল, অনিরুদ্ধ আসিয়াছিল, হরেন ঘোষাল আসিয়াছিল; জামাই-পণ্ডিত একবার আসিল না!

পাতুর বউ প্রশ্ন করিল—ঠাকুরঝি, আবার জ্বলছে?

—যা বউ, যা তুই। আমি একটুকুন শুই।

—না। ঘুমুতে তুমি পাবেনা আজ।

(দুর্গা এবার রাগে অধীর হইয়া বলিল—ঘুমোবো না, ঘুমোবো না। আমার মরণ হবে না, আমি ম'রব না। তুই যা, তুই যা এখান থেকে।)

পাতুর বউ এবার রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। দুর্গা বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

—কে? নীচে কে ডাকিতেছে?—পাতু, দুর্গা কেমন আছে রে? হ্যাঁ, জামাই-পণ্ডিতেরই গলা। ওই যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।

—কেমন আছিস দুর্গা?....পাতুর সঙ্গে দেবু ঘরে ঢুকিল।

দুর্গা উত্তর দিল না।

—দুর্গা!

(দুর্গা এবার মুখ তুলিল, বলিল—যদি এতক্ষণ মরে যেতাম জামাই-পণ্ডিত!)

দেবু বলিল—আমি খবর নিয়েছি, তুই ভাল আছিস। রাখাল ছোঁড়া দেখে গিয়ে আমাকে ব'লেছে।

দুর্গা আবার বালিশে মুখ লুকাইল; রাখাল ছোঁড়া খবর করিয়া গিয়াছে? মরণ তাহার!

দেবু বলিল—বাড়ী গিয়ে বসেছি আর মহাগ্রামের ঠাকুর মশায় হঠাৎ এলেন। কি করি? এই তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আসছি।

—মউগাঁয়ের ঠাকুরমশায়?... দুর্গার বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না।

(মহাগ্রামের ঠাকুরমশায়? মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন? সাক্ষাৎ দেবতার মত মানুষ! রাজার বাড়ীতেও যিনি পদার্পণ করেন না, তিনি?)

দেবুর নিজেরও বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

(যতীনের ওখান হইতে আসিয়া সে ঘরে বসিয়া দুর্গার কথাই ভাবিতেছিল। দুর্গা বিচিত্র, দুর্গা অদ্ভুত, দুর্গা অতুলনীয়া। বিলু সমস্ত শুনিয়া দুর্গার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া দুর্গার কথাই বলিয়া যাইতেছিল।—গল্পের সেই লক্ষহীরে বেশ্যার মত—দেখো তুমি—আসছে জন্মে ওর ভাল ঘরে জন্ম হবে, যাকে কামনা ক'রে ম'রবে সে-ই ওর স্বামী হবে।)

ঠিক এই সময়েই বাহির দরজায় কে ডাকিল—মণ্ডলমশায় বাড়ী আছেন?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া দেবু ঠাহর করিতে পারিল না—কে। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনিয়া সম্ভ্রম হয়। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কে? বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বাহির হইয়া আসিল।

—আমি। আলো হাতে একটি লোকের পিছন হইতে বক্তা উত্তর দিল—আমি বিশ্বনাথের পিতামহ।

দেবু সবিস্ময়ে সম্ভ্রমে হতবাক্ হইয়া গেল। বিশ্বনাথের পিতামহ—পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্ন! তাহার শরীর থর

থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া সেই পথের ধূলার উপরই সে ন্যায়রত্নের পায়ে প্রণত হইল।

—তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রতেই এসেছি। কল্যাণ হোক, ধর্ম্ম যেন তোমাকে কোনকালে পরিত্যাগ না করেন। জয়স্তু! তোমার জয় হোক। ঘরটা খোল তোমার, একটু ব'সব।

দেবুর এতক্ষণে খেয়াল হইল। সে তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া দিল; দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বিলু সব দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল। সে পাতিয়া দিল তাহার ঘরের সর্ব্বোত্তম আসনখানি, তারপর একটি ঘটি হাতে আসিয়া দাঁড়াইল।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—পা ধুইয়ে দেবে মা? প্রয়োজন ছিল না।

বিলু দাঁড়াইয়া রহিল! ন্যায়তীর্থ এবার দাওয়ায় বসিয়া পা বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন—দাও।

বিলু পা ধুইয়া দিয়া সযত্নে একখানি পুরাতন রেশমী কাপড় দিয়া পা মুছিয়া দিল।

আসন গ্রহণ করিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—তোমার ছেলেকে আন, মণ্ডল। তাকে আমি আশীর্ব্বাদ ক'রব।

বিস্ময় যেন দেবুর চারিপাশে এক মোহজাল বিস্তার করিয়াছিল; কোন্ অজ্ঞাত পরমভাগ্যে তাহার কুটিরে এই রাত্রির অন্ধকারে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়াছেন স্বর্গের দেবতা; পরম কল্যাণের আশীর্ব্বাদ-সম্ভার লইয়া আসিয়াছেন তাহার ঘর ভরিয়া দিতে।

বিলু ঘুমন্ত শিশুকে আনিয়া ন্যায়রত্নের পায়ের তলায় নামাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন শিশুটির দিকে চাহিয়া দেখিয়া সস্নেহে বলিলেন—বিশ্বনাথের খোকা এর চেয়ে ছোট। এই ত সবে অন্নপ্রাশন হ'ল, তার বয়স আট মাস।....তারপর ঘুমন্ত শিশুর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—দীর্ঘায়ু হোক, ভাগ্য প্রসন্ন হোক।....কথা শেষ করিয়া গায়ের চাদরের

ভিতর হইতে বাহির করিলেন—দুইগাছি বালা। হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন—ধর।

দেবু ও বিলু অবাক হইয়া গেল—এ বালা যে খোকারই বালা। আজই বন্ধক দেওয়া হইয়াছে।

—ধর। আমার কথা অমান্য ক'রতে নেই! ধর মা, তুমি ধর।

বিলু হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল—হাত তার কাঁপিতেছিল।

—ছেলেকে পরিয়ে দাও মা। আজ অশোক ষষ্ঠীর দিন, অশোক আনন্দে সংসার তোমাদের পরিপূর্ণ হোক।...তারপর হাসিয়া বলিলেন —আমার রাজ্ঞী শকুন্তলা। তিনি এসে আমায় সংবাদটা দিলেন। বাউড়ি-বায়েনদের গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার সংবাদ আমি পেয়েছিলাম। ভাবছিলাম—কাউকে পাঠিয়ে দি—গরুগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে আসুক। গো-মাতা ভগবতী অনাহারে থাকবেন! আর ওই গরীবদের হয়তো যথাসর্ব্বস্ব যাবে—গরুর মাশুল দিতে। এমন সময় সংবাদ পেলাম— তুমি গরুগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছ। আশ্বস্ত হ'লাম। মনে মনে তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রলাম। মনে হ'ল—বাঁচব, আমরা বাঁচব। মনে হ'ল সেই গল্পের কথা। সঙ্কল্প করলাম—একদিন তোমাকে ডাকব, আশীর্ব্বাদ ক'রব। সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথের স্ত্রী এসে ব'ললে—দাদু, শিবকালীপুরের পণ্ডিতের কাজ দেখুন তো! ষষ্ঠীর দিন—আজ সে ছেলের হাতের বালা বন্ধক দিয়েছে আমাদের চাটুজ্জেদের গিন্নীর কাছে। গিন্নী আমায় দেখিয়ে ব'ললে—পনের টাকায় ভাল হয় নাই? আমার মনটা আবার ভ'রে উঠল, মণ্ডল মশায়, অপার আনন্দে। তোমায় বারবার আশীর্ব্বাদ ক'রলাম। তবু মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগল। ষষ্ঠীর দিন—শিশুর অলঙ্কার, অলঙ্কারের জন্য শিশু হয়তো কেঁদেছে; আমি তৎক্ষণাৎ নিয়ে এলাম ছাড়িয়ে। কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে প্রবৃত্তি হ'ল না। নিজেই এলাম। তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'রতে এলাম।

তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার কল্যাণ হোক। ধর্ম্মকে তুমি বন্দী ক'রে রাখ কর্ম্মের বন্ধনে। তোমার জয় হোক। দাও মা, বালা পরিয়ে দাও ছেলেকে। মণ্ডল, টাকা যখন তোমার হবে, আমায় দিয়ে এস। তোমার পুণ্য, তোমার ধর্ম্মকে আমি ক্ষুণ্ণ ক'রতে চাই না।

দর্ দর্ করিয়া দেবুর চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

বিলুর চোখ দিয়াও জল ঝরিতেছিল, সে বালা দুইগাছি ছেলেকে পরাইয়া দিল।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—একটা গল্প বলি, শোন পণ্ডিত।

এমন সময় যতীন আসিয়া ডাকিল—দেবুবাবু।

—যতীন বাবু আসুন—আসুন।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—ইনি?

দেবু যতীনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। যতীন কয়েক মুহূর্ত্ত ন্যায়রত্নকে দেখিল; তারপর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—আপনার পৌত্র বিশ্বনাথ বাবুকে আমি চিনি।

ন্যায়রত্ন প্রথমে নমস্কার করিয়া পরে যতীনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তারপর প্রশ্ন করিলেন—চেনেন তাকে? আপনাদের সঙ্গে সে বুঝি সমগোত্রীয়?

এ প্রশ্নে যতীন প্রথমটা একটু বিস্মিত হইল; তারপর হাসিয়া বলিল—গোত্র এক, গোষ্ঠি বিভিন্ন।

ন্যায়রত্ন চুপ করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

যতীন বলিল—তারা নাপিত আমায় সংবাদ দিলে, আমি ছুটে এলাম। আপনাকে দেখতে এলাম।

—দেখবার বস্তু আর কিছু নাই—দেশেও নাই—মানুষেও নাই। প্রকাণ্ড সৌধ, বটবৃক্ষ জন্মে ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে। চোখেই তো

দেখছেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন—তাই মধ্যে মধ্যে যখন দুর্যোগে বজ্রাঘাতের আঘাতকে প্রতিহত ক'রতে দেখি সেই সৌধের কোন অংশকে, তখন আনন্দ হয়। আজ মণ্ডল আমাকে সেই আনন্দ দিয়েছে।

দেবু কথাটা পরিবর্ত্তন করিবার জন্যই বলিল—আপনি একটা গল্প বলবেন ব'লছিলেন।

—গল্প? হ্যাঁ বলি শোন। "এক ব্রাহ্মণ ছিলেন মহাকর্ম্মী, মহাভাগ্যবান। জ্যোতির্ম্ময় ললাট, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী স্বয়ং ললাট-মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিটি কর্ম্ম ছিল মহৎ এবং প্রতি কর্ম্মই ছিল সাফল্য; কারণ, যশোলক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর কর্ম্মশক্তিতে। তাঁর কুল ছিল অকলঙ্ক, পত্নী-পুত্র-কন্যা-বধূর গৌরবে অকলঙ্ক কুল উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠছিল—কারণ, কুললক্ষ্মী তাঁর কুলকে আশ্রয় ক'রেছিলেন। পাপ অহোরহ ঈর্ষ্যাতুর অন্তরে ব্রাহ্মণের বাসভূমির চারিদিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সহ্য হয় না। বহু চিন্তা ক'রে সে একদিন সঙ্গে ক'রে আনলে অলক্ষ্মীকে। বাড়ীর বাইরে থেকে ব্রাহ্মণকে ডাকলে। ব্রাহ্মণ ব'ললে—কি চাও বল?

পাপ বললে—আমি বড় দুর্ভাগ্য। দুঃখ কষ্টের সীমা নাই। আমার সঙ্গিনীটিকে আপনি আশ্রয় দিন—এই আমার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ ব'ললেন—আমি গৃহস্থ; আশ্রয়প্রার্থী দুঃস্থকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধর্ম্ম। বেশ থাকুন উনি। বধূ-কন্যার মতই যত্ন ক'রব। ইচ্ছা হ'লে যতদিন দুর্ভাগ্যের শেষ না হয়, ততদিন তুমিও থাকতে পার। এস, তুমিও এস।

আহ্বান সত্ত্বেও পাপ কিন্তু পুরপ্রবেশ ক'রতে সাহস করল না। কারণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় ক'রে র'য়েছেন ধর্ম্ম।

যাক্ অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বিপর্য্যয় ঘটল। ফলবান

বৃক্ষগুলির ফল যেন নীরস হ'য়ে গেল, ফুল ম্লান হ'ল। রাত্রে ব্রাহ্মণ জপ ক'রছেন—এমন সময় শুনতে পেলেন কার করুণ-কান্না। বিস্মিত হ'য়ে জপ শেষ ক'রে উঠতেই তিনি দেখলেন—তাঁরই ললাট থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতি, সেই জ্যোতি ক্রমে এক অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি ধারণ ক'রলে। তিনিই এতক্ষণ কাঁদছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন ক'রলেন—কে মা তুমি?

—তোমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী। এতদিন তোমার ললাট আশ্রয় ক'রেছিলাম, আজ আমায় ছেড়ে যেতে হ'চ্ছে, তাই কাঁদছি।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ব'ললেন—একটা প্রশ্ন ক'রব, মা। আমার অপরাধ কি হ'ল?

—তুমি আজ অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ। ওই মেয়েটি অলক্ষ্মী। অলক্ষ্মী এবং আমি তো একসঙ্গে বাস ক'রতে পারি না।

ব্রাহ্মণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। লক্ষ্মীকে প্রণাম ক'রলেন, কিন্তু কোন কথা ব'ললেন না।

সকালে দেখলেন বৃক্ষের ফল খসে গেছে, ফুল শুকিয়ে গেছে। সরোবর হ'য়েছে ছিদ্রময়ী, জল সেই ছিদ্রপথে অদৃশ্য হয়েছে। ভূমি শস্যহীনা, গাভী দুগ্ধহীনা। গৃহ হয়েছে শ্রীহীন।

রাত্রে আবার সেই রকম কান্না। আবার দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন—এক দিব্যাঙ্গনা। তিনি ব'ললেন—আমি তোমার যশোলক্ষ্মী। ভাগ্যলক্ষ্মী তোমাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন, অলক্ষ্মীকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, সুতরাং আমিও তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে যাচ্ছি।

ব্রাহ্মণ নীরবে তাঁকে প্রণাম ক'রলেন; তিনিও চ'লে গেলেন।

পরদিন তিনি শুনলেন—লোকে ব'লছে—ব্রাহ্মণ লম্পট, ওই যে

মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে—তার দিকে তার কু-দৃষ্টি পড়েছে। তিনি প্রতিবাদ ক'রলেন না।

সেদিন রাত্রে আর এক নারীমূর্ত্তি তাঁর দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁর কুললক্ষ্মী। ব'ললেন—অলক্ষ্মী এসেছে, ভাগ্যলক্ষ্মী চ'লে গেছেন, যশোলক্ষ্মী চ'লে গেছেন, লোকে তোমার কলঙ্ক রটনা ক'রছে; আমি কুললক্ষ্মী, আর কেমন ক'রে থাকি তোমাকে আশ্রয় ক'রে?... তিনিও চলে গেলেন।

পরদিন ব্রাহ্মণের দেহ থেকে বেরিয়ে এলেন আর এক মূর্ত্তি। নারী নয়—পুরুষ মূর্ত্তি। দিব্য ভীমকান্তি, জ্যোতির্ম্ময়; ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনি কে?

দিব্যকান্তি পুরুষ ব'ললেন—আমি ধর্ম্ম।

—ধর্ম্ম? আপনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রছেন কোন্ অপরাধে?

—অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছ তুমি।

—সে কি আমি অধর্ম্ম করেছি?

ধর্ম্ম চিন্তা ক'রে বললেন—না।

—তবে?

—ভাগ্যলক্ষ্মী তোমায় ত্যাগ ক'রেছেন।

—আশ্রয়প্রার্থী বিপদগ্রস্তকে আশ্রয় দেওয়া যখন অধর্ম্ম নয়, তখন আমার অধর্ম্মের জন্য তিনি আমায় পরিত্যাগ করেন নি। পরিত্যাগ ক'রেছেন অলক্ষ্মীর সংস্পর্শ সইতে না পেরে।

—হ্যাঁ।

—ভাগ্যলক্ষ্মীকে অনুসরণ করেছেন যশোলক্ষ্মী, তাঁর পেছনে গেছেন কুললক্ষ্মী, আমি প্রতিবাদ করিনি! ওই তাঁদের পন্থা। কিন্তু আপনি আমাকে পরিত্যাগ ক'রবেন কোন্ অপরাধে?

ধর্ম্ম স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ব্রাহ্মণ ব'ললেন—আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না; কারণ আপনাকে অবলম্বন ক'রে আমি বেঁচে রয়েছি। আপনাকে আমি যেতে না ব'ললে—আপনার যাবার অধিকার নাই। আমিই আপনার অস্তিত্ব।

ধর্ম্ম স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন. নিজের ভ্রম বুঝলেন; তারপর ব্রাহ্মণকে ব'ললেন—"তথাস্তু। তোমার জয় হোক।···ব'লে তিনি আবার ব্রাহ্মণের দেহে প্রবিষ্ট হ'লেন।"

ন্যায়রত্নের গল্প বলার ভঙ্গি অত চমৎকার! প্রথম-জীবনে তিনি গ্রামে নিয়মিত ভাগবত কথকতা করিতেন। তাঁহার বর্ণনায়, স্বর-মাধুর্য্যে, ভঙ্গিতে একটি মোহজালের সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি স্তব্ধ হইলেন।

কিছুক্ষণ পর যতীন বলিল—তারপর?

—তারপর?···ন্যায়রত্ন হাসিলেন, বলিলেন—

"—তারপর সংক্ষিপ্ত কথা। ধর্ম্মের প্রভাবে সেইদিন রাত্রে উঠল আবার এক ক্রন্দনধ্বনি; ব্রাহ্মণ দেখলেন সেই অলক্ষ্মী মেয়েটি এসে ব'লছে—আমি যাচ্ছি। আমি চ'ললাম।

ব্রাহ্মণ ব'ললেন—তুমি স্বেচ্ছায় বিদায় চাও?

—স্বেচ্ছা! স্বেচ্ছায় যাচ্ছি। সে মিলিয়ে গেল।

সেইদিন রাত্রেই ফিরলেন—ভাগ্যলক্ষ্মী। তারপর এলেন যশোলক্ষ্মী, তারপর কুললক্ষ্মী।"

যতীন বলিল—চমৎকার কথা। লক্ষ্মীই দেয় যশ—সেই পবিত্র করে কুল। তাই তাকে নিয়ে এত কাড়াকাড়ি। লক্ষ্মীই সব।

—না, ন্যায়রত্ন বলিলেন—না ধর্ম্ম। মণ্ডল, সেই ধর্ম্মকে তুমি অবলম্বন ক'রেছ বলেই আজ আশা হ'চ্ছে সেই আনন্দেই আমি ছুটে এসেছি। আচ্ছা, আমি চলি আজ, মণ্ডল!

ঠিক এই সময়ে সংবাদ আসিল—দুর্গাকে সাপে কামড়াইয়াছে। রাখাল ছোঁড়াটা বলিল—ভাল আছে। উঠে বসেছে।

দেবু ন্যায়রত্নকে আগাইয়া দিতে বাহির হইল। পথে যতীন বিদায় লইয়া আপন দাওয়ায় উঠিয়া তক্তাপোষের উপর স্তব্ধ হইয়া বসিল।

ছাব্বিশ

যতীনের মনের অবস্থা বিচিত্র। পল্লীগ্রামের কোন নিভৃত কোণে বাস করে ওই বৃদ্ধ—চারিপাশে এই ধ্বংসোন্মুখ পারিপার্শ্বিক—অজ্ঞান অশিক্ষা, দারিদ্র্য, হীনতা; নিষ্ঠুর কঠিন জীবন-সংগ্রাম সরীসৃপের সুকঠিন বেষ্টনীর মত শ্বাসরোধ করিয়া ক্রমশঃ চাপিয়া ধরিতেছে; ইহার মধ্যে প্রশান্ত অবিচলিতচিত্ত সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ—স্বচ্ছ ঊর্দ্ধগ দৃষ্টি মেলিয়া পরমানন্দে বসিয়া আছেন। অসীম জ্ঞানভাণ্ডার লইয়া বসিয়া আছেন —সমুদ্রগর্ভের শুক্তির মত।

দণ্ডে দণ্ডে প্রহরের পর প্রহর অতিক্রম করিয়া রাত্রি ঘন গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয় প্রহরের শেয়াল, পেঁচা ডাকিয়া গিয়াছে। কোন একটা গাছে বসিয়া একটা পেঁচা এখনও মধ্যে মধ্যে ডাকিতেছে। এ ডাক অন্য রকমের ডাক—প্রহর-ঘোষণার ডাকের সহিত কোন মিল নাই। প্রহরের ডাকের মধ্যে স্পষ্ট একটি ঘোষণার সুর আছে। গাছের কোটরের মধ্যে থাকিয়া অপরিণত কণ্ঠে চাপা শিসের শব্দের মত করিয়া অবিরাম একঘেয়ে ডাকিয়া চলিয়াছে উহাদের শাবকের দল; বনে-জঙ্গলে, পথে-ঘাটে, ঘরে, চারিদিকে, আশে-পাশে অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে—অসংখ্য কোটী পতঙ্গের সাড়ায়। অন্ধকার শূন্যপথে কালো ডানা সশব্দে আস্ফালন করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে বাদুড়ের দল—একটার পর একটা, তারপর একসঙ্গে তিনটা আবার একটা। সেদিন বৃষ্টির পর আকাশ এখনও উজ্জ্বল নীল; তারাগুলি পূর্ণদৃপ্তিতে দীপ্যমান। চৈত্র

মাসের ঝির ঝিরে বাতাস; বাতাস ভরিয়া ফুলের গন্ধের অদৃশ্য অরূপ সঞ্চার। শেষ প্রহরে বাতাস হিমের আমেজে ক্রমশঃ ঘন হইয়া উঠিতেছে।

বৃদ্ধকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে। গল্পটি তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। ঐ বৃদ্ধ এবং ঐ গল্পের মধ্যে সে আজ পল্লীর জীবন-মন্ত্রের আভাস পাইয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া ওই বৃদ্ধেরাই তাহাদের ঐ গল্প শুনাইয়া আসিতেছে! গল্পটি সত্যই ভাল—শুধু ভাল নয়—সত্য বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছে। শুধু এক জায়গায় খট্‌কা লাগিয়াছে! অলক্ষ্মীর আগমনে সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধান—সত্য কথা। ভাগ্যলক্ষ্মীর অভাবে কর্ম্মশক্তি পঙ্গু হয়, যশোলক্ষ্মী চলিয়া যান; লক্ষ্মীহীন হৃতকর্ম্মশক্তি মানুষের কুলগৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। উচ্চিংড়ের মা চলিয়া গিয়াছে সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পের পিওনের সঙ্গে। কিন্তু ধর্ম্ম বলিতে বৃদ্ধ কি বুঝাইতেছেন, ঐ প্রশ্নটা তাঁহাকে করা হয় নাই! অনেক চিন্তা করিয়াও সে এমন কোন উত্তর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না—যাহার সহিত পৃথিবীর নব-উপলব্ধ সত্যের একটি সমন্বয় হয়। সে ক্লান্ত হইয়া শূন্য-মস্তিষ্কে রাত্রির পল্লীর দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রগাঢ় দুনিরীক্ষ্য অন্ধকারের মধ্যে পল্লীটা যেন হারাইয়া গিয়াছে। অনুমানে নির্দ্দেশ করা যায় সামনেই পথের ওপারে সেই ডোবাটা; সমস্ত রাত্রির মধ্যে সন্ধ্যার সময় ঘাটটিতে একবার কেরোসিনের ডিবি দেখা যায়, দু'টি মেয়ে ডিবি হাতে বাসন ধুইয়া লইয়া যায়। ডিবির আলোয় তাহাদের মুখ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পায় যতীন। ঘাট হইতে উঠিয়াই তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া কপাট দেয়। পল্লীটার অধিকাংশ ঘরেই সেই সন্ধ্যায় কপাটে খিল পড়ে। শ্রীহরি ঘোষ এবং জগন ডাক্তার বা তাহার নিজের এখানে ছোট-খাটো একটি করিয়া দু'টি বিরোধী মজলিস তাহার পরেও জাগিয়া থাকে, কিন্তু সেই-বা কতক্ষণ? দশটা বাজিতে না

বাজিতে পল্লীটা নিস্তব্ধ হইয়া যায়। যতীন একবার ভাল করিয়া গ্রামখানার দিকে চাহিয়া দেখিল। প্রগাঢ় অন্ধকারে সুষুপ্ত নিথর পল্লীটার ভঙ্গির মধ্যে নিতান্ত অসহায় শিশুর আত্মসমর্পণের ভঙ্গি যেন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল—তাহার জন্মস্থান—মহানগরী কলিকাতাকে। কলিকাতাকে সে বড় ভালবাসে। মহানগরী কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নগরী সমূহের অন্যতমা! দিনের আলো, রাত্রির অন্ধকারের প্রভাব সেখানে কতটুকু? দিনে সেখানে আলো জ্বলে। রাত্রে পথের পাশে-পাশে আলো-আলো-আলো। মানুষের তপস্যার দীপ্তচক্ষুর সম্মুখে রাত্রির অন্ধকার, মহানগরীর দ্বারদেশে অবশ-তনুর মত অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মোড়ে মোড়ে বিটের প্রহরী জাগ্রত-চক্ষে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করে—সে জাগিয়া আছে। গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে তাহার গবেষণার বস্তুর দিকে! গতিশীল যন্ত্রের দণ্ড স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে যন্ত্রী; যন্ত্র চলিতেছে—উৎপাদন চলিতেছে অবিরাম! জল আলোড়িত করিয়া জাহাজ চলিয়াছে, পোর্ট-কমিশনারের লাইনের উপর ট্রেন চলিয়াছে; সাইডিংয়ে শাণ্টীং হইতেছে। পথে গর্জ্জন করিয়া মোটর চলিয়াছে, মধ্যে মধ্যে রোমাঞ্চক আবেশ জাগাইয়া ধ্বনিত হইয়া উঠে অশ্বক্ষুরধ্বনি। মহানগরী চলিয়াছেই—চলিয়াছেই—দিনে রাতে গতির তাহার বিরাম নাই। যাওয়া-আসায়, ভাঙা-গড়ায়, হাসি-কান্নায় নিত্য তাহার নব নব রূপের অভিব্যক্তি!

পল্লীর কিন্তু সেই একই রূপ। অদ্ভুত পল্লীগ্রাম। বিশেষ এদেশের পল্লীগ্রাম সমাজ-গঠনের আদিকাল হইতে ঠিক একই স্থানে অনন্ত-পরমায়ু পুরুষের মত বসিয়া আছে। Indian Economics-এর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, Sir Charles Metcalf বলিয়া গিয়াছেন—

"They seem to last where nothing else last"....অদ্ভুত! "Dynasty after dynasy tumbles down; revolution succeeds revolution; Hindu, Pathan, Mogul, Mahratta, Sikh, English are masters in turn, but the village community remains the same."

সে কি কোনদিন নড়িবে না? বিংশ-শতাব্দীতে পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে। সর্ব্বত্র নববিধানের সাড়া উঠিয়াছে। এ দেশের পল্লীতে কি জীর্ণ স্থবির পুরাতনের পরিবর্ত্তন হইবে না?

বিপ্লবী তরুণ, তাহার কল্পনার চোখে অনাগত কালের নূতনত্বের স্বপ্ন। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বৃদ্ধ বলিয়া গেলেন—প্রকাণ্ড সৌধ বটবৃক্ষের শিকড়ের চাড়ে ফাটিয়া গিয়াছে। সে সেই ভাঙনের মুখে আঘাত করিতে বদ্ধপরিকর। সেই ধর্ম্মে সে যেখানে ক্ষুদ্রতম দ্বন্দ্ব দেখে, সেইখানেই সে দ্বন্দ্বকে উৎসাহিত করিয়া তোলে।

বাড়ীর ভিতর হইতে দরজায় আঘাতের শব্দ হইল।

যতীন জিজ্ঞাসা করিল—মা-মণি?

—হ্যাঁ।....পদ্ম তিরস্কার করিয়া বলিল—তুমি কি আজ শোবে না? অসুখ-বিসুখ একটা না ক'রে ছাড়বে না দেখছি!

—যাচ্ছি।...যতীন হাসিল।

—যাচ্ছি নয়, এখুনি শোবে এস। আমি বরং বাতাস ক'রে ঘুম পাড়িয়ে দি। এস! এস ব'লছি!

—তুমি গিয়ে শোও। আমি এক্ষুনি শোব!

—না। তুমি এক্ষুনি এস। এস। মাথা খুঁড়ব ব'লে দিচ্ছি।

যতীন ঘরের ভিতর না গিয়া পারিল না। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই, পদ্ম বলিল—এ দিকের দরজা খুলে দাও। বাতাস করি।

—দরকার নেই।

—না। দরকার আছে।

যতীন দরজা খুলিয়া দিল। পদ্ম যতীনের শিয়রে পাখা লইয়া বসিল। বলিল—সেই একজন বেরিয়েছে দুগ্‌গাকে সাপে কামড়েছে ব'লে—এখনও ফিরল না। তুমি—

—অনিরুদ্ধ বাবু এখনও ফেরেন নাই?

—না। দাঁড়াও; দুগ্‌গা মরুক আগে, তারপর ফিরবে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে। দুনিয়ার এত লোক মরে—ওই হারামজাদী মরে না!

যতীন শিহরিয়া উঠিল। পদ্মের কণ্ঠস্বরে ভাষায় সে কী কঠিন আক্রোশ! দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ বন্ধ করিল। কিছুক্ষণ পরই তাহার কানে একটা দূরাগত বিপুল শব্দ যেন জাগিয়া উঠিল। দ্রুততম গতিতে শব্দটা আগাইয়া আসিতেছে। ঘরে দুয়ারে একটা কম্পন জাগিয়া উঠিতেছে। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল—ভূমিকম্প!

হাসিয়া পদ্ম বলিল—কি ছেলে মা! যেন দেয়ালা ক'রছে। ও ভূমিকম্প নয় পাগলা, ডাকগাড়ী যাচ্ছে। শোও দেখি এখন।

—ডাকগাড়ী? মেল ট্রেন?

—হঁ্যা, ঘুমোও।

সেই মুহূর্ত্তেই তীব্র হুইসিলের শব্দ করিয়া ট্রেন উঠিল ময়ূরাক্ষীর পুলে,—ঝম্‌ঝম্ শব্দে চারিদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ঘর-দুয়ার থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে। জংসন-ষ্টেশনে আলো জ্বলিতেছে। সেখানকার কলে রাত্রেও কাজ চলে। ময়ূরাক্ষীর ওপারেই জংসন। যতীন অকস্মাৎ যেন আশার আলোক দেখিতে পাইল। পল্লী কাঁপিতেছে। জংসন পর্য্যন্ত পৃথিবীর নূতন জীবনের সাড়া আসিয়াছে। একদিন সে ময়ূরাক্ষী পার হইবে। একটা কোম্পানি নাকি ওই ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধের পাশ দিয়া যে কাঁচা সড়কটা চলিয়া গিয়াছে—সেই রাস্তায় বাস সার্ভিস খুলিবার চেষ্টা করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে পাখা রাখিয়া পদ্ম সন্তর্পনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। যাক্, ঘুমাইয়াছে। উপরে মশারীটা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া আসা হয় নাই; উচ্চিংড়েটাকে হয়তো মশায় ছিঁড়িয়া ফেলিল!

যতীনের ঘর হইতে বাহির হইয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উপর হইতে কখন্ নামিয়া আসিয়াছে উচ্চিংড়ে। আপন-মনেই—এই তিন প্রহর রাত্রে—উঠানে বসিয়া একা-একাই কড়ি খেলিতেছে।

শেষরাত্রে ঘুমাইয়া যতীনের ঘুম ভাঙিতে দেরি হইয়াছিল। তাহাকে তুলিল পদ্ম।—ওঠ ছেলে! ওঠ!

উঠিয়া বসিয়া যতীন বলিল—অনেক বেলা হ'য়ে গেছে, না?

—ওদিকে যে সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল!

—সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল?

—ছিরুপাল লেঠেল নিয়ে এসে গাছ কাটছে। সব ছুটে গেল, দাঙ্গা হবে হয়তো।

—কে ছুটে গেল? অনিরুদ্ধ বাবু?

—সব—সব। পণ্ডিত, জগন ডাক্তার, ঘোষাল—বিস্তর লোক।

যতীন খুসী হইয়া উঠিল। বলিল—বেশ কড়া ক'রে চা কর দেখি মা-মণি।

—তুমি কিন্তু নাচতে নাচতে যেয়ো না যেন।

—তবে আমায় ডাকলে কেন?

পদ্ম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—জানি না....সত্যিই সে খুঁজিয়া পাইল না কেন সে যতীনকে ডাকিল।—মুখ হাত ধোও। আমি চা ক'রছি।

—উচ্চিংড়ে কই?

—সে 'বানের আগে কুটো'—সে ছুটে গিয়েছে দেখতে।

গত কল্যকার অপমানের শোধ লইয়াছে শ্রীহরি। বাউরি-বায়েনদের কাছে তাহার মাথা হেঁট হইয়াছে। শুধু অপমান নয়—তাহার মতে, এটা গ্রামের শৃঙ্খলা ভাঙিবার একটা অপচেষ্টা। সে চেষ্টা যাহারা করিতেছে, তাহাদের শাস্তি দিবার ব্যবস্থা সে কাল রাত্রেই করিয়াছে। কালু সেখ মারফৎ লাঠিয়ালের ব্যবস্থা করিয়া আজ সকালে সে জমিদারের গোমস্তা হিসাবে দেবু, জগন, হরেন, অনিরুদ্ধের গাছ কাটিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। গাছগুলি জমিদারের পতিত ভূমির উপর আছে। পূর্ব্বকালে চাষী প্রজারা এমনই ভাবে গাছ লাগাইত, ভোগ-দখল করিত; জমিদার আপত্তি করিত না। প্রয়োজন হইলে, প্রজাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়া জমিদার ফলও পাড়িত, ডালও কাটিত। কিন্তু এমনভাবে সমূলে উচ্ছেদ কখনও করিত না। করিলে—বহু পূর্ব্বকালে—এক শো বছর পূর্ব্বে জমিদার-প্রজায় দাঙ্গা বাধিত। পঞ্চাশ বৎসর পরে সে যুগ পাল্টাইয়াছিল। তখন প্রজা জমিদারের হাতে-পায়ে ধরিত, ঘরে বসিয়া গাছের মমতায় কাঁদিত। অকস্মাৎ আজ দেখা গেল, আবার তাহারা ছুটিয়া বাহির হইতেছে।

যতীন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল—সংবাদের জন্য। শেষ পর্য্যন্ত খুনখারাপী হইয়া গেলে অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার হইবে। উদ্বিগ্নভাবে সে ভাবিতেছিল—তাহার যাওয়া কি উচিত হইবে? না, তাহাকে এই ব্যাপারে কোনমতে জড়াইতে পারিলে—সমগ্র ঘটনাটারই রঙ পাল্টাইয়া যাইবে।

পদ্ম ইহারই মধ্যে তিনবার উঁকি মারিয়া দেখিয়া গিয়াছে—সে ঘরে আছে কি না!

যতীন শেষবারে বলিল—আমি যাই নি মা-মণি। আছি।

—তোমাকে বিশ্বাস নাই। সাংঘাতিক ছেলে তুমি।

যতীন হাসিল।

—হেসো না তুমি, হঁ্যা !···কথা বলিতে বলিতে পদ্ম পথের দিকে চাহিয়া বলিল—ওই ! ওই লাও, নেলো আসছে। দাও পয়সা দাও।

সেই চিত্রকর ছেলেটি—বৈরাগীদের নেলো আসিতেছে। পয়সার প্রয়োজন হইলেই নেলো আসে। অন্যথায় সে আসে না। নিঃশব্দে আসে—চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। প্রশ্ন না করিলে প্রয়োজন ব্যক্ত করিতে পারে না; কিন্তু উঠিয়াও যায় না, বসিয়াই থাকে। প্রশ্ন করিলে সংক্ষেপে বলে—পয়সা। দাবিও বেশী নয়, চার পয়সা হইতে চার আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজ কিন্তু নেলো একটু উত্তেজিত, মুখের ফ্যাকাসে গৌরবর্ণ রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে, চোখের তারা দু'টি অস্থির; সে আসিয়া আজ বসিল না, দাঁড়াইয়া রহিল।

—কি নলিন? পয়সা চাই?

—পণ্ডিতের মাথা ফেটে গিয়েছে।

—কার? দেবুবাবুর?

—হঁ্যা! আর কালীপুরের চৌধুরী মশায়ের।

—দ্বারকা চৌধুরী মশায়ের?

—হঁ্যা। পণ্ডিতের আমগাছ কাটছিল, পণ্ডিত একেবারে কুড়লের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—তারপর?

—লেঠেলদের সঙ্গে পণ্ডিতের ঠেলাঠেলি লেগে গেল। চৌধুরী মশায় গেল ছাড়াতে। তা' লেঠেলরা দু'জনাকেই ঠেলে ফেলে দিল।

—ফেলে দিলে?

—হঁ্যা। গাছ কাটছিল, সেই কাটা শেকড়ে লেগে দু'জনকারই মাথা ফেটে গেল।

—তারপর?

—খুব রক্ত পড়ছে! ধরাধরি করে নিয়ে আসছে।

—অন্য লোকেরা কি ক'রছিল?

—সব দাঁড়িয়ে ছিল, কেউ এগোয় নাই। কর্মকার কেবল একজনা লঠেল্‌কে এক লাঠি মেরে পালিয়েছে।

—জগন ডাক্তার কোথায়?

—সে জংসনে গিয়েছে—পুলিশের কাছে।

যতীন ঘরে ঢুকিয়া লিখিতে বসিল; টেলিগ্রাম। একখানা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে—একখানা এস-ডি-ওর কাছে। আর একখানা চিঠি—এ জেলার জেলা-কংগ্রেস-কমিটির কাছে। চিঠিখানা গোপনে পাঠাইতে হইবে।

টেলিগ্রাম করিতে ডাক্তারকে পাঠাইতে হইবে। কিন্তু এ পত্রখানা জগনের হাতে দেওয়া হইবে না। দেবুবাবু ভাল থাকিলেই তাহাকে সদরে পাঠানো সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত হইত। সে একটু ভাবিয়া নেলোকে ডাকিয়া বলিল—একটা কাজ করতে পারবে?

নলিন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল—হঁ্যা।

—একখানা চিঠি জংসনের ডাকঘরে ফেলতে হবে। একটা চার পয়সার টিকিট কিনে বসিয়ে দেবে। কেমন?

নলিন আবার সেই ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

—কাউকে দেখিয়ো না যেন।

নলিনের আবার সেই নীরব স্বীকৃতি।

—এই চার পয়সার টিকিট কিনবে। আর এই চার পয়সায় তুমি জল খাবে।

নলিন চিঠিখানা কোমরে রাখিয়া—তাহার উপর সযত্নে ভাঁজ করিয়া কাপড় বাঁধিয়া ফেলিল। আনি দুইটি বাঁধিল খুটে। তারপর ঘাড় হেঁট করিয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে চলিয়া গেল।

*　　*　　*　　*

সমস্ত গ্রামখানা চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জগন ডাক্তারের ডাক্তারখানায় দেবু ও চৌধুরীকে আনা হইয়াছিল; দেবু নিজে হাঁটিয়াই আসিয়াছে। তাহার আঘাত তেমন বেশী নয়, তাছাড়া তাহার জোয়ান বয়স—উত্তেজনাও যথেষ্ট হইয়াছিল; রক্তপাত বেশ খানিকটা হইলেও সে ভীত বা অবসন্ন হয় নাই। কিন্তু বৃদ্ধ চৌধুরী কাতর হইয়া পড়িয়াছে। আঘাতও তাঁহারই বেশী। প্রথম চৌধুরী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; চেতনা হইলেও ধরাধরি করিয়া বহিয়া আনিতে হইয়াছে। চৌধুরী চোখ বুজিয়া শুইয়াই আছে। দেবু নীরবে বসিয়া আছে দেওয়ালে ঠেস দিয়া। ধুইয়া দেওয়ার পর রক্তাভ জলের ধারা কপাল বহিয়া এখনও ঝরিতেছে। প্রায় সমস্ত গ্রামের লোকই জগনের ডাক্তারখানার সম্মুখে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

টিঞ্চার আয়োডিন, তুলা, গরমজল—ব্যাণ্ডেজ লইয়া জগন ব্যস্ত। হরেন তাহাকে সাহায্য করিতেছে। মাঝে মাঝে হাঁকিতেছে—হট যাও। ভিড় ছাড়ো।

রাঙাদিদি একটা গাছতলায় বসিয়া কাঁদিতেছে। দুর্গা দাঁতে দাঁতে টিপিয়া নিষ্পলক-নেত্রে দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময় ডাক্তারখানায় যতীন আসিয়া উঠিল।

জগন বলিল—গাছ সব আটকে দিয়েছি। পুলিশ এসে নোটিশ জারি করে দিয়েছে; কোন পক্ষই গাছের কাছে যেতে পাবে না। আমি বারণ ক'রে গেলাম, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কিছু কর না। কাটুক গাছ। ফিরে এসে দেখি—দেবু এই কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে। অনিরুদ্ধ একজনের পিঠে এক লাঠি ক'ষে পালিয়েছে।

ভিড়ের ভিতর হইতে অনিরুদ্ধ আগাইয়া আসিয়া বলিল—অনিরুদ্ধ

ঠিক আছে। সে মেয়ে নয়—মরদ।...অনিরুদ্ধের হাতে তাহার টাঙি। সে বলিল—টাঙিটা তখন যে হাতের কাছে পেলাম না। নইলে হয়েই যেত এক কাণ্ড!

যতীন বলিল—সে সব পরে যা' হয় ক'রবেন—এখন এঁদের তাড়াতাড়ি ব্যাণ্ডেজ করে ফেলুন।

বৃদ্ধ দ্বারকা চৌধুরী এতক্ষণে চোখ মেলিয়া মৃদু হাস্যের সহিত হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রণাম।

যতীন প্রতি-নমস্কার করিল—নমস্কার। কেমন বোধ করছেন?

—ভাল। মৃদু হাসিয়া বৃদ্ধ আবার বলিল—মনে করলাম মাঝে পড়ে মিটিয়ে দোব। দেবু গিয়ে কুড়ুলের সামনে দাঁড়াল। থাকতে পারলাম না চুপ ক'রে।

সকলে চুপ করিয়া রহিল! এ-কথার কোন উত্তর দিবার ছিল না।

বৃদ্ধ বলিল—পণ্ডিত নমস্য ব্যক্তি। শুধু পণ্ডিতই নয়, বীরপুরুষ। বয়স হ'লেও চশমা আমার এখনও লাগে না, দেবতা! কুড়ুলের সামনে পণ্ডিত যখন গিয়ে দাঁড়াল—তখনকার সে মূর্ত্তি পণ্ডিত নিজেও বোধ হয় কখনও আয়নায় দেখে নাই। বীরপুরুষ!

জগন বলিল—ওগুলো হল গোঁয়ার্ত্তুমি। কি ফল হ'ল? রাগ ক'র না, ভাই দেবু।

হাসিয়া বৃদ্ধ বলিল—সবার গাছই কেটেছে। গাছ এখনও দেবুরই দাঁড়িয়ে আছে, ডাক্তার।

জগন হরেন ঘোষালকে একটা প্রচণ্ড ধমক দিয়া উঠিল—কোন্ দিকে চেয়ে কাজ করছ ঘোষাল?

হরেন চমকিয়া উঠিল।

দেবু হাসিল। ডাক্তার বৃদ্ধের উপর চটিয়াছে।

* * *

পুলিশের একটা তদন্ত হইল।

শ্রীহরি কোন কথাই অস্বীকার করিল না। শ্রীহরির পক্ষে কথাবার্ত্তা যাহা বলিবার বলিল—দাসজী। দাসজী এখন জমিদারের সদর-কর্ম্মচারী, এখানকার ভূতপূর্ব্ব গোমস্তা। অভিজ্ঞ, সুচতুর, বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রজাস্বত্ব আইনে, ফৌজদারী আইনে—সে সাধারণ উকীল-মোক্তার অপেক্ষাও বিজ্ঞ। শ্রীহরি সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আনিয়াছে। ব্যাপারটা এখন আর গ্রামের লোক এবং ব্যক্তিগতভাবে শ্রীহরির মধ্যে আবদ্ধ নয়। জমিদারের গোমস্তা হিসাবে সে ব্যাপারটা করিয়াছে, সুতরাং দায়িত্ব জমিদারের উপরও পড়িয়াছে।

জমিদার বয়সে নবীন। এ-কালের বাংলাদেশের জমিদারের ছেলে। ইংরাজী লেখা-পড়া জানে, জমিদারি খুব পছন্দ করে না। বার কয়েক ব্যবসা করিবার চেষ্টা করিয়া লোকসান দিয়া অগত্যা জমিদারিকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া আছে। জমিদারির মধ্যে আইন অনুযায়ী চলিবার প্রথা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা তাহার আছে, সে-কালে জমিদারের মত জোর-জবরদস্তির ধারা সে মোটেই পছন্দ করে না। সেকালের জমিদারের মত ব্যক্তিত্বও তাহার নাই। কাজেই তাহার সাধু চেষ্টাও ফলবতী হয় না। প্রজার সুবিধার দিক চাহিয়া আইন করে—আবার কলিকাতা যাইবার টাকার অভাব ঘটিলেই নায়েব-গোমস্তার মতে মত দিতে বাধ্য হয়। কলিকাতায় সিনেমা দেখে, থিয়েটার দেখে, একটু-আধটু মদও খায়, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে দর্শক হিসাবে যায়। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার; লোকাল বোর্ডে দাঁড়াইয়া এবার পরাজিত হইয়াছে। আগামী বারে কংগ্রেস-নমিনেশন পাইবার জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিতেছে। এবার অর্থাৎ উনিশশো আটাশ

সালে কলিকাতায় যে কংগ্রেস অধিবেশন হইবে—তাহার ডেলিগেট হইবার চেষ্টাও সে এখন হইতেই করিতেছে।...

জমিদার কিন্তু এই সংবাদটা শুনিয়া পছন্দ করে নাই; বলিয়াছিল—এমন হুকুম যখন আমরা দিই নি, তখন আমাদের দায়িত্ব অস্বীকার করবেন। শ্রীহরি নিজে বুঝুক।

দাসজী হাসিয়া বলিয়াছিল—শ্রীহরির মত গোমস্তা পাচ্ছেন কোথায়? সেটা ভাবুন। গ্রামের লোকের সঙ্গে তার ঝগড়া হ'য়েছে। সে গোমস্তা হিসেবে কাজটা অন্যায়ই ক'রেছে। কিন্তু সে-লোকটা আদায় হোক-না-হোক মহলের প্রাপ্য পাই-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তা' ছাড়া, এই এক বছরে হ্যাণ্ডনোটেও সে টাকা দিয়েছে—হাজার দু'য়েক। তারপর সেটেলমেণ্টের খরচা আদায়ের সময় আসছে; এক শিবকালী-পুরেই লাগ্‌বে আপনার হাজার টাকার ওপর। তা'ছাড়া অন্য মহলের মোটা টাকাও আছে। এ সময় ওকে যদি ছাড়িয়ে দেন—তবে কি সেটা ভাল হবে?

জমিদারটি মিটিংয়ে দু'দশ কথা বলিতে পারে, সমকক্ষ স্বজন-বন্ধুর মধ্যে বেশ স্পষ্ট বক্তা বলিয়া খ্যাতি আছে; কিন্তু এই দাসজীটি যখন এমনই ধারায় চিবাইয়া চিবাইয়া কথা কয়, তখন জলমগ্ন ব্যক্তির মত হাঁপাইয়া উঠিয়া অসহায়ভাবে দুই হাত বাড়াইয়া সে আত্মসমর্পণ করে।

—আচ্ছা, এক কাজ করুন না কেন। শিবকালীপুর শ্রীহরিকে পত্তনি দিয়ে দেন-না!

—পত্তনি?

—হ্যাঁ, ধরুন, শ্রীহরি পাবে দু-হাজারের ওপর। তা ছাড়া—আবার এই সেটেলমেণ্টের খরচা লাগবে—হাজার পাঁচেক। আর শ্রীহরিকে গোমস্তা রাখতে গেলে—এমনি বিরোধ হবেই। শ্রীহরি নেবেও গরজ করে।

—ও পত্তনি-টত্তনি নয়। যদি কিনে নিতে চায় তো দেখুন।

সম্পত্তি হস্তান্তরে জমিদারের আপত্তি নাই। সে নিজেই বলে—জমিদারি নয়, এ হ'ল জমাদারি।

* * * *

তদন্তে দাসজী সবিনয়ে সব স্বীকার করিল। আজ্ঞে হ্যাঁ, গাছ কাটতে আমরা জমিদার তরফ থেকে হুকুম দিয়েছি। শ্রীহরি ঘোষ আমাদের গোমস্তা হিসেবেই গাছ কাটতে লোক নিযুক্ত করেছিলেন। বৈশাখ মাসে গাছ আমরা হিন্দুরা—কাটি না, কাজেই চৈত্র মাসে কাটাবার ব্যবস্থা। এই সময়েই আমাদের সমস্ত বছরের কাঠ কেটে রাখা হয়।

জগন বলিল—তা' কাটুন না। নিজের গাছ কাটুন, জমিদার কেন—

বাধা দিয়া দাসজী বলিল—নিজের গাছই তো। ও সব গাছই তো জমিদারের।

—জমিদারের ?

—আপনারাই বলুন জমিদারের কি না ?

—না। আমাদের গাছ।

—আপনাদের ? ভাল, কখনও আপনারা গাছের ডাল কেটেছেন ?

—ডাল কাটিনি। কিন্তু আমরাই চিরকাল দখল ক'রে আসছি।

—হ্যাঁ। আপনারাই ফল ভোগ করেন। কিন্তু সে তো জমিদারের তালগাছের তাল কাটেন—পাতা কাটেন আপনারা! শিমুল গাছের 'পাবড়া' পাড়েন আপনারা! সরকারী পুকুরে লোকে পলুই চেপে মাছ ধরে। পুকুর পর্যন্ত গ্রামের লোকে একটা ভাগ ক'রে রেখেছে; এ পুকুরে মাছ ধ'রবে—রাম, শ্যাম, যদু; ও পুকুরে ধ'রবে—কালী, কানাই, হরি; অন্য পুকুরে ধ'রবে—ভবেশ, দেবেশ, যোগেশ। এখন এই তালগাছ—এই পুকুরও কি আপনাদের মালেকানি ?

দেবু এতক্ষণে বলিল—ভাল কথা, দাসমশায়। কিন্তু এই সব গাছ যদি আপনাদের, তবে আপনারা এত লাঠিয়াল পাঠিয়েছিলেন কেন? জোর-দখল প্রয়োজন হয় কোথায়? যেখানে দখল নাই সেইখানে—অথবা যেখানে বে-দখলের সম্ভাবনা আছে সেইখানে। মানে সেখানেও দখল সন্দেহজনক।

দাস হাসিয়া বলিল—না। লাঠিয়াল আমরা পাঠাইনি। আমরা পাঠিয়েছিলাম পাইক। লাঠি তাদের হাতে থাকে। ওদের ছু ছোটের সামিল ওটা। এখন ধরুন, যার যেমন বিয়ে, তার তেমন বাদ্যি। আপনার আমার বাড়ীতে বিয়ে হয়, বাজে একটা ঢোল—একটা কাঁসী। বড় জোর সঙ্গে সানাই। জমিদার বাড়ীর বিয়েতে বাজনা হয়—হরেক রকমের। জমিদার-তরফ থেকে গাছ কাটতে এসেছে, পাঁচ-সাতটা গাছ কাটবে, মজুর আছে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন—তার সঙ্গে আট-দশটা পাইক এসেছে—কি এমন বেশী এসেছে? আপনারা এমন বে-আইনী দাঙ্গা ক'রবেন জানলে—আমরা অন্তত পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল পাঠাতাম। তার আগে অবশ্য শান্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা জানিয়ে খবর দিতাম থানায়। তা' ছাড়া আইন তো আপনি বেশ জানেন গো দেবুবাবু; গাছ কার' বলুন না আপনি?

আজ দারোগা নিজে তদন্তে আসিয়াছিল। দারোগাবাবু লোকটি ভাল। ক্ষমতার অপব্যবহার করে না, লোকটিও ভদ্র। দারোগা বলিল—যাই বলুন, দাসজী, কাজটা ভাল হয় নাই। মানুষের মনে আঘাত দিতে নাই। তবে—আইন আপনাদের পক্ষ—এই পর্য্যন্ত। যাক্—আমাদের এতে ক'রবার কিছু নাই। স্বত্বের মামলার বিষয়। আমরা নোটিশ দিয়েছি—মুখেও উভয় পক্ষকে বারণ ক'রছি—আদালতে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কেউ গাছের কাছ দিয়ে যাবেন না। গেলে

ফৌজদারী হ'লে—আমরা তখন চালান্ দেব। পুলিশ বাদী হ'য়ে মামলা ক'রবে।

তারপর উঠিবার সময় দারোগা আবার বলিল—প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন হ'চ্ছে জানেন তো, দাসজী?

—আজ্ঞে জানি বৈকি। দাসজী হাসিল। তারপর বলিল—হ'লে আমবা বাঁচি, দারোগাবাবু, আমরা বাঁচি।

দারোগাকে বিদায় করিয়া শ্রীহরি দাসজীকে লইয়া আপনার বৈঠকখানায় উঠিল। শ্রীহরি নূতন বৈঠকখানা করিয়াছে। খড়ের ঘর হইলেও পাকা সিঁড়ি, পাকা বারান্দা, পাকা মেঝে। দাস তারিফ করিয়া বলিল, বা—বা—বা! এ যে পাকা আসর ক'রে ফেললে, ঘোষ! কিন্তু আমাদের নীলকণ্ঠের গান জানেন তো? যদি ক'রবে পাকা বাড়ী—আগে কর জমিদারি!

শ্রীহরি তক্তাপোষের উপরের সতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া দিয়া বলিল—বসুন।

বসিয়া দাসজী বলিল—জমিদারি কিনবে ঘোষ?

—জমিদারি?····শ্রীহরি চমকিয়া উঠিল। জমিদারির কল্পনা সে স্পষ্টভাবে কখনও করে নাই।

সে প্রশ্ন করিল—কোন্ মৌজা? কাছে পিঠে বটে তো?

—খোদ শিবকালীপুর! কিনবে?

শ্রীহরি বিচিত্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দাসজীর দিকে চাহিয়া রহিল। শিবকালীপুরের জমিদারি? গ্রামের প্রতিটি লোক হইবে তাহার প্রজা! ঘোষ মহাশয় হইবে সকলের মনিব, বাবু-মহাশয়, হুজুর! চকিতে তাহার অধীর মন নানা কল্পনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে সে হাট বসাইবে। স্নানের মজা-দীঘিটা কাটাইয়া দিবে, চণ্ডীমণ্ডপে পাকা দেউল তুলিবে, আটচালা ভাঙিয়া নাটমন্দির গড়িবে এল-পি

পাঠশালার বদলে এম-ই স্কুল করিবে; নাম হইবে 'শ্রীহরি এম-ই স্কুল'। ইউনিয়নবোর্ড হইতে লোকালবোর্ডে দাঁড়াইবে।

দাসজী বলিল—কিনে ফেল ঘোষ। তোমার পয়সা আছে। জমিদারি হ'ল অক্ষয় সম্পত্তি। তা ছাড়া—এই গাঁয়ের যারা তোমার শত্রু—একদিনে তোমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে। সেটেলমেণ্ট ফাইনাল পাব্লিকেশনের আগেই কেনো। দরখাস্ত ক'রে নাম সংশোধন করিয়ে নাও। ফাইনাল পাব্লিকেশনের পরই পাঁচধারার কোর্ট পাবে। টাকায় চার আনা বৃদ্ধি তো হবেই। আট আনার নজীর হাইকোর্ট থেকে নিয়ে রেখেছি। শোন, আমি সুবিধা দরে ক'রে দেব।—হ্যাঁ, দরজাটা একটু বন্ধ করে দাও দেখি।

শ্রীহরি দরজা বন্ধ করিয়া দিল।...

দীর্ঘকাল পরামর্শ করিয়া হাসিতে হাসিতেই দুজনে বাহির হইল। দাসজী বলিল—ও নোটীশ তোমার বাজে, একদম বাজে নোটীশ নিয়েছে, তুমি যদি যাও—তার ফলে যদি শান্তিভঙ্গ ঘটে—তবে হেনো হবে—তেনো হবে। কিন্তু শান্তিভঙ্গ যদি না হয়?....দাসজী ঠোঁট টিপিয়া হাসিতে আরম্ভ করিল।

শ্রীহরি বলিল—তবে আমি নিশ্চিন্দি হ'য়ে ক'রতে পারি?

—নিশ্চয়। তবে সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে। কোন হাঙ্গামা যেন না হয়।

—আর গাজনের কি ক'রব?

—যা' হয় কর।

—চণ্ডীমণ্ডপ তা' হলে যেমন আছে তেমনি থাক্।

—ওই কাজটি, ক'র না ঘোষ। আমি বারণ করছি। চণ্ডীমণ্ডপের সেবাইৎ জমিদার বটে, কিন্তু অধিকার গাঁয়ের লোকের। পাকা নাট-মন্দির, দেব-মন্দির নিজের বাড়ীতে কর। সম্পত্তি থাকতেও আছে—

যেতেও আছে। যদি কোনদিন সম্পত্তি চ'লেও যায়—তখন আর কোন অধিকার থাকবে না তোমার।

দাসজী শ্রীহরিকে চণ্ডীমণ্ডপের উপর টাকা খরচ করিতে নিষেধ করিতেছে। যে দিন-কাল পড়িয়াছে! সাধারণের জিনিসে নিজের টাকা খরচ করা মূর্খতা মাত্র!

* * * *

পরদিন প্রাতঃকালেই গ্রামে আবার একটা হৈ চৈ উঠিল।

দেবু ঘোষের আধ-কাটা আমগাছটা গতরাত্রেই কাটিয়া কেহ তুলিয়া লইয়াছে। কেহ আর কে? শ্রীহরি লইয়াছে। শান্তিভঙ্গ হয় নাই, সুতরাং আইন-ভঙ্গও সে করে নাই। সদ্যকাটা গাছটার শিকড়ের উপর আঙুল চারেক কাণ্ডটা কেবল জাগিয়া আছে! কাটা-গাছটার অবশিষ্ট কোথাও বিশেষ পড়িয়া নাই। কেবল কতকগুলা ঝরা কাঁচা পাতা, কতকগুলা কাঁচা আম, আঙুলের মত সরু দুই-চারিটা ডাল, শিকড়-কাটা কতক কুচা কাঠ পড়িয়া আছে। জমিটার জলসিক্ত নরম মাটিতে গাড়ীর চাকার দাগে, গরুর ক্ষুরের চিহ্নে, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত রহিয়াছে গত রাত্রের কাহিনী।

ঘোষাল আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছিল—বেগুলার থেফ্‌ট্ কেস। হ্যাণ্ডকাফ্ দিয়ে চালান দোব।

দেবু বারণ করিল—না। ওসব ব'ল না, ঘোষাল।

জগন বলিল—দুপুরের ট্রেনেই চল মামলা রুজু ক'রে আসি।

দেবু বলিল—না।...

ধীরে ধীরে দেবু আসিয়া বসিল যতীনের কাছে।

যতীন বলিল—শুনলাম গাছটা রাতারাতি কেটে নিয়েছে।

দেবু একটু ম্লানহাসি হাসিল।

জগন বলিল—মামলা ক'রতে ব'লছি, দেবু রাজী হ'চ্ছে না।

—কি হবে মামলা ক'রে। গাছ আইন অনুসারে জমিদারের। মিছে টাকা খরচ ক'রে কি লাভ?

—এরই মধ্যে যে অবসন্ন হয়ে পড়লেন, দেবু-বাবু?

—হ্যাঁ। অবসন্ন হয়েছি যতীন বাবু। আর পারছি না!

—দাঁড়ান, একটু চা করি।—উচ্চিংড়ে! উচ্চিংড়ে!

একা উচ্চিংড়ে নয়, সঙ্গে আরও একটা বাচ্চা আসিয়া হাজির হইল।

—চা ক'রতে বল মা-মণিকে।

হরেন বলিল—ওটা আবার কোথা থেকে জুটল? 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর'।

হাসিয়া যতীন বলিল—উচ্চিংড়েব জংসনেব বন্ধু। কাল পুলিশের পেছনে পেছনে এসেছিল গাছ-কাটার হাঙ্গামা দেখতে। সেখানে বনের পাখী আর খাঁচার পাখীতে মিলন হ'য়েছে। উচ্চিংড়ে ওকে নিয়ে এসেছে।

—বেশ আছেন, মশায়, নন্দী-ভৃঙ্গী নিয়ে। আপনার কাছেই এসে জোটে সব।

—আমার কাছে নয়। উচ্চিংড়ে ওকে নিয়ে এসেছে—মা-মণির কাছে।

—মানে কামার-বউয়ের কাছে?

হাসিয়া যতীন বলিল—হ্যাঁ।

—অনিরুদ্ধ ওকে মেরে তাড়াবে।

—কাল বোঝা-পড়া হ'য়ে গেছে। অনিরুদ্ধবাবু তাড়াতে চেয়েছিলেন। মা-মণি বলেছেন, ও গরু চরাবে—খাবে থাকবে। অনিরুদ্ধবাবু গরু কিনেছেন কিনা। আর কামারশালার হাপড় টানবে।

উচ্চিংড়ে আসিয়া দাঁড়াইল—চা লাও গো বাবু।

ওদিকে ঢাক বাজিয়া উঠিল। উচ্চিংড়ে তাড়াতাড়িতে অর্দ্ধেক চা

উপ্‌চাইয়া ফেলিয়া, চায়ের বাটিগুলা নামাইয়া দিয়াই—দাওয়া হইতে এক লাফ দিয়া পথে পড়িল ; ডাং ডাং ন্যাটাং ড্যাটাং ! আয়রে—গোবরা, শিব উঠবে।

গাজনের ঢাক বাজিতেছে। বর্ষাকাল পরে গাজনের শিবকে আজ জল হইতে তোলা হইবে।

জগন বলিল—ভক্ত কে-কে হ'ল জান, ঘোষাল ?

হরেন বলিল—ওন্‌লি ফাইব্।....একটা হাতের আঙুলগুলি প্রসারিত করিয়া দেখাইয়া দিল।

—চল, ব্যাপারটা দেখে আসি।

—চল।

জগন, হরেন চলিয়া গেল।

যতীন বলিল—দেবু-বাবু ?

—বলুন ?

—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি—দেবু হাসিল।....তারপর বলিল—দেখবেন ?

—কি ?

—আসুন আমার সঙ্গে।

অল্প খানিকটা আসিয়াই শ্রীহরির বাড়ী, বাড়ীর পর খামার। পথ হইতেই খামারটা দেখা যায়। প্রকাণ্ড একটা জনতা সেখানে জমিয়া আছে। খামারের উঠানের মাঝখানে সোণার বর্ণ ধানের একটি স্তূপ। পাশেই তিনটি বাঁশের তে-পায়াতে বড় বড় ওজনের কাঁটা-পাল্লা টাঙানো হইয়াছে। একটা গাছের তলায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া আছে শ্রীহরি। জনকয়েক লোক দেবু ও যতীনকে দেখিয়া আড়ালে লুকাইয়া দাঁড়াইল। ওজনের পাল্লায় অবিরাম ধান ওজন চলিতেছে—দশ রামে—ইগার্ ইগার ! ইগার রামে বার্ বার।

দেবু বলিল—দেখলেন ?

যতীন হাসিয়া বলিল—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল্‌রে'।

কিছুক্ষণ পর যতীন বলিল—আপনি তা' হ'লে বিবাদ মিটিয়ে ফেলুন দেবু-বাবু সত্যই বড় কষ্টে পড়বেন আপনি।

দেবু হাসিল, বলিল—ও ভাবনা আর ভাবিনে। ভাবছি—এত-দিনের গাজন, আমাদের গ্রামে গাজনে কত ধুম ছিল, সমস্ত গ্রামের লোক প্রাণ দিয়ে খাট্‌ত। অন্য গাঁয়ের সঙ্গে আমাদের গাজনের ধুমের পাল্লা চলত। সে সব উঠে যাবে ? নয় তো শ্রীহরির একলার হাতে গিয়ে পড়বে ? দেবতাতে স্বুদ্ধ আমাদের অধিকার থাকবে না ? ভগবানে আমাদের অধিকার থাকবে না ?

নেলো আসিয়া দাঁড়াইল।

যতীন বলিল—কি সংবাদ নলিন ?

—আট আনা পয়সা। গাজনে এবার মেলা বসাবে ঘোষ-মশায়। পুতুল তৈরী করে বিক্রী করব। রং কিনব।

—মেলা বসাবে শ্রীহরি ?...দেবু উঠিয়া বসিল।

নলিনকে বিদায় করিয়া যতীন বলিল—নলিনের হাতটি চমৎকার।

দেবু বলিল—ওর মাতামহ যে ছিল নামকরা কুমোর।

—কুমোর ? নলিনতো বৈরাগী !

—হ্যাঁ। কাঁচের পুতুলের চল্‌ হ'ল ; শেষ বয়সে অভাবে পড়ে বুড়ো ভিক্ষে ধ'রে বোষ্টম হয়েছিল। তা' ছাড়া বিধবা মেয়েটার বিয়ের জন্যেও বোষ্টম হওয়া বটে।...কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া দেবু আবার বলিল—শ্রীহরি এবার তা' হ'লে ধুম ক'রে গাজন করবে দেখ্‌ছি !

পঁচিশ

ঢাকের বাজনার শব্দে ভোরবেলাতেই—ভোরবেলা কেন, তখনও খানিকটা রাত্রি ছিল, যতীনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গাজনের ঢাক। পূর্ব্বে পূর্ব্বে চৈত্রের প্রথম দিন হইতেই গাজনের ঢাক বাজিত। গতবার হইতেই পাতু দেবোত্তর চাকরাণ জমি ছাড়িয়া দেওয়ার পর চৈত্রের বিশ তারিখ হইতে ঢাক বাজিতেছে! ভিন্ন গ্রামের একজন বায়েনের সঙ্গে নগদ বেতনে—নূতন বন্দোবস্ত হইয়াছে। শেষ রাত্রিতে ঢাকের বাজনা—যতীনের বেশ লাগিল। ঢাকের বাজনার মধ্যে আছে একটা গুরু-গম্ভীর প্রচণ্ডতা। রাত্রির নিস্তব্ধ শেষ প্রহরে প্রচণ্ড গম্ভীর শব্দের মধ্যে একটি পবিত্রতার রেশ সে অনুভব করিল। দরজা খুলিয়া সে বাহিরে আসিয়া বসিল।

সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল ;—গ্রামখানার এই শেষ রাত্রেই জাগরণের সাড়া উঠিয়াছে! ঢেঁকিতে পাড় পড়িতেছে ; মেয়েরা ইহারই মধ্যে পথে বাহির হইয়াছে। হাতে জলের ঘটি। চণ্ডীমণ্ডপে জল দিতে চলিয়াছে। রাঙাদিদি বড় বড় করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম করিতেছে—এখান হইতে শোনা যাইতেছে। জনকয়েক গাজনের ভক্ত স্নান শেষ করিয়া ফিরিতেছে—তাহারা ধ্বনি দিতেছে—বলে শি-বো-শিবো-শিবো হে! হর-হর বোম্—হর-হর বোম্!

যতীন সকালেই ওঠে, কিন্তু এই শেষ রাত্রে সে কোনদিন উঠে নাই। পল্লীর এ-ছবি তাহার কাছে নূতন। সে যখন উঠে, তখন রাঙাদিদি ভগবানকে এবং পিতৃপুরুষকে গালিগালাজ আরম্ভ করে। মেয়েদের ঘর-পাট ও দেবার্চ্চনা শেষ হইয়া গৃহকর্ম্ম আরম্ভ হইয়া যায়।

অনিরুদ্ধের বাড়ীর খিড়কীর দরজা খুলিয়া গেল। আবছা

অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্ত্তির মত—উচ্চিংড়ে ও গোবরা বাহির হইয়া গেল। তাহাদের পিছনে বাহির হইয়া আসিল পদ্ম, তাহার হাতেও জলের ঘটি।

একটানা কঁ্যা-কোঁ্যা শব্দে একখানা সার-বোঝাই গরুর গাড়ী চলিয়া গেল। শেষ রাত্রি হইতেই মাঠের কাজ সুরু হইয়া গিয়াছে। সার ফেলার কাজ চলিতেছে। সারের গাড়ীতেই আছে—জোয়াল লাঙ্গল। সার ফেলিয়া জমিতে লাঙল চষিবে। সেদিনের জলের রস এখনও জমিতে আছে। মাটির বতর এখন চমৎকার, অর্থাৎ রোদ পাইয়া কাদার আঠা মরিয়া মাটি চমৎকার চাষের যোগ্য হইয়াছে। লাঙলের ফাল কোমল মাটির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া চিরিয়া চলিবে নিঃশব্দে, নির্ব্বিঘ্নে, স্বচ্ছন্দ গতিতে—ছানার তালের মধ্যে ধারালো ছুরির মতন। বড় বড় চাঁই দুইপাশে উল্‌টাইয়া পড়িবে; অথচ লাঙলের ফালে এতটুকু মাটি লাগিবে না, সামান্য আঘাতেই চাঁইগুলা গুঁড়া হইয়া যাইবে। গরু মহিষগুলি চলিবে অবহেলায়—ধীর অনায়াস গতিতে। এই কর্ষণের মধ্যে চাষীর বড় আনন্দ। অন্তরে অন্তরে যেন আনন্দের রস ক্ষরণ হয়।

একসঙ্গে সারিবন্দী—শোভাযাত্রার মত হাল গেল ছয়খানা; পিছনে চারখানা সার-বোঝাই গাড়ী। বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট সবলকায় হেলে-বলদগুলি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। এগুলি সবই শ্রীহরি ঘোষের। ঘোষের ঘরে দশখানা হাল, বারজন কৃষাণ। ঘোষের সুপ্রসন্ন ভাগ্যচ্ছটার প্রতিফলন তাহার সর্ব্বসম্পদে সুপরিস্ফুট।

যতীন জামা গায়ে দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিয়া পড়িল মাঠে। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের প্রান্তে ময়ূরাক্ষীর বাঁধ, বাঁধের গায়ে কচি সবুজ শরবনের চাপ। তাহারই ভিতর হইতে উঠিয়াছে—তালগাছের সারি। মধ্যে মধ্যে পলাশ-পালতে-শিমূল-শিরীষ-তেঁতুলের গাছ। গাছগুলির মাথার উপরে

অস্পষ্ট আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের গায়ে জংসন-শহরের কলের চিমনী। কলে ভোঁ বাজিতেছে—একসঙ্গে চার পাঁচটা কলে বাজিতেছে।

মাঠ পার হইয়া সে বাঁধে উঠিল। বাঁধ হইতে নামিল ময়ূরাক্ষীর চর-ভূমিতে। জল পাইয়া চরের বেনাঘাসগুলি ঘন সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারই মধ্যে সযত্নকর্ষিত তরি-ফসলের জমিগুলিব গিরিরঙের মাটি বড় চমৎকার দেখাইতেছে। জমির মধ্যে তরকারির চারাগুলি সাপের ফণার মত ডগা বাড়াইয়া লতাইতে সুরু করিয়াছে। ভোর বেলায় তিতির পাখীর দল বাহির হইয়াছে খাদ্যান্বেষণে। উইয়ের ঢিবি, পিঁপড়ের গর্ত্ত ঠোক্‌রাইয়া উই ও পিঁপড়ে খাইয়া ফিরিতেছে। যতীনের সাড়ায় কয়টা তিতির ফর্-ফর্ শব্দে উড়িয়া দূরে গিয়া জঙ্গলেব মধ্যে লুকাইল।

আকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে। যতীন নদীর বালির উপর গিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বদিগন্তে চৈত্রের বালুকাগর্ভময়ী ময়ূরাক্ষী ও আকাশের মিলন-রেখায় সূর্য্য উঠিতেছে। কয়েকদিন পরেই মহাবিষুব-সংক্রান্তি। ময়ূরাক্ষী এখানে ঠিক পূর্ব্ববাহিনী।

ময়ূরাক্ষী পার হইয়া সে জংশনের ঘাটে উঠিল। সপ্তাহে দুই দিন তাহাকে থানায় গিয়া হাজিরা দিতে হয়। অন্যান্য দিন সে চা খাইয়া থানায় যায়। আজ ভোরবেলার নেশায় সে বাহির হইয়া এতটা যখন আসিয়াছে, তখন জংসনে হাজিরার কাজটা সারিয়া যাওয়াই ঠিক করিল।...

গ্রামের পথে পা দিয়াই যতীন আবার এক হাঙ্গামার সংবাদ পাইল। হাঙ্গামায় হাঙ্গামায় কয়েকদিন হইতেই গ্রামখানার মন্থর জীবন-যাত্রা অকস্মাৎ যেন তাল-ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। আজ শ্রীহরির বাগানে কে বা কাহারা গাছ কাটিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়াছে। গুজবে

জটলায়, উত্তেজনায় গ্রামখানা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় শ্রীহরি ঘোষ রাগে-দুঃখে অধীর প্রায় মাথার চুল ছিঁড়িয়া বেড়াইতেছে। 'অকস্মাৎ তাহার মধ্য হইতে আজ বাহির হইয়া আসিয়াছে পূর্ব্বের সেই ছিরু পাল।'

'গ্রাম হইতে অল্প দূরে—উত্তর মাঠে অর্থাৎ যেদিকে ময়ূরাক্ষী নদী—তাহার বিপরীত দিকে, বন্যাভয়-নিরাপদ মাঠের মধ্যে—একটা মজা পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করিয়া সেই পুকুরের চারি পাশে শ্রীহরি সখ করিয়া বাগান তৈয়ারী করিয়াছিল। অতীত দিনের চাষী ছিরুর সৃষ্টির নেশার সঙ্গে—বর্ত্তমানের আভিজাত্যকামী শ্রীহরির কল্পনা মিশাইয়া বাগানখানি রচিত হইয়াছিল। শ্রীহরি দামী কলমের বহু চারা আনাইয়া পুঁতিয়াছিল;—মালদহ, মুর্শিদাবাদ হইতে আমের কলম, কলিকাতা হইতে লিচু-জামরুলের কলম ও নানা স্থান হইতে কানাইবাঁশী, অমৃতসাগর, কাবুলী প্রভৃতির কলার চারা সংগ্রহ করিয়া আনাইয়াছিল। শুধু ফলের কামনাই নয়, ফুলের নেশাও তার ছিল—অশোক, চাঁপা, গোলাপ, গন্ধরাজ, বকুলের গাছও অনেকগুলি লাগাইয়াছিল।

শ্রীহরির কল্পনা ছিল আরও অনেক। বাগানের মধ্যে—সৌখীন দুই-কামরা একখানি ঘর, ঘরের সামনে—পুকুরের দিকে খানিকটা বাঁধানো চত্বর হইতে নামিয়া যাইবে একটি বাঁধানো ঘাটের সিঁড়ি। সেই কল্পনায় কাঁচা ঘাটের দুই পাশে দুইটি কনক-চাঁপার গাছ পুঁতিয়াছিল। অশোক ফুলের চারা বসাইয়াছিল—বাগানে ঢুকিবার পথের পাশেই। গাছগুলি বেশ একটু বড় হইলেই গোড়া বাঁধাইয়া বসিবার স্থান তৈয়ারী করিবার ইচ্ছা ছিল। সন্ধ্যায় সে বন্ধু-বান্ধব লইয়া বাগানে আসিয়া বসিবে, ইচ্ছা হইলে রাত্রে আনন্দ করিবে! গান-বাজনা-পান-ভোজন—কঙ্কণার বাবুদের মত!

গত রাত্রে কে বা কাহারা শ্রীহরি ঘোষের সেই বাগানটিকে কাটিয়া তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়াছে। শ্রীহরি বলিতেছে—চীৎকার করিয়া বলিতেছে—তাহাদেরও মাথায় কোপ মারব আমি!

তাহার ধারণা—যাহাদের গাছ সে কাটিয়াছে, এ কাজ তাহাদেরই। পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি আক্রোশে অশ্বত্থামা যেমন নিষ্ঠুর আক্রোশে অন্ধকারের আবরণে পাণ্ডব-শিশুগুলিকে হত্যা করিয়াছিলেন—তেমনি আক্রোশেই কাপুরুষ শত্রু সখের চারা-গাছগুলিকে নষ্ট করিয়াছে। শ্রীহরি ছাড়িবে না, অশ্বত্থামার শিরোমণি কাটিয়া সে প্রতিশোধ লইবে। থানায় খবর পাঠানো হইয়াছে। পথে ভূপালের সঙ্গে যতীনের দেখা হইয়াছে।

হরেন ঘোষাল দস্তুরমত ভড়কাইয়া গিয়াছে। শ্রীহরির এই মূর্তিকে তাহার দুরন্ত ভয়। সে আমলে ছিরু পাল তাহাকে একদিন জলে ডুবাইয়া ধরিয়াছিল—ঘাড়ে ধরিয়া মাটিতে মুখ রগড়াইয়া দিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভয় করে না, ভদ্রলোক বলিয়া খাতির করে না। যতীন ফিরিতেই সে শুষ্কমুখে আসিয়া কাছে বসিল, বলিল—যতীনবাবু, কেস ইজ্‌ সিরিয়াস্‌। ছিরু পাল ইজ্‌ ফিউরিয়স্‌!

জগন ঘোষ খুব খুসী হইয়াছে। সে ইহাকে সর্বোত্তম সূক্ষ্ম বিচারক বিধাতার দণ্ড-বিচারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছে। থার্ড-ক্লাস-পর্য্যন্ত-পড়া বিদ্যায় সে আজ দেবভাষায় ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দিল—ষণ্ডস্য শত্রু ব্যাঘ্রেন নিপাতিতঃ। অর্থাৎ ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিয়াছে।

দেবু বলিল—না ডাক্তার কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। ছি!

—তোমার কথা বাদ দাও ভাই, তুমি হ'লে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

দেবু কোন উত্তর দিল না; রাগও করিল না। সে সত্য সত্যই দুঃখিত হইয়াছে। ওই গাছগুলি শ্রীহরি যত্নে পুঁতিয়াছিল—ফলও সেই ভোগ করিত। শ্রীহরি তাহার গাছ কাটিয়াছে, তবু সে দুঃখ

পাইয়াছিল। কাজটা অন্যায়। গাছপালার উপর তাহার বড় মমতা। ওই গাছ বড় হইত, ফুলে-ফলে ভরিয়া উঠিত প্রতিটি বৎসর; পুরুষানুক্রমে তাহারা বাড়িয়া চলিত। মানুষের চেয়ে গাছের পরমায়ু বেশী। শ্রীহরি, শ্রীহরির সন্তান-সন্ততি, তাহার উত্তরাধিকারী—তাহারও পরের পুরুষ ওই গাছের ফলে-ফুলে পরিতৃপ্ত হইত। দেবতার ভোগ দিত, গ্রামে বিলাইত, লোক তৃপ্ত হইত। সে গাছ কি এমন ভাবে নষ্ট করিতে আছে?

ভোঁ শব্দে দৌড়াইয়া আসিয়া উচ্চিংড়ে বলিল—দারোগা এসেছে।

হরেন চমকিয়া উঠিল—কোথায়?

উচ্চিংড়ে তখন বাড়ীর মধ্যে গিয়া ঢুকিয়াছে। জবাব দিল গোবরা, সে উচ্চিংড়ের পিছনে ছিল, বলিল—সেই পুকুর দেখে গাঁয়ে আসছে।

এবার জগনও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, বলিল—যতীনবাবু, বেটা নিশ্চয় আমাদের সবাইকেই সন্দেহ ক'রে এজাহার দেবে। পুলিশও বোধ হয় আমাদিগকেই চালান দেবে। জামিন-টামিনের ব্যবস্থা কিন্তু আপনাকেই করতে হবে। আপনি কংগ্রেসের সেক্রেটারীকে চিঠি লিখে রাখুন।

দুর্গা আসিয়া দাঁড়াইল।—জামাই পণ্ডিত।

—দুর্গা?....দেবু যতীনের তক্তাপোষে শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল।

—হ্যাঁ। বাড়ী এস।

—কেন রে?

—পুলিশ এসেছে, ঘর দেখবে। ডাক্তার, আপনার ঘরের ছামনেও সিপাই দাঁড়িয়েছে।

হরেন সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া বলিল—মাই গড্! মায়ের গীতাটা নিয়ে হয়েছে আমার মরণ।

একজন পুলিশের কনেস্টবল জন তিনেক চৌকীদার লইয়া আসিয়া অনিরুদ্ধের তিন দরজায় পাহারা দিয়া বসিল।

পথে যাইতে যাইতে দুর্গা বলিল—জামাই-পণ্ডিত!

—কি রে?

—ঘরে কিছু থাকে তো আমাকে দেবে। আমি ঠিক পেট-আচলে নিয়ে বাইরে চলে যাব।

—কি থাকবে আমার ঘরে? কিছু নাই।

বাড়ীর দুয়ারে সাব-ইন্সপেকটার নিজে ছিল; সে বলিল—পণ্ডিত, আপনার ঘর আমরা সার্চ্চ করব। দুগ্‌গা, তুই ভেতরে যাস্‌ নে।

দুর্গা বলিল—ওরে বাবা, যে দুধের ঘটি রয়েছে দারোগা বাবু। আবার আমাকে নিয়ে পড়লেন ক্যানে?

হাসিয়া দারোগা বলিল—তুই ভারী বজ্জাৎ। কোথায় ঘটি আছে বল্‌—চৌকীদার এনে দেবে।

দেবু বলিল—আসুন দারোগাবাবু। দুর্গা তুই ব'স, ঘটি আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দারোগা বলিল—ঝর্‌ঝরে জায়গায় ব'স্‌ দুর্গা, দেখিস্‌—সাপে কি বিছেয় কামড়ায় না যেন।

দেবু একটা জিনিসের কথা ভাবে নাই।

পুলিশ বাড়ী ঘর অনুসন্ধান করিয়া, দা-কুড়ুল-কাটারী বেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে গত রাত্রের কচি গাছ কাটার কোন চিহ্ন আছে কি না; কিন্তু সে সব কিছুই পাওয়া গেল না। কাচা কাপড়গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—তাহাতে কলাগাছের কষের চিহ্ন আছে কিনা। কিন্তু তাও ছিল না। পুলিশ লইল নূতন প্রজা-সমিতির খাতাপত্রগুলি। এই খাতাপত্রগুলির

কথা দেবুর মনে হয় নাই। অন্য সকলের বাড়ী হইতে পুলিশ শুধু হাতেই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

শ্রীহরি যতীনের নামেও এজাহার দিয়াছিল—তাহাকেও তাহার সন্দেহ হয়। শ্রীহরির বন্ধু জমাদার-সাহেব হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সাব-ইন্সপেক্টার শ্রীহরির এ কথা গ্রাহ্যই করিল না। বলিল—ঘোষ মশাই, সবেরই মাত্রা আছে, মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না।

(এ সংসারে যাহারা আপন সত্যের বিধান লঙ্ঘন করিতে চায়—) বিধাতাকে সব চেয়ে বেশী মানে তাহারাই। বিধাতার তুষ্টি লাভ করিলে সর্ব্বপ্রকার বিধান লঙ্ঘন-জনিত অপরাধের দণ্ড লঘু হইয়া যায়—এই বিশ্বাসই তাহাদের জীবনে পরম আশ্বাস। শ্রীহরি তাড়াতাড়ি বলিল—না—না—না। ওটা আমারই ভুল। ও আপনি ঠিক বলেছেন।

যাহা হউক, দেবুর ঘর তল্লাস করার পর দারোগা বলিল—পণ্ডিত আপনাকে আমরা অ্যারেস্ট করছি। আপনি প্রজা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট, এ কাজটা প্রজা-সমিতির দ্বারা হ'য়েছে বলেই সন্দেহ হচ্ছে আমাদের। অবশ্য এনকোয়েরী আমাদের এখনও শেষ হয় নি; উপস্থিত আপনাকে অ্যারেস্ট করলাম। চার্জ্জটা অবিশ্যি থেফ্‌ট্‌!

দেবু বলিল—থেফ্‌ট্‌ চার্জ্জ—চুরি? আমার বিরুদ্ধে?

হাসিয়া দারোগা বলিল—গাছকাটা তো আছেই, সেটার সমন করবেন এস-ডি-ও। ঘোষের দুটো লোহার তারের জাফরি চুরি গেছে।

আমাকে চুরির চার্জ্জে চালান দেবেন দারোগা বাবু?....দেবু মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের সহিত প্রশ্ন করিল।

—অর্জ্জুনের মত বীরকে সময়-দোষে নপুংসক সাজতে হয়েছিল, জানেন তো পণ্ডিত! ও নিয়ে দুঃখু করবেন না। বেলা তো অনেক হয়ে গেল, খাওয়া-দাওয়া সেরেই নিন।

দারোগার কথায় দেবু আশ্চর্য্য রকমের সান্ত্বনা পাইল। সে হাসিয়া বলিল—আপনি একটু জল-টল খাবেন ?

—চাকরি পেটের দায়ে পণ্ডিত। খাব নিশ্চয়। তবে আপনার ঘরেও না, ঘোষের ঘরেও না। আমাদের যতীনবাবু আছেন। ওই-খানেই যা হয় হবে।

দারোগা আসিয়া যতীনের ওখানে বসিল।

গ্রামের লোকেরা অবনত-মস্তকে চারিপাশে বসিয়া ছিল। সকলেই সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল—কে এ কাজ করিল ?

মেয়েরা গিয়া জড় হইয়াছে—দেবুর বাড়ী। অনেকে উঠানের উপর ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে, কেহ কেহ দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়াছে। বিলু যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। (দুর্গার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে অনর্গল ধারায়।) রাঙাদিদির আর বিলাপের শেষ নাই। পদ্ম বসিয়া আছে বিলুর পাশে। বিলুর দুঃখে সেও অপরিসীম দুঃখ অনুভব করিতেছে। মনে হইতেছে—আহা, এ দুঃখের ভার যদি সে নিজে লইয়া বিলুর দুঃখ মুছিয়া দিতে পারিত ! অবগুণ্ঠনের মধ্যে তাহার চোখ হইতেও টপ্-টপ্ করিয়া জল মাটির উপর ঝরিয়া পড়িতেছে।

অকস্মাৎ ছুটিয়া আসিল উচ্চিংড়ে। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে সুকৌশলে মাথা গলাইয়া একেবারে পদ্মের কাছে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—শিগ্‌গিরই বাড়ী এস মা-মণি।

যতীনের দেখাদেখি সে-ও পদ্মকে মা-মণি বলে।

পদ্ম বিরক্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিল—কেন ?....সে অবশ্য বুঝিয়াছে, যতীনের তলব পড়িয়াছে, চা করিতে হইবে।

—কম্মকারকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে গো দারোগা-বাবু।

(পদ্মের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর্‌থর্ করিয়া

কাঁপিতে আরম্ভ করিল? অনিরুদ্ধকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে?... সকলেই সচকিত হইয়া উঠিল।)

মাথায় তেল মাখিতে মাখিতে দেবু প্রশ্ন করিল—তার আবার কি হ'ল?

—কম্মকার যে সাউগিরি ক'রে বললে, আমাকে ধর হে।... দারোগা অমনি ধরলে।....উচ্চিংড়ে যেমন করিয়া ভিড়ের ভিতর দিয়া সুকৌশলে মাথা গলাইয়া প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি সুকৌশলেই বাহির হইয়া গেল।

কোনরূপে আত্ম-সম্বরণ করিয়া পদ্ম ভিড়ের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

—কামার-বউ!

পদ্ম পিছন ফিরিয়া দেখিল, ডাকিতেছে দুর্গা।

দাঁড়াও, আমিও যাব!

উচ্চিংড়ে কথাটা গুছাইয়া বলিতে পারে নাই, কিন্তু মিথ্যা বলে নাই। স্তব্ধ জনতার মধ্য হইতে নিতান্ত অকস্মাৎ অনিরুদ্ধ চোখ-মুখ দৃপ্ত করিয়া দারোগার সম্মুখে বুক ফুলাইয়া আসিয়া বলিয়াছিল—আমি—আমি কেটেছি গাছ। পণ্ডিত কিছু জানে না দারোগাবাবু। ধরবে তো আমাকে ধর। ওকে ছেড়ে দাও।

দারোগা হইতে সমবেত জনতা আকস্মিক বিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

—কাল রেতে টাঙি দিয়ে আমি গাছ কেটেছি; কাফরি দুটো তুলে ফেলে দিয়েছি 'চরখাই' পুকুরের জলে।

মিথ্যা কথা নয়। ধারালো টাঙি দিয়া কাল অনিরুদ্ধ তাহাদের গাছকাটার প্রতিশোধ তুলিয়াছে ছিরুপালের উপর। উন্মত্ত প্রতি-শোধের আনন্দে গাছ কাটিতে সে সেই অন্ধকার রাত্রে নাচিতে

নাচিতে ছুটিয়াছে, আর ছোট ছেলেদের মত মুখে বলিদানের বাজনার বোল আওড়াইয়াছে,—খা-জ্জিং-জ্জিং-জিনাক্-জি-জিং; না-জিং-জিং-জিনাক্জিনা। কেহ জানে না, পদ্ম পর্য্যন্ত না। ওই ছেলে দুটাকে লইয়া পদ্ম আজকাল পৃথক শুইয়া থাকে; রাত্রে নিঃশব্দে অনিরুদ্ধ উঠিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়াছেও নিঃশব্দে! সকালবেলা হইতে সে ছিরুর আস্ফালন শুনিয়া মনে মনে কৌতুক বোধ করিয়াছে, পুলিশ আসিলেও সে একবিন্দু ভয় পায় নাই। ভোরবেলাতেই টাঙিখানাকে সে অগুনে পোড়াইয়া সকল অপরাধের চিহ্নকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। কাপড়খানাতে অবশ্য কলার কষ লাগিয়াছে—সেখানাকে অনিরুদ্ধ খিড়কির ঘাটে জলের তলায় পুঁতিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু দেবু পণ্ডিতকে দারোগা যখন গ্রেপ্তার করিল—তখন সে চমকিয়া উঠিল। তাহার মনে একটা প্রবল ধাক্কা আসিয়া লাগিল। এ কি হইল? পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করিল? দেবুকে? এই মাত্র কিছুদিন সে জেল হইতে ফিরিয়াছে। বিনাদোষে আবার তাহাকে ধরিল? এ গ্রামের সকলের চেয়ে ভালমানুষ, দশের উপকারী, তাহার পাঠশালার বন্ধু—বিপদের মিত্র—দেবুকে ধরিল? জগনকে ধরিল না, হরেনকে ধরিল না, তাহাকে ধরিল? জনতার মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া মাটির দিকে চাহিয়া সে ক্ষুব্ধ বিষণ্নমনে ভাবিতেছিল। তাহার অপরাধের দণ্ড ভোগ করিতে দেবু-ভাই জেলে যাইবে? সমস্ত লোকগুলিই নীরবে হায়-হায় করিতেছে! আক্ষেপে সে অধীর হইয়া উঠিল। ভাবিতে ভাবিতে সে আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিল না, আবেগের প্রাবল্যে দৃপ্ত ভঙ্গিতে আসিয়া সে দারোগার নিকট এক মুহূর্ত্তে নিজের দোষ কবুল করিয়া ফেলিল।

দেবু আসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।—কিছু ভেবো না অনি ভাই। আমি প্রাণ দিয়ে তোমাকে ছাড়াতে চেষ্টা করব।

অনিরুদ্ধ উত্তর দিতে পারিল না—সজল চোখে গভীর আনন্দে বোকার মত আকর্ণবিস্তার হাসিয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গ্রামের প্রত্যেকেই অনিরুদ্ধকে সাধুবাদ দিল।—মানুষের মত কাজ করলে অনিরুদ্ধ। এ একশো বার।

বাড়ীর ভিতরে পদ্ম নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, চোখ দিয়া তাহার শুধু জল ঝরিতেছিল। দুর্গা দাঁড়াইয়াছিল—অল্প দূরে। উচ্চিংড়ে ও গোবরা কাছেই ছিল; অনিরুদ্ধ ভিতরে আসিতেই তাহারা সরিয়া গেল। অনিরুদ্ধ সজল চোখে বোকার মত হাসিয়া সকলের দিকে চাহিয়া বলিল—চল্লাম তা হ'লে।

পদ্মের তখনও ভাত হয় নাই, যতীনেরও অল্প দেরি আছে। দেবু বলিল—আমার জন্যে ভাতে-ভাতে হয়েছে অনি-ভাই, তাই দুটো খেয়ে নেবে, চল।

দেবুর ঘরেই খাইয়া অনিরুদ্ধ থানায় চলিয়া গেল।

যাইবার সময় দারোগা দুর্গাকে একটা তলব দিয়া গেল।—থানাতে যাবি একবার। তোর নামেও একটা রিপোর্ট হয়েছে।

আজ যতীন নিজে রান্না করিল। উদ্যোগ করিয়া দিল—উচ্চিংড়ে এবং গোবরা। দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত বলিয়া দিল দুর্গা।

পদ্ম কিছুক্ষণ ঘরে বসিয়াছিল, তাহার পর গিয়া বসিল খিড়কীর ঘাটে। সেখানে বসিয়া তীক্ষ্নস্বরে নামহীন কোন ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া তীব্র নিষ্ঠুরতম অভিসম্পাত দিতে আরম্ভ করিল।

—শরীরে ঘুন ধরবে, আকাট রোগ হবে। শরীর যদি পাথর হয় তো ফেটে যাবে, লোহা হয় তো গলে যাবে। অলক্ষ্মী ঘরে ঢুকবে—লক্ষ্মী বনবাস যাবে। ঘরে আগুন লাগবে, ধানের মরাই ছাইয়ের গাদা হবে।

মনের ভিতর রূঢ়তর অভিসম্পাতের আরও চোখা-চোখা বাণী ঘুরিতেছিল—বউ বেটা মরবে, পিণ্ডি লোপ হবে, জোড়া বেটা এক বিছানায় শুয়ে ধড়ফড় ক'রে যাবে।···কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের কোণে উঁকি মারিতেছিল—বিশীর্ণ গৌরবর্ণা এক সিমন্তিনী নারীর অতি কাতর করুণা-ভিক্ষু মুখ। অল্পে অল্পে সে চুপ করিয়া গেল।

দুর্গা আসিয়া ডাকিল—কামার-বউ, এস ভাই, নজরবন্দী বাবু রান্না নিয়ে ব'সে আছেন।

পদ্ম উত্তর দিল না।

—খালভরি, উঠে আয় কেনে? পিণ্ডি খাবি না? তোর লেগে আমরাও খাব না—না কি?

এবার আসিয়া এমন সুমধুর সম্ভাষণে ডাকিল উচ্চিংড়ে।

পদ্ম উত্তর দিল—তোরা খা না গিয়ে হতভাগারা, আমি খাব না, যা।

—খেতে দিছে না যি নজরবন্দীবাবু। তু না খেলে আমাদিগে দেবে না। নিজেও খায় নাই। কম্মকার তো মরে নাই—তবে তার লেগে এত কাঁদছিস্ ক্যানে?

(—তবে রে মুখপোড়া।....পদ্ম ক্রোধভরে তাহাকে তাড়া করিয়া আসিয়া একেবারে বাড়ী ঢুকিয়া পড়িল।)

* * * *

ঊনত্রিশে চৈত্র অনিরুদ্ধের মামলার দিন পড়িয়াছে। বিচার করিবার বিশেষ কিছু নাই; সে নিজেই স্বীকারোক্তি করিয়াছে—পুলিশের কাছে করিয়াছিল, হাকিমের কাছেও করিয়াছে। সাজা তাহার হইবেই। দেবু কয়েকদিনই সদর শহরে গিয়াছিল, সকল উকীল-মোক্তারেই এক কথাই বলিয়াছে। সাজা দুই মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত হইতে পারে। হাকিমের ইচ্ছাধীন।

ইহার মধ্যে ইন্সপেকটার আসিয়া একবার তদন্ত করিয়া গিয়াছে।

প্রজা-সমিতির সহিত কোন সংস্রব আছে কিনা—ইহাই ছিল তদন্তের বিষয়। তাহার ধারণা স্পষ্টই গ্রামের লোকের কাছে বলিয়া গিয়াছে—প্রজা-সমিতি বলে নাই এ কাজ করতে, এটা ঠিক। কিন্তু প্রজা-সমিতি যদি না থাকত গ্রামে, তবে এ কাণ্ড হ'ত না। এতে আমি নিঃসন্দেহ।

দুর্গাকে ডাকা হইয়াছিল—তাহার বিরুদ্ধে নাকি রিপোর্ট হইয়াছে। কে রিপোর্ট করিয়াছে না বলিলেও দুর্গা বুঝিয়াছে। ইন্সপেকটার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—শুনছি তোর যত দাগী বদমায়েস লোকের সঙ্গে আলাপ, তাদের সঙ্গে তুই—।....ব্যাপার কি বল্ তো?

দুর্গা হাত জোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে হুজুর, আমি নষ্ট দুষ্ট—এ কথা সত্যি। তবে মশায়, আমাদের গাঁয়ের ঘোষ মাশায়—শ্রীহরি ঘোষ, থানার জমাদার বাবু, ইউনান বোডের পেসিডেন্ বাবু—ইয়েরা সব যে দাগী বদমাস নোক—এ কি ক'রে জানব বলুন!

ইন্সপেকটার ধমক দিল। দুর্গা কিন্তু অকুতোভয়। বলিল—আপনি ডাকুন সবাইকে—আমি মুখে মুখে বলছি। এই সেদিন রেতে জমাদার এসে ঘোষ মাশায়ের বৈঠকখানায় ব'সে ডেকেছিলেন—আমি গেছিলাম; সেদিন ঘোষ মাশায়ের খিড়কীর পুকুরে আমাকে সাপে কামড়েছিল—পেরমাই ছিল তাই বেঁচেছি। রামকিষণ সেপাইজি ছিল, ভূপাল থানদার ছিল। শুধান্ সকলকে।

ইন্সপেকটার আর কথা না বাড়াইয়া একটা কঠিন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল—আচ্ছা, আচ্ছা, যাও তুমি, সাবধানে থাকবে।

পরম ভক্তি সহকারে একটি প্রণাম করিয়া দুর্গা চলিয়া আসিয়াছে।

বিপদ হইয়াছে পদ্মকে লইয়া। তাহার মেজাজের অন্ত পাওয়া ভার। এখনই সে একরকম, কিছুক্ষণ পরেই সে আর এক রকমের

মানুষ। উচ্চিংড়ে ও গোবরা প্রায় হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহারা বাড়ীতে বড় একটা থাকে না। বিশ তারিখ হইতে গাজনের ঢাক বাজিয়াছে, জল হইতে বুড়াশিব উঠিয়াছেন; তাহারা দুইজনে নন্দী ভৃঙ্গীর মত অহরহই চণ্ডীমণ্ডপে পড়িয়া আছে। গাজনের ভক্তের দল বাণ-গোঁসাই লইয়া গ্রামে ভিক্ষা সাধিতে যায়—ছোঁড়া দুইটাও সঙ্গে সঙ্গে যায়।

গ্রামে গাজনে এবার সমারোহ প্রচুর। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে দেউল ও নাটমন্দির তৈয়ারীর সঙ্কল্প মুলতুবি রাখিলেও গাজনে সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। দেবু ঘোষ, জগন ডাক্তার আর দুগ্ধপোষ্য একটা আগন্তুক বালক ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে অপমান করিবার জন্যই—গাজন ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা শ্রীহরি বুঝে। তাই সে এবার গাজনে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। ছোট ধরণের একটি মেলারও আয়োজন করিয়াছে। ভাল 'বোলান' গান আসিবে দুই দল, একদল ঝুমুর, কবি গানের পাল্লা,—অনেক রকম ব্যবস্থা করিয়াছে যাহারা বলিয়াছে চণ্ডীমণ্ডপ ছাঁটিব না, তাহারা যেন চব্বিশ ঘণ্টা আনন্দ-আয়োজনের দ্বারপ্রান্তে পথের কুকুরের মত দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারই জন্য এত আয়োজন! ভাত ছড়াইলে কাক ও কুকুর আপনি আসিয়া জুটে। সে যেদিন ধান দাদন করে, সেদিন গ্রামের লোক তাহার বাড়ীর আশে-পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছে। ইহারই মধ্যে ভবেশ খুড়ো বহু জনের দরবার লইয়া আসিয়াছে। কথাবার্ত্তা চলিতেছে, তাহারা ঘাট মানিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত; প্রজা-সমিতিও তাহারা ছাড়িয়া দিবে।....গড়গড়া টানিতে টানিতে শ্রীহরি আপন মনেই হাসিল!...তবে ওই হরিজনের দলকে সে ক্ষমা করিবে না। কুকুর হইয়া উহারা ঠাকুরের মাথার উপর উঠিতে চায়?

কাল আবার অনিরুদ্ধের মামলার দিন। সদরে যাইতে হইবে। হরি চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনিরুদ্ধ জেলে গেলে, পদ্ম একা থাকিবে। অন্নের অভাব হইবে—বস্ত্রের অভাব হইবে। দীর্ঘ-তনু, আয়ত-নয়না, উদ্ধতা, মুখরা—কামারণী। এবার সে কি করে দেখিতে হইবে! তারপর অনিরুদ্ধের চার বিঘা বাকুড়ি। কামারের গোটা জোতটাই নীলামে উঠিয়াছে। হয়তো নীলাম এতদিন হইয়া গেল। যাক্ কাল গাজনের দিন, মহাবিষুব সংক্রান্তি, কাল সে উপস্থিত থাকিবে না। হরিশ-দাদা ও ভবেশ খুড়াকেই ভার দিয়া যাইবে।

কালু সেখ আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—হুজুরের মা ডাকিতেছে।

—মা? ও, আজ যে আবার নীলষষ্ঠী!....শ্রীহরি উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেল।

চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন নীলষষ্ঠী। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও মেয়েদের যাহাদের নীলের মানং আছে, তাহারা ষষ্ঠীর উপবাস করিবে, পূজা করিবে, সন্তানের কপালে ফোঁটা দিবে। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ এই দিনে নাকি লীলাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। লীলাবতীর কোল আলো করিয়া নীলমণির শোভা। নীলষষ্ঠী করিলে, নীলমণির মত সন্তান হয়।

পদ্ম সকল ষষ্ঠীই পালন করে। সে-ও উপবাস করিয়া আছে। কিন্তু বিপদ হইয়াছে উচ্চিংড়ে ও গোবরাকে লইয়া। আজ সকালবেলা হইতেই তাহাদের দেখা নাই। আজ চড়ক-পাটা বাহির হইয়াছে; ঢাক বাজাইয়া ভক্তরা গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে। একটা লোহার কাঁটার কণ্টকিত তক্তার উপর একজন ভক্ত শুইয়া থাকিবে। সে কি সোজা কথা? সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের পিছনে পিছনে তাহারা ফিরিতেছে। আগে এখানে বাণ ফোঁড়া হইত, এখন আর হয় না।....পদ্ম অপেক্ষা

করিয়া অবশেষে নিজেই চণ্ডীমণ্ডপের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ডীমণ্ডপে ঢাক বাজিতেছে। বোধ হয় এ বেলার মত চড়ক ফিরিয় আসিল।

চণ্ডীমণ্ডপ ঘিরিয়া মেলা বসিয়াছে। খান্‌বিশেক দোকান। তেলে-ভাজা ও মিষ্টির দোকানই বেশী। বেগুনি, ফুলুরী, পাঁপর-ভাজ হইতেছে; ছেলেরা দলে দলে আসিয়া কিনিয়া খাইতেছে। খান্‌চারেক মণিহারী দোকান। সেখানে তরুণী মেয়েদেরই ভীড় বেশী—ফিতা, টিপ, আলতা, গন্ধ কিনিতেছে। গাছতলায় ছোট আসর পাতিয় বসিয়াছে তিনজন চুড়িওয়ালী! একটা গাছতলায় বৈরাগীদের নেলোও বসিয়াছে কতকগুলা মাটির পুতুল লইয়া। ও-মা! বুড়া পুতুলগুলা তে বেশ গড়িয়াছে! হুঁকা হাতে তামাক খাইতেছে—আবার ঘাড় নাড়িতেছে। বয়স্কেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অলস পদক্ষেপে। আজ-কাল দুইদিন কোন চাষের কাজ নাই। হাল চষিতে নাই, গরু জুতিতে নাই। এই দুই দিন সর্ব্বকর্ম্মের বিশ্রাম।

উচ্চিংড়ে ও গোবরার সন্ধান মিলিল না। তাহা হইলে চড়ক এখনও ফেরে নাই। ও ঢাক শ্রীহরি ঘোষের মায়ের ষষ্ঠী-পূজার ঢাক। পদ্ম বোধ হয় জানে না—ঘোষ এবার দশখানা ঢাকের বন্দোবস্ত করিয়াছে।

পাতু নিজের গ্রাম ছাড়িয়া অন্য গ্রামে বাজাইতে গিয়াছে। সর্ব্বত্রই এক অবস্থা। বাদ্যকরের চাকরান্ জমি প্রায় সর্ব্বত্রই উচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামের ঢাকী ও গ্রামে যায়, সে গ্রামের ঢাকী আসিয়াছে এ গ্রামে। সতীশ বাউড়িও তাহার বোলানের দল লইয়া অন্য গ্রামে গিয়াছে।

(পদ্ম বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া মাটিতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। পরের সন্তান লইয়া এ কি বিড়ম্বনা তাহার!) কিছুক্ষণ পর আবার সে বাহির হইল। এবার শুষ্ক মুখ, ধূলিধূসর-দেহ ছেলে দুইটাকে দেখিতে

পাইয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া যতীনের সম্মুখে আনিয়া বলিল—এই দেখ, একবার ছেলে দুটোর দশা দেখ। তুমি শাসন কর।

যতীন কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল।

পদ্ম বলিল—হেসো না তুমি। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায় তোমার হাসি দেখলে। ভেতরে এস একবার, ফোঁটা দেব!

ফোঁটা দিয়া পদ্ম বলিল—হাসি নয়, উচ্চিংড়েকে তুমি বল, এমন ক'রে বাইরে বাইরে ফিরলে তুমি ওকে রাখবেই না এখানে, জবাব দেবে। খেতে দেবে না। গোবরাটা ভাল—ওকে নিয়ে যায় উচ্চিংড়েই। কাল ওরা যেন বেরোয় না ঘর থেকে।

যতীন এবার মুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য টানিয়া আনিয়া বলিল—তথাস্তু মা-মণি।....তারপর সে উচ্চিংড়েকে কড়া রকমের ও গোবরাকে মৃদু রকমের শাসন করিয়া দিল।

* * *

উচ্চিংড়ে হোমসংক্রান্তি অর্থাৎ গাজনের দিন ঘরে থাকিবে? সেই ভোর রাত্রেই ঢাক বাজিবার সঙ্গেই সে গোবরাকে লইয়া বাহির হইল, আর সে বাড়ীমুখো হইল না,—পাছে পদ্ম তাহাকে আটক করে।

আজ বুড়ো-শিবের পূজা। পূজা হইবে, বলিদান হইবে, হোম হইবে। আজ ভক্ত শুইয়া থাকিবে সমস্ত দিন। লোহার কাঁটাওয়ালা তক্তাখানা এমন ভাবে বসানো আছে যে বন্-বন্ করিয়া ঘোরে।

উচ্চিংড়ে গোবরাকে বলিল—আজ ভাই আমরা শিবের উপোস করব।

—উপোস?....গোবরার ক্ষুধাটা কিছু বেশী।

হ্যাঁ। বাবা বুড়ো-শিবের উপোস। সবাই করে, না করলে পাপ হয়। উপোস করলে মেলা টাকা হয়।

সবাই গাজনের উপবাস করে, এ কথাটা গোবরা অস্বীকার করিতে

পারিল না। গাজনের উপবাস প্রায় সার্ব্বজনীন। বাউড়ি-বায়েন হইতে উচ্চতম-বর্ণ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত আজ সকলেরই প্রায় উপবাস। অনিরুদ্ধের মামলার তদ্বিরে দেবু উপবাস করিয়াই সদরে গিয়াছে। শ্রীহরিরও উপবাস। কিন্তু উপবাস করিলেই টাকা হয়—এ কথাটা গোবরা স্বীকার করিতে পারিল না।

গোবরার অন্তরের একান্ত অনিচ্ছা উচ্চিংড়ে বুঝিল; বলিল—বেশী ক্ষিদে লাগে তো, চুই চৌধুরীদের বাগানে গিয়ে—আম পেড়ে খাব। বেশ বড় বড় হয়েছে—বুঝলি? আম পাড়লে চৌধুরীরা কিছু ব'লবে না, আর ওতে পাপও হবে না।

এবার গোবরার আর তেমন আপত্তি রহিল না।

—শেষকালে না-হয় কারু বাড়ীতে মেগে খাব দুটো।

—উঁহু মা-মণি তা হ'লে মারবে। বলবে—ভিখিরি কোথাকার, বেরো হতভাগারা!

—তবে চল্ আমরা মহাগেরাম যাই। সেখানে এখেনকার চেয়ে বেশী ধুম। আর সেখানে মেগে খেলে, মা-মণি কি ক'রে জানবে? তাই চল্।

গোবরা এ প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

গ্রামের প্রান্তে একটা জলশূন্য পুকুরের পাড়ে খোঁড়া পুরোহিতের তেঠেঙে ঘোড়াটা ঘাস খাইতেছিল। উচ্চিংড়ে দাঁড়াইল। বলিল—এই, ঘোড়াটা ধর্ দিকি।

—চাট ছুঁড়বে।

—তোর মাথা। পেছনকার একটা ঠ্যাং খোঁড়া। চাট ছুঁড়তে গেলে নিজেই ধপাস্ ক'রে পড়ে যাবে। ধর্। ওইটার ওপর চেপে দু'জনা চলে যাব। কাপড়টা খোল্ তোর, নাগাম্ করব।

সত্যই ঘোড়াটা চাট ছুঁড়িতে পারে না; কিন্তু কামড়ায়, খেঁকী

কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া মাথা উঁচাইয়া কামড়াইতে আসে। অগত্যা উচ্চিংড়েকে অশ্বারোহণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।

সন্ধ্যায় তখন গাজনের পূজা শেষ হইয়াছে। চড়ক শেষ হইয়াছে। ভক্তদের আগুন লইয়া ফুল-খেলাও হইয়া গিয়াছে। বলি-হোমও হইয়া গিয়াছে। কপালে তিলক পরিয়া ভবেশ ও হরিশ চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আছে। শ্রীহরি এখনও সদর হইতে ফেরে নাই। ঢাকীর দল প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকের বাজনার কেরামতি দেখাইতেছে। বড় বড় ঢাক, ঢাকের মাথায় দেড় হাত লম্বা পালকের ফুল। এ ঢাকের আওয়াজ প্রচণ্ড; ভদ্রলোকেরা বলে, ঢাকের বাদ্য থামিলেই মিষ্ট লাগে। কিন্তু ঢাকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ নিপুণ বাদ্যকরের হাতে রাগিণীর উপযুক্ত বোলে যখন বাজে, তখন আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া যায়—গুরুগম্ভীর ধ্বনির আঘাতে মানুষের বুকের ভিতরেও গুরুগম্ভীর ঝঙ্কার উঠে। নাচিয়া নাচিয়া নানা ভঙ্গি করিয়া মুখে বোল আওড়াইয়া—এক একজন ঢাকী পর্য্যায়ক্রমে ঢাক বাজাইতেছে, তাহাদের নাচনের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতেছে—কাকের পাখার কালো পালক ফুল; একেবারে মাথায় আছে বকের সাদা পালকের গুচ্ছ।

হরিশ আক্ষেপ করিতেছিল—এবার চৌধুরী আসতে পারলেন না। ঠাঁইটি একেবারে খাঁ-খাঁ করছে।

চৌধুরী প্রতি বৎসর উপস্থিত থাকে। ঢাকের বাজনার সে একজন সমঝদার শ্রোতা। বসিয়া বসিয়া তালে তালে ঘাড় নাড়ে। পাশে থাকে একটি পোঁটলা। বাজনার শেষে চৌধুরী পোঁটলা খুলিয়া পুরস্কার দেয়—কাহাকেও পুরানো জামা, কাহাকেও পুরানো চাদর, কাহাকেও বা পুরানো কাপড়। এবার চৌধুরী শয্যাশায়ী হইয়া আছে। সেই মাথায় আঘাত পাইয়া বিছানায় শুইয়াছে, আর উঠে নাই। ঘা শুকাইতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প জ্বরও হইতেছে।

চণ্ডীমণ্ডপের চারিপাশে মেলার পথে ভিড় এখন প্রচুর। মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী, পুরুষ দলে দলে ঘুরিতেছে। সন্ধ্যার পর কবিগান হইবে। কলরবের অন্ত নাই। অকস্মাৎ সেই কলরব ছাপাইয়া কালুসেখের গলা শোনা গেল—হঠ্ হঠ্ হঠ্ সব!

ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া কালুসেখ বাহির হইয়া আসিল—তাহার পিছনে শ্রীহরি। ঘোষ ফিরিয়াছে। ভবেশ ও হরিশ অগ্রসর হইয়া গেল।

(শ্রীহরি ফোক্‌লা-দাঁতে একগাল হাসিয়া বলিল—সুখবর! 'দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ড।')

পথের ভিড় ঠেলিয়া দেবু ঘোষও যাইতেছিল। বিমর্ষমুখে সে গেল যতীনের ওখানে।

যতীন, দেবু, জগন ও হরেন—আজ সান্ধ্য মজলিসে কেবল চারজন। সকলেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। আজিকার সমস্যা—পদ্মকে এ সংবাদটা কে দিবে, কেমন করিয়া দিবে?

ভিতরের দরজায় শিকল নড়িয়া উঠিল। পদ্ম ডাকিতেছে। যতীন উঠিয়া গেল। (অনিরুদ্ধের দণ্ডের কথা শুনিয়া সে খুব বিষণ্ণ হয় নাই।) দুই মাস জেল—লঘুদণ্ডই হইয়াছে। যে মন লইয়া অনিরুদ্ধ দেবুকে মিথ্যা দণ্ড হইতে বাঁচাইতে গিয়া সত্য স্বীকারোক্তি করিয়াছে, সে মন যদি তাহার টিঁকে—তবে সে নূতন মানুষ হইয়া ফিরিবে। আর যদি সে মন বুদ্বুদের মত ক্ষণস্থায়ীই হয়—তবুও বা দুঃখ কিসের? দারিদ্র্য-ব্যাধিতে জীর্ণ মনুষ্যত্বের মৃত্যু তো ধ্রুবই ছিল। কিন্তু বিপদ হইয়াছে পদ্মকে লইয়া। (কি মায়ায় যে এই অশিক্ষিতা আবেগসর্ব্বস্বা পল্লী-বধূটি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে—সে বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষণ করিয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না। বৃহত্তর

জীবন, মহত্তর স্বার্থের মানদণ্ডে ওজন করিয়াও সে কিছুতেই তাহার মূল্যকে অকিঞ্চিৎকর করিয়া তুলিতে পারে না। মাটির মূর্ত্তির মধ্যে সে দেবীরূপ কল্পনা করে না—করিতে পারে না; জলে বিসর্জ্জন দিলে সে মূর্ত্তি গলিয়া কাদা হইয়া যায়, জলতলে সে রূপ পঙ্ক-সমাধিলাভ করে, এ সত্য মনে করিয়া সে হাসে। কিন্তু ঐ ভঙ্গুর মাটির মূর্ত্তি অক্ষয় দেবীরূপ লাভ করিল কেমন করিয়া? কালের নদী-জলে তাহাকে বিসর্জ্জন দিলেও যে সে গলিবে না বলিয়া মনে হইতেছে! শিক্ষা নাই, সংস্কৃতি নাই,—অভিমান ও কুসংস্কার-সর্ব্বস্ব পদ্ম মাটির মূর্ত্তি ছাড়া আর কি?

কাঁদিয়া কাঁদিয়া পদ্মের চোখ দুইটা ফুলিয়া উঠিয়াছে! সে বলিল—দু' মাস জেল হয়েছে?

যতীন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহার মধ্যে কথাটা তাহাকে কে বলিল? মাথা নীচু করিয়া সে বলিল—হ্যাঁ;

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পদ্ম বলিল—তা হোক। ভালোয় ভালোয় ফিরে আসুক সে। কিন্তু পণ্ডিতকে যে তার পাপে দণ্ডভোগ করতে হয় নাই, সে যে সত্যি কথা বলেছে—সে আমার ভাগ্যি। তা' না হ'লে, তার অনন্ত নরক হ'ত, সাত পুরুষ নরকস্থ হ'ত।

যতীন অবাক হইয়া গেল।

পদ্ম বলিল—জল গরম হয়েছে। চা তুমি করে নাও। আমি একবার দেখি—সেই মুখপোড়া ছেলে দুটোকে। এখনো ফেরে নাই। সারাদিন খায় নাই।

—তুমিও তো খাও নি মা-মণি? খেয়ে নাও।... যতীনের মনে পড়িল—কাল পদ্মের নীলষষ্ঠীর উপবাস গিয়াছে, আজ আবার সে সারাদিন গাজনের উপবাস করিয়াছে।

—খাব। সে দুটোকে আগে ধরে আনি!

যতীন আর কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পদ্ম বাহির হইয়া গেল।

শ্রীহরির খিড়কীর ঘাটে শ্রীহরির মা উচ্চকণ্ঠে সবিস্তারে অনিরুদ্ধের শাস্তির কথা দম্ভ-সহকারে ঘোষণা করিতেছে। বহুক্ষণ পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়াছে; এখনও শেষ হয় নাই। পুত্রগর্ব্বিণী বৃদ্ধা শুধু অপেক্ষা করিতেছে—অদূরে উচ্চকণ্ঠের একটি সবিলাপ রোদন-ধ্বনির।

কথাবার্ত্তা কহিবার অবসর আজ খুব কমই হইতেছিল।

চা খাওয়া শেষ করিয়া, যতীন বলিল—চৌধুরী কেমন আছেন ডাক্তার?

দেবু চমকাইয়া উঠিল, অনিরুদ্ধের হাঙ্গামায় আজ দুইদিন চৌধুরীর সংবাদ লওয়াই হয় নাই।

জগন বলিল—একটু ভাল আছেন। তবে ওই একটুকু ঘা আর কিছুতেই সারছে না। ঘায়ের মুখ থেকে অল্প অল্প পূয পড়ছে, আর প্রায়ই সামান্য সামান্য জ্বর হচ্ছে।

যতীন বলিল—যাব একদিন দেখতে।

দেবু বলিল—কালই চলুন না সকালে। আমি যাব।

—আমাকেও ডেকো দেবু। তোমাদেরই সঙ্গে যাব। আমাকে তো যেতেই হবে। একসঙ্গেই যাব। হরেন, যাবে নাকি?

—টু-মরো তো হবে না ব্রাদার! পয়লা বোশেখ, খাতা ফেরার হাঙ্গামা আছে। আমাকে ছুটতে হবে আলেপুর, ইছু সেখের কাছে—গোটা-চারেক টাকা আনতে হবে। নইলে—বেটা বৃন্দাবনকে তো জান? একটি পয়সা আর ধার দেবে না।

পয়লা বৈশাখ—হালখাতা।....কথাটা দেবুরও মনে হইল। ধার তাহার বড় নাই। তাহার অনুপস্থিতিতে দুর্গার মারফৎ জংসনের একটা দোকানে বাকী পড়িয়াছে—এগারো টাকা দশ আনা। অনিরুদ্ধের হাঙ্গামায় কথাটা তাহার মনেই হয় নাই। টাকাই বা কোথা হইতে

আসিবে? আসিয়া অবধি নিজের ভাবনা যে ভাবাই হয় নাই। কিন্তু না ভাবিলে ভবিষ্যৎ কি হইবে? সে যদি হঠাৎ মারা যায়, তবে কি বিলু এই পদ্মের মত—কিংবা অবশেষে তারিণীর স্ত্রীর মত—; ভাবিতেই সে শিহরিয়া উঠিল।....তাহার খোকা কি ওই উচ্চিংড়ের মত—; না—না—না। সে মনে মনেই বলিল—কিছুতেই না।.... কাল নববর্ষের প্রথম দিন হইতে সে নিজের ভাবনা ভাবিবে। আর নয়—আর নয়। স্ত্রী-পুত্র লইয়া—দারিদ্র্য লইয়া দশের ভাবনা ভাবিবার অধিকার তাহার নাই, সে অধিকার ভগবান তাহাকে দেন নাই। সে ভার—সে অধিকার শ্রীহরির। গোটা গাজনের খরচটা সে-ই দিয়াছে।

সে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে উঠিয়া পড়িল।

জগন জিজ্ঞাসা করিল—কি ব্যাপারে হে?

—একটা জরুরি কাজ ভুলেছি।

সে চলিয়া আসিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া শিবকে প্রণাম করিল—হে দেবাদিদেব মহাদেব, ভালয়-ভালয় এ বৎসর পার করিয়া দিলে। আশীর্ব্বাদ কর—আগামী বৎসরটি যেন ভালয়-ভালয় যায়।

খোঁড়া পুরোহিত তাহাকে আশীর্ব্বাদী নির্মাল্য দিল।

* * *

পথে নামিয়া সে বাড়ী গেল না। সে গেল দুর্গার বাড়ী। দুর্গাই দোকান হইতে ধার আনিয়া দিয়াছিল। তাহারই মারফতে একটা টাকা কাল সে পাঠাইয়া দিবে এবং মাসখানেকের সময় চাহিয়া লইবে। সময় একটু বেশী লওয়াই ভাল। বৈশাখের প্রথমেই সে তিসি, মসিনা, গম, যব যে কয়টা ঘরে আছে—বিক্রী করিয়া দিবে। আলু খাওয়ার মত অল্পস্বল্প রাখিয়া বেচিয়া দিবে। সর্ব্বাগ্রে সে ঋণ পরিশোধ করিবে।

বাড়ীতে দুর্গার মা বসিয়াছিল ; একা অন্ধকারে দাওয়ার উপর বসিয়া কাহাকে গালি দিতেছিল—রাক্ষস, প্যাটে আগুন নাগুক—আগুন নাগুক! মরুক, মরুক। আর হারামজাদী, নচ্ছারী, বাপের আগে কুটো,—সব্বাগ্যে তোর যাওয়ার কি দরকার শুনি?

দেবু জিজ্ঞাসা করিল—ও পিসেস্ দুর্গা কই?

বিলু—দুর্গার মাকে বাপের বাড়ীর গ্রামবাসিনী হিসাবে পিসী বলে, তাই দেবু বলে—পিসেস্ অর্থাৎ পিস্-শাশুড়ী।

মাথায় একটু ঘোমটা টানিয়া দিল দুর্গার মা। জামাইয়ের সামনে মাথায় কাপড় না থাকিলে এবং জামাই মাথার চুল দেখিলে, চিতায় নাকি মাথার চুল পোড়ে না। ঘোমটা দিয়া দুর্গার মা বলিল—সে নচ্ছারীর কথা আর ব'ল না বাবা। বাপের আগে কুটো। 'রূপেন' বায়েনের কি-না-কি ব্যামো হয়েছে, তাই সব্বাগ্যে গিয়েছেন তিনি।

'রূপেন' অর্থাৎ উপেন। আত্মীয়স্বজনহীন বৃদ্ধ উপেন? আহা-হা বেচারী! কেহ নাই সংসারে। কিন্তু সে তো এখানে থাকে না। সে তো কঙ্কণায় ভিক্ষা করিত।

দেবু প্রশ্ন করিল—উপেন আজকাল গাঁয়ে ফিরেছে নাকি?

—মরতে ফিরেছে বাবা। গাঁয়ে আগুণ নাগাতে ফিরেছে। কাল থাকতে গাঁয়ে গাজনের মেলা দেখতে এসেছে। আজ সকালে ফুলুরীর দোকানদার কতকগুলো তে-বাসী ফুলুরী ফেলে দিয়েছিল—সেনেটারী বাবু আসবে শুনে। রূপেন তাই কুড়িয়ে গবাগব খেয়েছে। খেয়ে সনঝে থেকে 'নামুনে' হয়েছে। আমাদের দুগ্‌গা বিবি তাই শুনে দেখ্‌তে ছুটেছেন। আহা—হা, দয়া কত। কি বলব বাবা বল?

'নামুনে'—অর্থাৎ কলেরা!…সর্ব্বনাশ! সম্মুখে এই বৈশাখ মাস—কোথাও এক ফোঁটা পানীয় জল নাই। এই সময় কলেরা!

সে দ্রুতপদে আসিয়া উঠিল উপেনের বাড়ী।

উঠানে মাটির উপর পড়িয়া জরা-জীর্ণ বৃদ্ধ ছটফট করিতেছিল,—জ্‌ল—জ্‌ল—জ্‌ল।....স্বর অনুনাসিক হইয়া উঠিয়াছে। অন্য কেহ নাই, কেবল দুর্গা দাঁড়াইয়া আছে, সে যথাসাধ্য সংস্পর্শ বাঁচাইয়া একটা ভাঁড়ে করিয়া তাহাকে জল ঢালিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ কিন্তু আপনার জল খাইবার ভাঁড়ের নিকট হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কম্পিত বাহু বিস্তার করিয়া বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তীব্র ব্যগ্রতায় সে চীৎকার করিতেছে, জ্‌ল—একটু জ্‌ল।

দেবু অগ্রসর হইল, ভাঁড়টি লইয়া উপেনের মুখের কাছে বসিয়া একটু একটু করিয়া জল ঢালিয়া দিতে আরম্ভ করিল। দুর্গাকে বলিল—দুর্গা, শীগ্‌গির গিয়ে একবার জগনকে খবর দে। বলবি আমি রয়েছি।

যতীনের কথাও একবার মনে হইল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—বিদেশী ভদ্রলোক। তাঁহাকে এ সব বিপজ্জনক ব্যাপারে টানিয়া আনা উচিত হইবে না। এ তাহাদের গ্রাম, এখানকার সকল দুঃখকষ্ট একান্ত করিয়া তাহাদের। অতিথি-আগন্তুককে দিতে হয় সুখের ভাগ। দুঃখের ভাগ কি বলিয়া কোন মুখে সে তাহাকে লইতে আহ্বান করিবে!

ছাব্বিশ

শুভ নববর্ষ। বৃদ্ধেরা শিহরিয়া উঠিল! নিতান্ত অশুভ প্রারম্ভ। রুদ্ররূপে মৃত্যু প্রবেশ করিয়াছে—সঙ্গিনী মহামারীকে লইয়া! চণ্ডী-মণ্ডপে বর্ষ-গণনা পাঠ ও পঞ্জিকা-বিচার চলিতেছে।

গত রাত্রির শেষভাগ হইতে বায়েন-পাড়ায় তিনজন আক্রান্ত হইয়াছে; বাউড়ি-পাড়ায় দুইজন। উপেন মরিয়াছে। শ্রীহরি গম্ভীর-ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিল। এ যে প্রকাণ্ড দায়িত্ব সম্মুখে। গ্রামকে রক্ষা করিতে হইবে। হতভাগ্যের দল তাহার সহিত বিরোধিতা

করিয়াছে বলিয়া সে এ সময় বিমুখ হইলে, সে যে ধর্ম্মে পতিত হইবে। অবশ্য কাজ সে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে! ভূপাল চৌকীদারকে ইউনিয়ন বোর্ডে পাঠাইয়াছে; স্যানিটারী ইন্সপেক্টারের কাছে সংবাদ দিতে ইউ-বির সেক্রেটারীরকে পত্র দিয়াছে। লোকটি কাল সকালেই আসিয়াছিল। বাউড়ি-পাড়ায়, বায়েন-পাড়ায় কিছু চাল সাহায্য দিবার কথাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপের ইঁদারাটিকে কলেরার সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছে। কালু সেখ পাহারায় মোতায়েন আছে।

বুড়ী রাঙাদিদি আজ সকালে ভগবানকে গাল দেয় নাই; সে জোড়হাতে তারস্বরে বার বার বলিতেছে—ভগবান, রক্ষে কর, হে ভগবান! দোহাই তোমার! তুমি ছাড়া গরীবের আর কে আছে দয়াময়! গেরাম রক্ষা কর বাবা বুড়ো শিব। হে বাবা! হে ভোলানাথ! হে মা কালী!

পদ্ম আকুল হইয়া উঠিয়াছে—উচ্চিংড়ে ও গোবরার জন্য 'আসাপা' ছেলে—সাপ দেখিলে ধরিবার মত দুঃসাহস উহাদের;—কি করিয়া উহাদের সে বাঁচাইবে? তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছে।—

যতীনও চিন্তান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশে কত লোক কলেরায় মরে, কত লোক ম্যালেরিয়ায় মরে, কত লোক অনাহারে মরে, কত লোক অর্দ্ধাশনে থাকে—এ তথ্য সে জানে। নিয়তিকে সে স্বীকার করে না; সে জানে এ মনুষ্যকৃত ত্রুটি, আপনাদের অজ্ঞানতার অক্ষমতার অপরাধের প্রতিফল এ! অপরাধ একমাত্র এই দেশটিতেই আবদ্ধ নয়—মানুষের ভ্রম হইতে, ভেদবুদ্ধি হইতে, অক্ষমতা হইতে অদ্ভুত এ অপরাধ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। ব্যাধি এক দেশ হইতে অন্য দেশে সংক্রামিত হয় নাই, সেই দেশ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে—অর্থগৃধ্নুর ধন উপার্জ্জন-শক্তির প্রতিক্রিয়ায় চৌর্য্যের মত, দানধর্ম্মের

মত, দানধর্ম্মের প্রতিক্রিয়ায় ভিক্ষা-ব্যবসায়ের মত। পুলিশ-য়্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন্-রিপোর্টে সে পড়িয়াছে—ভিক্ষুকের দল এক-একটা শিশুকে হাঁড়ির ভিতর দিবারাত্র বসাইয়া রাখে—বৎসরের পর বৎসর—যাহাতে তাহাদের অর্দ্ধাঙ্গ বাড়িতে না পারে। ইহাদের বিকলাঙ্গের দোহাই দিয়া দিব্য ভিক্ষা-ব্যবসায় চলে। হয়তো এদেশে ত্রুটি বেশী, এ দেশে লোক বেশী মরে, কুকুর বিড়ালের মত মরে। তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও চলিতেছে। হয়তো একদিন—তাহার চোখ জল্‌জল্ করিয়া জলিয়া উঠিল—আরতির যুগল কর্পূর প্রদীপের শিখার মত, মুহূর্ত্তের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কালের দ্বারে বলি ভাবিয়া দৃঢ়চিত্তে আজ কিন্তু এ সমস্ত সে দেখিতে পারিতেছে না। পদ্মের মত সমস্ত গ্রামখানাই কবে কখন্ তাহার সমস্ত অন্তরকে মমতায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—সে বুঝিতে পারে নাই। গ্রামের এই বিপর্য্যয়ে—বিয়োগে—শোকে সে নিতান্ত আপন জনের মতই চঞ্চল ব্যথিত হইয়া উঠিল।

বৈশাখের প্রথম দিন! সেই মধ্য-চৈত্রে কিছু বৃষ্টি হইয়াছে—তারপর আর হয় নাই। হু হু করিয়া গরম ধূলিকণাপূর্ণ বাতাস বহিতেছে ঝড়ের মত। সেই বাতাসে শরীরের রক্ত যেন শুকাইয়া যাইতেছে। মাটি তাতিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে যেন একটা তৃষাতুর হা-হা-ধ্বনি উঠিয়াছে। কোথাও মানুষ দেখা যায় না। এক দিনেই—একবেলাতেই মানুষ ভয়ে ঘরে ঢুকিয়াছে, একটা মানুষও আর পথের উপরে নাই। দেবু ও জগন কিন্তু সকালেই বাহির হইয়াছে; এখনও ফেরে নাই। যতীনও বাহির হইয়াছিল, অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ফিরিয়াছে। পদ্ম অঝোর-ঝরে কাঁদিয়া বলিল—আমাকে আর খুন করো না তুমি—তোমার পায়ে পড়ি। দোহাই, একটু সাবধানে থাক তুমি!

যতীন ভাবিয়া পায় না—এই অবোধ মা-মণিকে সে কি বলিবে!

দেবু গিয়াছে উপেনের সৎকারে। সকাল হইতেই দেবু যেন একাই একশ হইয়া উঠিয়াছে। এই অর্দ্ধ-শিক্ষিত পল্লীযুবকটির কর্ম্মক্ষমতা ও পরার্থপরতা দেখিয়া যতীন বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। (আরও একটা নূতন জিনিস সে দেখিয়াছে; জগন ডাক্তারের অভিনব রূপ। চিকিৎসকের কর্ত্তব্যে তাহার এতটুকু ত্রুটি হয় নাই—শৈথিল্য নাই! নির্ভীক জগন —পরম যত্নের সহিত প্রতিটি জনকে আপনার বিদ্যাবুদ্ধি মত অকাতরে চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছে। গ্রামে সে কখনও ফি লয় না; কিন্তু এমন ক্ষেত্রে, কলেরার মত ভয়াবহ মহামারীর সময় ডাক্তারদের উপার্জ্জনের বিশেষ একটা সুযোগ পাইয়াও জগন আপনার প্রথা-রীতি ভাঙে নাই, —এটা জগনের মহত্ত্বের পরিচয়। মুখে আজ তাহার কর্কশ কথা পর্য্যন্ত নাই, মিষ্ট ভাষায় সে সকলকে অভয় দিয়া চলিয়াছে।)

দেবু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছে। (টেলিগ্রাম লইয়া জংসনে গিয়াছে দুর্গা।) ইউনিয়ন বোর্ডে দেবুও সংবাদ পাঠাইয়াছে; পাতু সেখানে গিয়াছে। নিজে সে রোগাক্রান্তদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছে। যাহারা গ্রাম হইতে সরিয়া যাইতে চাহিয়াছে—তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছে। তারপর উপেন বায়েনের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে বসিয়াছে। বায়েনদের মধ্যে এখানে সক্ষম পুরুষ মাত্র তিনজন তাহাদের একজন পলাইয়াছে। বাকী দুইজন রাজী থাকিলেও— দুইজনে একটা শব লইয়া যাওয়া অসম্ভব কথা। পথও কম নয়, এখান হইতে ময়ূরাক্ষী-গর্ভের শ্মশান—দূরত্ব দেড় মাইলের উপর। অনেক চিন্তা করিয়া শেষে বেলা এগারোটার সময় আপনার গাড়ী গরু আনিয়া, দেবু গাড়ীতে করিয়া উপেনের সৎকারের ব্যবস্থা করিল।

সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াই তাহার কর্ত্তব্য শেষ হইল না; বাউড়ি বায়েনদের দায়িত্বজ্ঞান কম—হয়তো গ্রামের কাছেই কোথাও ফেলিয়া দিবে আশঙ্কা করিয়া, সে শবের সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তু

হইল। তা ছাড়া পাতুও তাহার সঙ্গী—মাত্র দুইজনে এই কলেরা-রোগীর মৃতদেহ লইয়া শ্মশানে যাইতে একটু ভয় পাইতেছিল। দেবু তাহা অনুভব করিল। বলিল—ভয় করছে পাতু?

শুষ্কমুখে পাতু বলিল—আজ্ঞে?

—ভয় করছে নিয়ে যেতে?

—করছে একটুক্।....ভয়ার্ত্ত শিশুর মতই অকপটে সে স্বীকার করিল।

—তবে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাই।

—আপুনি?

—হ্যাঁ। আমি।

পাতু ও তাহার সঙ্গীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাতু বলিল—আপুনি বাঁধের ওপরটিতে শুধু দাঁড়াবেন।

—চল, আমরা শ্মশান পর্য্যন্তই যাব।

প্রচণ্ড উত্তাপে উত্তপ্ত বৈশাখী দ্বিপ্রহরে তাহারা গাড়ীর উপর শবদেহ চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মাঠ আজ জনশূন্য। রাখালেরা সকলেই প্রায় এই বাউড়ি-বায়েনদের ছেলে—তাহারা এমন আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে যে, মাঠে গরু লইয়া আসে নাই। গ্রামের আঁশেপাশেই গরু লইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে। বৈশাখী দ্বিপ্রহরে এই ধূ-ধূ করা প্রান্তরে আসিয়া যদি অকস্মাৎ তাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি হইবে? মাঠে আগুনের মত ধূলায় পড়িয়া তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিবে যে! এই অতঙ্কে তাহারা আতঙ্কিত। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—খাঁ খাঁ করিতেছে। মধ্যে যে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, তাহার আর এক বিন্দুও কোথাও জমিয়া নাই। মাটির রস পর্য্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। প্রাচীন কালের বড় বড় সিচের পুকুরগুলি এমন-ভাবে মজিয়া গিয়াছে, মোহনার বাঁধ এমনভাবে ভাঙিয়া গিয়াছে যে,

বিন্দু বিন্দু করিয়া যে জল ভিতরে জমে, তাহাও নিঃশেষে বাহির হইয়া আসে। গ্রামের প্রান্ত হইতে ময়ূরাক্ষী পর্য্যন্ত কোথাও এক ফোঁটা জল নাই। ঝড়ের মত প্রবল বৈশাখী দ্বিপ্রহরের বাতাসে মাঠের ধূলা উড়িতেছে; তাহাতে যেন আগুনের স্পর্শ! গাড়ীটা ধীরগতিতে চলিয়াছিল। ক্যাঁ—ক্যাঁ—ক্যোঁ,—চাকার দীর্ঘ একটানা একঘেয়ে শব্দ উঠিতেছে।

পাতু বলিল—এবার আর আমাদের রক্ষে নাই; কেউ বাঁচবে না পণ্ডিত-মশায়।

দেবু স্নেহসিক্ত স্বরে অভয় দিয়া বলিল—তুই পাগল পাতু! ভয় কি?

—ভয়?....পাতু হাসিল, বলিল—একবারে পয়লা বোশেখ নামুনে ঢুকল গাঁয়ে! তা ছাড়া লোকে বলছে—এবার আমরা চণ্ডীমণ্ডপ ছাইয়ে দিলাম না—বাবা বুড়োশিবের রাগেই হয়তো—

দেবুও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সে দেবধর্ম্মে বিশ্বাসী। কিন্তু বাবা কি এমনই অবিচার করিবেন? নিরপরাধের অপরাধটাই বড় হইবে তাঁহার কাছে? দেবোত্তর সম্পত্তি যাহারা আত্মস্বাৎ করিয়া লইয়াছে, তাহাদের তো কিছু হয় নাই। সে দৃঢ়স্বরে বলিল—না পাতু। বাবার কাছে কোন অপরাধ হয় নাই তোমাদের। আমি বলছি।

পাতু বলিল—তবে ই-রকমটা ক্যানে হ'ল পণ্ডিত-মশায়?

দেবু কলেরার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিল।...

উঃ! এই ঠিক দুপুরে স্ত্রীলোক কে এদিকে আসিতেছে? বোধ হয় জংসন হইতে ফিরিতেছে। হাঁ—তাই তো! এ যে দুর্গা। দুর্গা টেলিগ্রাফ পাঠাইয়া ফিরিতেছে।

(উপেনের শবের সঙ্গে দেবুকে দেখিয়া দুর্গা থমকিয়া দাঁড়াইল—নিকটে আসিয়া তিরস্কার করিয়া বলিল—জামাই। তুমি যাচ্ছ ক্যানে?

—এতক্ষণে ফিরলি দুর্গা? টেলিগ্রাম হ'ল?

—হ'ল। কিন্তু তুমি কিসের লেগে যাচ্ছ জামাই? ফিরে চল।

—ফিরছি, তুই যেতে লাগ্।

—না। তুমি ফের আগে।

—পাগলামি করিস না দুর্গা। তুই যা, আমি শিগ্গির ফিরব।

তাহারা চলিয়া গেল; দুর্গার চোখ দিয়া অকারণে জল পড়িতে আরম্ভ করিল।

শীঘ্র ফিরিব বলিলেও—শীঘ্র ফেরা হইল না। ফিরিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল! ময়ূরাক্ষীর বালি ঘোলা হাঁটুডোবা জলে কোনমতে স্নান সারিয়া, বাড়ী আসিয়া দেবু ডাকিল—বিলু।

ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল খোকা তাহার খোকন-মণি। দুটি হাত বাড়াইয়া সে ডাকিল—বা-বা।

দেবু দুই পা পিছনে সরিয়া আসিয়া বলিল—না, না, ছুঁয়ো না আমাকে। না।

খোকন আমোদ পাইয়া গেল। মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িয়া গেল লুকোচুরি খেলার আমোদ, সে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া হাত বাড়াইয়া আরও ছুটিয়া আসিল। খোকনের আমোদের ছোঁয়াচ দেবুকেও লাগিল—সে আরও খানিকটা সরিয়া আসিয়া বলিল—না খোকন্,—দাঁড়াও ওখানে।...তারপর সে ডাকিল বিলুকে।—বিলু—বিলু!

বিলু বাহির হইয়া আসিল—অভিমানস্ফুরিতাধরা। সে কোন কথা বলিল না। চুপ করিয়া স্বামীর আদেশের প্রতীক্ষায় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। দেবু কি তাহার সর্ব্বনাশ করিতে চায়? এই প্রখর গ্রীষ্ম, তাহার উপর—এই ভয়ঙ্করী মহামারী, দেবু সেই মহামারী লইয়া মাতিয়া উঠিল—তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য? সে সমস্ত দুপুর কাঁদিয়াছে। দুর্গা আসিয়াছিল; সে বিলুকে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে—

একটুখানি শক্ত হও বিলুদিদি, জামাই-এর একটু রাশ টেনে ধর। নইলে এই রোগের পিছুতে ও আহারনিদ্রে ভুলবে, হয়তো তোমাদের সর্ব্বনাশ—নিজের সর্ব্বনাশ ক'রে ফেলবে।

দেবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার অভিমান অনুভব করিল। হাসিয়া বলিল—আমার বিলুমণির রাগ হয়েছে? শিগ্‌গিরর একটু খোকাকে ধর বিলু।

বিলুর চোখের জল আর বাঁধ মানিল না। ঝর্ ঝর্ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। দেবু বলিল—কেঁদো না, ছি! কথা শোন, শিগ্‌গির ধর খোকাকে। আর আমাকে একটু খড় জেলে আগুন ক'রে দাও, তারপর তাড়াতাড়ি এক কড়া জল গরম চাপাও। গরম জলে হাত-পা ধুয়ে ফেলব; কাপড়-জামাও গরম জলে ফুটিয়ে নিতে হবে।

বিলু কোন কথা বলিল না, ছেলেটাকে টানিয়া কোলে তুলিয়া লইল। ছেলেটি দেবুকে সকাল হইতে দেখিতে পায় নাই, সে চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল—বাবা দাব। বাবা দাব।

বিলু তাহার পিঠে একটা চাপড় বসাইয়া দিয়া বলিল—চুপ কর্ বলছি, চু-উ-প।....তবুও তাহার জিদ্ দেখিয়া তাহাকে দুম্ করিয়া নামাইয়া দিল।

দেবু আর সহ্য করিতে পারিল না। বিলুকে তিরস্কার করিয়া বলিল—আঃ! বিলু! ও কি হচ্ছে? শিগ্‌গির ওকে কোলে নাও বলছি!

বিলু আজ ক্ষেপিয়া গিয়াছে, সে বলিল—কেন, তুমি মারবে নাকি? ছেলের আদর কত ক'র্‌ছ—তা জানি!

দেবু স্তম্ভিত হইয়া গেল।

বিলু হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; বলিল—এমন দগ্ধে দগ্ধে মারার চেয়ে আমাকে তুমি খুন করে ফেল! আমাকে তুমি বিষ এনে দাও।

দেবু উত্তর দিতে গেল—সান্ত্বনা-মধুর উত্তরই সে দিতেছিল; কিন্তু

দেওয়া হইল না। সর্পস্পৃষ্টের মত সে চমকিয়া উঠিল, শিহরিয়া উঠিল—পিছন হইতে খোকা তাহাকে দুই হাত দিয়া ধরিয়া ফেলিয়া—খিল্‌-খিল্‌ করিয়া হাসিতেছে। ধরিয়াছে, সে ধরিয়াছে—পলাতককে সে ধরিয়াছে। দেবু পিছন ফিরিয়া খোকার দুই হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া, আর্ত্তস্বরে বিলুকে বলিল—শিগ্‌গির জল গরম কর বিলু, শিগগির। খোকার হাত ধুয়ে দিতে হবে। এখুনি হয়তো ওই হাত মুখে দেবে।

খোকা দুরন্ত অভিমানে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। তারপর ধারণা হইল—তাহার বাবা তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। শুধু সে কাঁদিলই না—ঝুঁকিয়া পড়িয়া রোষে ক্ষোভে দেবুর হাতের এক জায়গায় কামড়াইয়া প্রায় ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল। শেষে তাহার ভিজা কাপড়ের খানিকটাও দাঁতে দিয়া ছিঁড়িয়া দিল।

দেবু ইহাতে রীতিমত আতঙ্কিত হইয়া উঠিল। বিলুকে একপ্রকার হাত ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিল—বিলু, লক্ষ্মীটি, সব বুঝিয়ে বল্‌ছি তোমায়। চট্‌ ক'রে এখন তুমি গরম জল চাপাও। খোকার মুখখানা তাড়াতাড়ি ধুইয়ে দাও।....

৩

বিলুর রাগ কিন্তু একটু পরেই নিভিয়া গিয়াছে। দেবুর কোলে খোকনকে দেখিয়া সে মহাখুসী হইয়া উঠিয়াছে। বলিল—তুমি কি নিষ্ঠুর বল দেখি? ছেলেটা আমার চেয়েও তোমাকে ভালবাসে—আর তুমি কিনা ওকে ফেলে বাইরে বাইরে থাক! তোমার বোধ হয় বাড়ীর বাইরে পা দিলে সংসার ব'লে কিছুই মনে থাকে না। ছিঃ, খোকাকেও ভুলে যাও তুমি!

দেবু বলিল—না। আর যাব না বিলু, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আর যাব না।

—গরম-জলে মুখ-হাত-পা ধোওয়াইয়া দেবু খোকাকে কোলে লইয়াছিল। বাপের কোলে থাকিয়াই সে মাকে কাছে আসিতে দেখিয়া বাপের বুকে মুখ লুকাইল। বিলু দেখিয়া হাসিয়া বলিল—ওই দেখ দেখি!

খোকন বলিয়া উঠিল—না, দাব না। মা দাব না।

বিলু খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—ওরে দুষ্ট ছেলে! মা দাবে না তুমি? বাপ পেয়ে আমায় ভুল্‌লে বুঝি? আচ্ছা, আমিও তোমাকে মেন্থ দেব না।

খোকন এবার মায়ের মন রাখিতে দেবুকে বলিল—বাবা, মা দাই!

বিলু বলিল—উঁহু। বাবাকে ধ'রে রাখ। বাবা পালাবে।

দেবুর বুকখানা রুদ্ধ আবেগে তোলপাড় করিয়া উঠিল।

সেটা বিলুর চোখে পড়িল। সে শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ গা, তোমার শরীরটা ভাল আছে তো?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া দেবু বলিল—শরীরটা খুব ক্লান্ত হয়েছে।

—একটু চা করব, খাবে?

—কর।...

চা খাইয়াও সে তেমনি নীরব বিষণ্ণতার মধ্যে উদ্বেগ-উদ্বেলিত অন্তরে একটা ভীষণ কিছুর অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় বাউড়ি-বায়েন-পাড়ায় একটা কান্নার রোল উঠিল। কেহ নিশ্চয় মরিয়াছে। দেবু খোকাকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে অধীর হইয়া উঠিল।

বিলু বলিল—কেউ ম'ল বোধ হয়।

তিক্তস্বরে দেবু বলিল—মরুকগে, আমি আর খোঁজ নিচ্ছি না।

অবাক হইয়া বিলু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর বলিল—আমি কি তোমাকে বলেছি যে, কেউ মলে তুমি খোঁজ করবে

না, না—তাদের বিপদে তুমি দেখবে না। উপেন বায়েন—মুচী, তার সংকারের জন্য গাড়ী দিলে, আমি কিছু বলেছি? কিন্তু তুমি শ্মশান পর্য্যন্ত সঙ্গে গেলে কেন বল দেখি? খাওয়া নাই—দাওয়া নাই—এই বোশেখ মাসের রোদ। তাই বলেছি আমি!

খোকা দেবুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বিলু খোকাকে দেবুর কোল হইতে লইয়া বলিল—যাও, একবার দেখে এখুনি ফিরে এস। তোমার ওপর কত ভরসা করে ওরা—তা' তো জানি।

দেবু যন্ত্রচালিত পুতুলের মতই বিলুর কথায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। চণ্ডীমণ্ডপে খোল-করতাল লইয়া হরিনাম-সংকীর্ত্তনের দল বাহির করিবার উদ্যোগ হইতেছে। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে নাকি অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

ও-পাড়ায় ধর্ম্মদেবের পূজার আয়োজন চলিতেছে। সে সতীশকে ডাকিল। সতীশ আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—অবস্থা যে ভয়ানক হয়ে উঠল পণ্ডিত-মশায়! বিকেলে আবার দু'জনার হ'য়েছে। গণার পরিবার একটুক আগে মারা গেলেন।

—তাড়াতাড়ি সংকারের ব্যবস্থা কর।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সে সব করছি। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপরাধীর মত সে বলিল—উ বেলায় রূপেনের মড়া নিয়ে আপনাকে—কি করব বলেন? আমাদের জাত তো লয়। আমাদের লেগে আপনাকে এত ভাবতে হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবু বলিল—ডাক্তার বিকেলে এসেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিকেলে আবার ঘোষ মশায় নোক পাঠিয়েছিলেন—চাল দেবেন বলে। তা ডাক্তারবাবু বললেন—কিছুতেই লিবি না।...আমরা যাই নাই মশায়।

দেবু অন্যমনস্কভাবে চুপ করিয়া রহিল। তাহার মনের মধ্যে

ধীরে ধীরে একটা গভীর উদাসীনতা যেন নিবিড় কুয়াসার মত জাগিয়া উঠিতেছে—তাহার সুখ-দুঃখ সব যেন সংবেদন-শূন্যতায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। যে গভীর উদ্বেগ সে সহ্য করিতে পারিতেছে না—সেই উদ্বেগ নীলকণ্ঠের হলাহলের মত তাহাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সতীশ আবার ডাকিল—পণ্ডিত-মশায়।

—আমাকে কিছু বলছ ?

সতীশ অবাক হইয়া গেল, বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।....পণ্ডিত-মশায় আর কে আছে এখানে, ও-নামে আর কাহাকে ডাকিবে সে ?

—কি বল ?

—বলছি। রাগ করবেন না তো ?

—না, না, রাগ করব কেন ?

—বলছিলাম কি, ঘোষ মশায় চাল দিতে চাইছেন, তা' লিতে দোষ কি ? অভাবী নোক সব—এই মহা বেপদের সময়—

দেবু প্রসন্ন সহানুভূতির সঙ্গেই বলিল—না—না, কোন দোষ নাই সতীশ! ঘোষ মশায় তো শত্রু নন্ তোমাদের। তিনি যখন নিজে যেচে দিতে চাচ্ছেন—তখন নেবে বৈকি।

সতীশ দেবুর পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আপনকার মত যদি সবাই হ'ত পণ্ডিত-মশায়! আপনি একটুকুন্ ব'লে দেবেন ডাক্তোরবাবুকে। উনি আবার রাগ করবেন।

—আচ্ছা, আচ্ছা! আমি ব'লে দোব ডাক্তারকে।

—ডাক্তারবাবু ব'সে আছেন নজরবন্দীবাবুর কাছে।....

দেবু ফিরিল। কিন্তু আজ আর যতীনের ওখানে যাইতে ইচ্ছা হইল না। সে বাড়ীর পথ ধরিল। বাড়ীতে দুর্গা আসিয়া বসিয়া

আছে। দুর্গা বলিল—আমাদের পাড়া গেছলে জামাই-পণ্ডিত? গণার বউটা মারা গেল, নয়?

—হ্যাঁ···সে বিলুকে বলিল—খোকন্ কই?

—সে সেই ঘুমিয়েছে, এখনো ওঠেনি।

—ঘুমিয়েছে!···দেবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। প্রায় ঘণ্টা চারেক কাটিয়া গেল, খোকা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম সুস্থতার একটা লক্ষণ। তারপর সে দুর্গাকে প্রশ্ন করিল—তুই এতক্ষণ ছিলি কোথায়?

—জংসন গেছলাম।

বিলু বলিল—একটু জল খাও। দুর্গা খাতা ফিরিয়ে মিষ্টি এনেছে।

(—তাই তো! হ্যাঁরে দুর্গা, জংসনে দোকানদারদের কাছে ভারী কথার খেলাপ হয়ে গেল রে!)

—সে সব ঠিক্ হয়েছে গো, তোমায় অত ভাব্‌তে হবে না।···দুর্গা হাসিল—বিলু-দিদির মত লক্ষ্মী তোমার ঘরে—তোমার ভাবনা কি? বিলু-দিদি আমাকে দু' টাকা দিয়েছিল, আমি দিয়ে এসেছি। আবার সেই আষাঢ়ে কিছু দিয়ো রথের দিনে, আর কিছু আশ্বিনে,—দোকানী তাইতে রাজী হয়েছে।

পরম আরামের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া এতক্ষণে সত্যকার হাসি হাসিয়া দেবু বলিল—বিলু, আমি যতীন বাবুর কাছ থেকে একটু ঘুরে আসি। বুঝলে?

—এই রাত্তিরে আবার বেরুচ্ছ? তা' একটুকুন্ জল খেয়ে যাও।

—আমি যাব আর আসব। জল এখন আর খাব না।

—আচ্ছা উপোস করতে পার তুমি।....বিলু হাসিল। দেবু বাহির হইয়া গেল।

যতীনের আসরে আজ কেবল যতীন, জগন, আর চা প্রত্যাশী

গাঁজাখোর গদাই। চিত্রকর নলিনও আসিয়া একটি কোণে অভ্যাসমত চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে আজ একটি টাকা চাহিতে আসিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া কয়েকদিনের জন্য সে অন্যত্র যাইবে।

জগন অনর্গল বকিতেছে। দেবুকে দেখিয়া ডাক্তার বলিল—কি ব্যাপার হে? এ বেলা যে পাত্তাই নাই। আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি ভয় পেয়েছ।

দেবু হাসিল।

যতীন বলিল—শরীর কেমন দেবুবাবু? শুনলাম, শ্মশানে গিয়েছিলেন, ফিরেছেন চারটের পর।

—শরীর খুব ক্লান্ত। নইলে ভালই আছে।

—তুমি মুচীর মড়ার সঙ্গে গিয়েছ, চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে দেখে এস একবার ব্যাপারটা।

দেবু ও-কথা আমলেই আনিল না। বলিল—আচ্ছা ডাক্তার, কলেরার বিষ যদি শরীরে ঢোকে, তবে কতক্ষণ পরে রোগ প্রকাশ পায়?

জগন—হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছ দেবু ভাই!

গদাই ওপাশ হইতে সসঙ্কোচে বলিল—কিসের ভয়? ওর ওষুদ হ'ল এক ছিলিম্ গাঁজা!

দেবু আর কোন প্রশ্ন করিল না, প্রশ্ন করিতেও তাহার ভয় হইতেছে। বিজ্ঞানের সত্য যদি তাহার উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দেয়? সে বার বার মনে করিল—বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য নয়, এ সংসারে আরও একটা পরম তত্ত্ব আছে—সে পুণ্য, সে ধর্ম্ম। তাহার ধর্ম্ম—তাহার পুণ্য তাহাকে রক্ষা করিবে। সেই অমৃতের আবরণ খোকাকে মহামারীর বিষ হইতে অবশ্যই রক্ষা করিবে।

যতীন বলিল—কি ব্যাপার বলুন তো দেবুবাবু হঠাৎ এ প্রশ্ন করলেন কেন আপনি ?

দেবু বলিল—আজ যখন বাড়ী ফিরলাম—শ্মশানে উপেনের শব আমাকে ধরতে হয়েছিল ; তারপর অবশ্যি ময়ূরাক্ষীতে স্নান করেছি। তারপর বাড়ী ফিরে....।—কে ? দুর্গা নাকি ?

অন্ধকার পথের উপর আলো হাতে আসিয়া দুর্গাই দাঁড়াইল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দুর্গা বলিল—হ্যাঁ, বাড়ী এস শিগ গির। খোকার অসুখ করেছে,—একবার জলের মতন—

দেবু বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠিয়া, একলাফে পথে নামিয়া ডাকিল—ডাক্তার !

বৈজ্ঞানিক সত্য ধর্ম্মবিশ্বাসের কণ্ঠরোধ করিয়া শেষে কি তাহার গৃহেই রুদ্র মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিল ?

* * * *

সর্ব্বনাশী মহামারী মানবদেহের সকল রস দ্রুত শোষণ করিয়া জীবনীশক্তিকে নিঃশেষিত করিয়া দেয়। সেই মহামারী দেবুকে পাথর করিয়া দিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। একা খোকা নয়, খোকা ও বিলু—দুজনেই কলেরায় মারা গেল। প্রথম দিন খোকা, দ্বিতীয় দিন বিলু। শুশ্রূষা ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় নাই; জংসন-সহর হইতে রেলের ডাক্তার, কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তার—দুইজন বড় ডাক্তার আনা হইয়াছিল। কঙ্কণার হাসপাতালের ডাক্তারটি সংবাদ পাইয়া আপনা হইতেই আসিয়াছিল। লোকটি গুণগ্রাহী, দেবুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতই আসিয়াছিল। জগন নিজে জংসন গিয়া রেলের ডাক্তারকে আনিয়াছিল। অনাহারে-অনিদ্রায় দেবু অকাতরে তাহাদের সেবা করিয়াছে আর ঈশ্বরের নিকট মাথা খুঁড়িয়াছে—দেবতার নিকট মানৎ করিয়াছে; দুর্গাও কয়দিন প্রাণপণে

তাহার সাহায্য করিয়াছে। জগন ডাক্তারের তো কথাই নাই,— যতীন, সতীশ, গদাই, পাতু দুইবেলা আসিয়া তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। দেবু পাথরের মত অশ্রুহীন নেত্রে নীরব নির্ব্বাক হইয়া সব দেখিল—বুক পাতিয়া নিদারুণ আঘাত গ্রহণ করিল।

বিলুর সংকার যখন শেষ হইল, তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে। দেবু ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃস্ব, রিক্ত, তিক্ত জীবন লইয়া। সুখ-দুঃখের অনুভূতি মরিয়া গিয়াছে, হাসি ফুরাইয়াছে, অশ্রু শুকাইয়াছে, কথা হারাইয়াছে, মন অসাড়, দৃষ্টি শূন্য, ঠোঁট হইতে বুক পর্য্যন্ত নিরস শুষ্ক—সাহারার মত সব খাঁ-খাঁ করিতেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়া সে উদাস শূন্য দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সব আছে—পথ, ঘাট, বাড়ী-ঘর, গাছ-পালা; কিন্তু দেবুর দৃষ্টির সম্মুখে সব অর্থহীন—অস্তিত্বশূন্য—ঝাপ্‌সা; এক রিক্ত অসীম তৃষাতুর ধূসর প্রান্তর—আর বেদনাবিধুর পাণ্ডুর আকাশ। ওই বিবর্ণ ধূসরতার মধ্যে ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত—নিশ্চিহ্ন।

সমস্ত গ্রামের লোকই ভিড় করিয়া আসিয়াছিল—তাহাদের অকৃত্রিম সহানুভূতি জানাইতে। কিন্তু দেবুর এই মূর্ত্তির সম্মুখে তাহারা কেহ কিছু বলিতে পারিল না। যতীনও তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়া নির্ব্বাক হইয়া বসিয়াছিল। আত্মগ্লানিতে সে কষ্ট পাইতেছে,—দেবুকে সে-ই বোধ হয় এই পরিণামের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে। জগনও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীহরি, হরিশ, ভবেশও আসিয়াছিল। তাহারাও নীরব। দেবুর সম্মুখে কথা বলিতে শ্রীহরিরও যেন কেমন সঙ্কোচ হইল।

ভবেশ শুধু বলিল—হরি-হরি-হরি।

নির্ব্বাক্ জনমণ্ডলীর প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া কে ডাকিল—ডাক্তারবাবু।

বিরক্ত হইয়া জগন বলিল—কে? কি?

—আজ্ঞে, আমি গোপেশ। একবার আসেন দয়া ক'রে।

—কেন, হ'ল কি?

দেবু একদিকের ঠোঁট বাঁকাইয়া রূঢ়ভাবে হাসিয়া বলিল—আর কি? বুঝতে পাচ্ছ না? যাও না, দেখে এস।

জগন দ্বিরুক্তি করিল না—উঠিয়া গেল। যতীন বলিল—দাঁড়ান্, আমিও যাচ্ছি।

একে একে জনমণ্ডলী নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল; দেবু একা ঘরে বসিয়া রহিল। এইবার তাহার ইচ্ছা হইল একবার বুক ফাটাইয়া কাঁদে। কিন্তু কান্না তাহার আসিল না। তারপর সে শুইবার চেষ্টা করিল। চারিদিক চাহিয়া দেখিল—চারিদিকে শত সহস্র স্মৃতি! দেওয়ালে খোকার হাতের কালির দাগ, বিলুর হাতের সিঁদুরের চিহ্ন, পানের পিচ, খোকার রং-চটা কাঠের ঘোড়া, ভাঙা বাঁশী, ছেঁড়া ছবি। পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া—শয্যাতলে যেন কিসের চাপে সে একটু বেদনা বোধ করিল; হাত দিয়া সেটা বাহির করিল—খোকার বালা! সেই বালা দুইগাছি, বিলুর নাকচাবি, কানের ফুল, হাতের নোয়া। একটা পাঁজর-ফাটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে অকস্মাৎ ডাকিয়া উঠিল —খোকা! বিলু!

বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজার মুখে কে মুখ বাড়াইয়া বলিল—দেবু!

—কে?·· দেবু উঠিয়া আসিল—রাঙা-দিদি?

বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(একা রাঙা-দিদি নয়, দুর্গাও একপাশে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল।)

দেবুর ইচ্ছা ছিল, গভীর রাত্রে—সকলে ঘুমাইলে—বিশ্বপ্রকৃতি নিস্তব্ধ হইলে, সে একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবে। বাড়ীতে সে অবশ্য

একা নয় সন্ধ্যা হইতে বহুজনেই আসিয়াছিল, সকলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার নিকট শুইতে আসিয়াছে কেবল—জগন ডাক্তার, হরেন ঘোষাল ও গাঁজাখোর গদাই। শ্রীহরি, ভূপাল চৌকীদারকেও পাঠাইয়াছে। সে রাত্রিতে দেবুর দাওয়ায় শুইয়া থাকিবে। সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে দেবু উঠিল। (উঠানে আসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। খোকা নাই—বিলু নাই—বিশ্বসংসারে কোথাও নাই! স্বর্গ মিথ্যা, নরক মিথ্যা, পাপ মিথ্যা, পুণ্য মিথ্যা। কোন্ পাপ সে করিয়াছিল? পূর্ব্বজন্মের? কে জানে?…একবার যতীনের কাছে গেলে হয় না? একা বসিয়া সে খোকা ও বিলুকে চিন্তা করিবার অবসর খুঁজিয়াছিল, কিন্তু তাহাও যেন ভাল লাগিতেছে না। আত্মগ্লানিতেই তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সেই তো মৃত্যুর বিষ বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে-ই তো তাহাদের হত্যা করিয়াছে। কোন্ লজ্জায় সে কাঁদিবে?

এত রাত্রে আলো হাতে কে আসিতেছে? একজন নয়, জন কয়েক লোকই আসিতেছে।

(—পণ্ডিত!….দেবুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন ন্যায়তীর্থ; তাঁহার সঙ্গে যতীন, পিছনে লণ্ঠন হাতে আর একটি লোক।

—আপনি। কিন্তু আমাকে তো—

—চল, বাড়ীর ভেতর চল।

—আমাকে তো প্রণাম করতে নাই। আমার অশৌচ।

সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া ন্যায়রত্ন বলিলেন—অশৌচ?….

তিনি মৃদু হাসিলেন।…একটা কিছু আন পণ্ডিত, এইখানে এই উঠোনেই বসা যাক্। ঘরের ভেতর থেকে ঘুমন্ত লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে যেন। থাক্, যারা ঘুমোচ্ছে—ঘুমোক। তোমার সঙ্গে নিরালায় একটু আলাপ করবো ব'লে—এত রাত্রে আমার

আসা। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে আসতে ইচ্ছে হল না। পথে যতীন ভায়া সঙ্গ নিলেন। (ওদের দৃষ্টি জাগ্রত তপস্বীর মত—ফাঁকি দিতে পারলাম না। দেখলাম—আকাশের দিকে চেয়ে উনিও বসে আছেন তোমার মত। আমাকে বললেন—তোমার এই নিষ্ঠুর বিপর্য্যয়ের জন্য উনিই দায়ী। ওঁর চোখে জল ছল্-ছল্ ক'রে উঠল। তাই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমাদের সুখ-দুঃখের কথায় উনিও অংশীদার হবেন। ন্যায়রত্ন হাসিলেন। (এ-হাসি সুখের নয়—দুঃখেরও নয়—এক বিচিত্র দিব্য হাসি।)

দেবুও হাসিল। ন্যায়তীর্থের হাসির প্রতিবিম্বটিই যেন ফুটিয়া উঠিল। ঘর হইতে একটি মোড়া আনিয়া পাতিয়া দিয়া, সে বলিল—বসুন।

ন্যায়তীর্থ বসিয়া বলিলেন—ব'স, আমার কাছে ব'স। বস, যতীন ভায়া, বস।

তাহারা মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল। দেবু বলিল—এই সেদিন পরমশ্রদ্ধায় বিলু আপনার পা ধুইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আজ—আজ সে কোথায়?...

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—দেবু ভাই, আমি সেই দিনই বুঝে গিয়েছিলাম—এই পরিণামের দিকেই তুমি এগিয়ে চলেছ। তোমাকে দেখেও বুঝেছিলাম, তোমার স্ত্রীকে দেখেও বুঝেছিলাম।

দেবু ও যতীন—উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন—সেদিনের গল্পটা মনে আছে বাবা? সবটা সেদিন বলিনি। বলি শোন। গল্প এখন ভাল লাগবে তো?

দেবু সাগ্রহে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—বলুন।

ন্যায়তীর্থ আরম্ভ করিলেন—"সেই ব্রাহ্মণ ধর্ম্মবলে আবার আপন

সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। পুত্র-কন্যা-জামাতায়, পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে সংসার হয়ে উঠল—দেববৃক্ষের সঙ্গে তুলনীয়। ফলে—অমৃতস্বাদ গুণ, ফুলে—অগুরু-চন্দনকেও লজ্জা দেয় এমন গন্ধ; কোন ফল অকালে চ্যুত হয় না, ফুল অকালে শুষ্ক হয় না। তাঁর পরিপূর্ণ সংসার, আনন্দে শান্তিতে সুখে স্নিগ্ধ সমুজ্জল! ছেলেরাও প্রত্যেকে বড় বড় পণ্ডিত, জামাতারাও তাই। প্রত্যেকেই দেশান্তরে স্বকর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত। কেউ কোন রাজার কুল-পণ্ডিত, কেউ সভাপণ্ডিত, কেউ বড় টোলের অধ্যাপক। ব্রাহ্মণ আপন গ্রামেই থাকেন—আপন কর্ম্ম করেন/একদিন তিনি হাটে গিয়ে হঠাৎ এক মেছুনীর ডালার দিকে চেয়ে চমকে উঠলেন!—মেছুনীর ডালায় একটি কালো রঙের সুডৌল পাথর, গায়ে কতকগুলি চিহ্ন। পাথর নয়, নারায়ণ-শিলা—শালগ্রাম। মেছুনীর ওই অপবিত্র ডালায় আমিষগন্ধের মধ্যে পূত নারায়ণশিলা! তিনি তৎক্ষণাৎ সেই মেছুনীকে বলিলেন—ওটি তুমি কোথায় পেলে?

মেছুনী একগাল হেসে প্রণাম ক'রে বললে—বাবা, ওটি নদীর ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছি, ঠিক এক পো ওজন; বাটখারা করেছি ওটিকে। ভারি পয় আমার বাটখারাটির। যেদিন থেকে ওটি পেয়েছি—সেদিন থেকে আমার বাড়-বাড়ান্তর আর সীমে নাই। /

সত্য কথা। মেছুনীর এক-গা সোনার গহনা।

ব্রাহ্মণ বললেন—দেখ মা, এটি হ'ল শালগ্রামশিলা। ঐ আমিষের মধ্যে এঁকে রেখে দিয়েছে—ওতে তোমার মহা-অপরাধ হবে।

মেছুনী হেসেই সারা।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—ওটি তুমি আমায় দাও। আমি তোমায় কিছু টাকা দিচ্ছি। পাঁচ টাকা দিচ্ছি তোমাকে।

মেছুনী বললে—না বাবা। এটি আমি বেচ্‌ব না।

—বেশ, দশ টাকা নাও।

—না বাবা-ঠাকুর। ও আমায় দশ টাকা পাইয়ে দেবে।

—বেশ, কুড়ি টাকা।

—না বাবা! তোমাকে জোড়-হাত করছি।

—আচ্ছা, পঞ্চাশ টাকা।

—হবে না।

—একশো।

—না গো, না।

—এক হাজার।

মেছুনী এবার ব্রাহ্মণের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কোন উত্তর দিলে না; দিতে পারলে না।

—পাঁচ হাজার টাকা দিচ্ছি তোমায়।

এবার মেছুনী আর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। ব্রাহ্মণ তাকে পাঁচটি হাজার টাকা গণে দিয়ে নারায়ণকে এনে গৃহে প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, তৃতীয় দিনের দিন ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখলেন—একটি জ্যোতির্ম্ময় দুরন্ত কিশোর তাঁকে বলছে—আমাকে কেন তুমি মেছনীর ডালা থেকে নিয়ে এলে? আমি সেখানে বেশ ছিলাম। যাও এখুনি ফিরিয়ে দিয়ে এস আমাকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হলেন।

দ্বিতীয় দিনেও আবার সেই স্বপ্ন। তৃতীয় দিনের দিন, স্বপ্নে দেখলেন কিশোরের ভীষণ উগ্রমূর্ত্তি। বলিলেন—ফিরিয়ে দিয়ে এস, নইলে কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশ হবে।

সকালে উঠে সেদিন তিনি গৃহিণীকে সব বললেন। গৃহিণী উত্তর দিলেন—তাই ব'লে নারায়ণকে পরিত্যাগ করবে নাকি? যা' হয় হবে। ও চিন্তা তুমি ক'র না।

রাত্রে আবার সেই স্বপ্ন—আবার—আবার। তখন তিনি পুত্র-জামাতাদের এই স্বপ্ন-বিবরণ লিখে জানাতে চাইলেন তাঁদের মতামত। মতামত এল, সকলেরই এক জবাব—গৃহিণী যা ব'লেছিলেন তাই।

সেদিন রাত্রে স্বপ্নে তিনি নিজে উত্তর দিলেন—ঠাকুর, কেন তুমি রোজ এসে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত কর বল তো? কাজে-কর্ম্মে-বাক্যে-চিন্তায় আমার জবাব কি তুমি আজও পাওনি? আমিষের ডালায় তোমাকে আমি রেখে দিতে পারব না।

পরের দিন ব্রহ্মণ পূজা শেষ ক'রে উঠে নাতি-নাতনীদের ডাকলেন—প্রসাদ নেবার জন্যে! সকলের যেটি ছোট, সেটি ছুটে আসতে গিয়ে অকস্মাৎ হুঁচোট খেয়ে পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাকে তুললেন—কিন্তু তখন শিশুর দেহে আর প্রাণ নাই। মেয়েরা ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। ব্রাহ্মণ অচঞ্চল হ'য়ে শুধু একটু হাসিলেন।

রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন—সেই কিশোর নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলছে—এখনও বুঝে দেখ। জান তো, "সর্ব্বনাশের হেতু যার, আগে মরে নাতি তার!"

ব্রাহ্মণ নীরবে হাসলেন।

তারপর অকস্মাৎ সংসারে আরম্ভ হয়ে গেল মহামারী। একটির পর একটি—'একে একে নিভিল দেউটি।' আর রোজ রাত্রে একই স্বপ্ন। রোজই ব্রাহ্মণ নীরবে হাসেন।

একে একে সংসারের সব শেষ হ'য়ে গেল! অবশিষ্ট রইলেন—ব্রাহ্মণ নিজে আর ব্রাহ্মণী।

আবার স্বপ্ন দেখলেন—এখনও বুঝে দেখ—ব্রাহ্মণী থাকতে।

ব্রাহ্মণ বললেন—তুমি বড় ফাজিল ছোকরা, তুমি বড়ই বিরক্ত করছ আমাকে।

পরদিন ব্রাহ্মণীও গেলেন। আশ্চর্য্য—সেদিন আর রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখলেন না।

ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধাদি শেষ ক'রে, একটি ঝোলায় সেই শালগ্রাম-শিলাটিকে বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। তীর্থ থেকে তীর্থান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, নদ-নদী-বন-জঙ্গল-পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম ক'রে চললেন। পূজার সময় হ'লে একটি স্থান পরিষ্কার ক'রে বসেন—ফুল তুলে পূজা করেন, ফল আহরণ ক'রে ভোগ দেন—প্রসাদ পান।

অবশেষে একদা তিনি মানস সরোবরে এসে উপস্থিত হ'লেন। স্নান করলেন—তারপর পূজায় বসলেন। চোখ বন্ধ ক'রে ধ্যান করছেন—এমন সময় দিব্যগন্ধে স্থান পরিপূর্ণ হয়ে গেল—আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ ক'রে বাজতে লাগল—দেব দুন্দুভি। কে যেন তাঁর প্রাণের ভিতর ডেকে বললে—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ বন্ধ ক'রেই ব্রাহ্মণ বললেন—কে তুমি?

—আমি নারায়ণ।

—তোমার রূপটা কেমন বল তো?

—কেন, চতুর্ভুজ। শঙ্খ চক্র—

—উহুঁ, যাও—যাও, তুমি যাও।

—কেন?

—আমি তোমায় ডাকি নি?

—তবে কাকে ডাকছ?

—সে এক ফাজিল ছোকরা। প্রায়ই এসে স্বপ্নে আমায় শাসাত, তাকে চাই।

এবার সেই স্বপ্নের ছোকরার গলা তিনি শুনতে পেলেন—ব্রাহ্মণ, আমি এসেছি।

চোখ খুলে ব্রাহ্মণ এবার দেখলেন—হ্যাঁ, সেই তো বটে!

হেসে কিশোর বললেন—এস আমার সঙ্গে।

ব্রাহ্মণ আপত্তি করলেন না, বললেন—চল। তোমার দৌড়টাই দেখি।....কিশোর দিব্য রথে চড়ে তাঁকে এক অপূর্ব্ব পুরীতে এনে বললেন—এই তোমার পুরী।...পুরীর দ্বার খুলে গেল; সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল—সেই সকলের ছোট নাতিটি—যে সর্ব্বাগ্রে মারা গিয়েছিল। তার পিছনে-পিছনে আর সব।"...

গল্প শেষ করিয়া ন্যায়তীর্থ চুপ করিলেন।

দেবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া একটু হাসিল।

যতীন হাসিল না। সে ভাবিতেছিল এই অদ্ভুত ব্রাহ্মণটির কথা।

ন্যায়তীর্থ আবার বলিলেন—সেদিন তোমাকে দেখে—বিলুকে দেখে এই কথাই আমার মনে হয়েছিল। তারপর যখন শুনলাম—উপেন রুইদাসের মৃতদেহের সৎকার করতে গেছ তুমি—তাদের সেবা করছ, তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল—মেছুনীর ডালার শালগ্রাম উদ্ধার করতে হাত বাড়িয়েছ তুমি; আত্মা—নারায়ণ, কিন্তু, ওই বায়েন-বাউড়িদের দেহকে যদি মেছুনীর ডালার সঙ্গে তুলনা করি, তবে—আধুনিক তোমরা—রাগ ক'র না যেন।

এতক্ষণে দেবুর চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ন্যায়তীর্থ চাদরের খুঁট দিয়া সস্নেহে সে জল মুছাইয়া দিলেন। দেবুর মাথায় হাত দিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—এখন উঠি ভাই। তোমার সান্ত্বনা তোমায় নিজের কাছে, প্রাণের ভেতরেই তার উৎস রয়েচে। ভাগবত আমার ভাল লাগে, আমার শশী যেদিন মারা যায় সেদিন ভাগবত থেকেই সান্ত্বনা পেয়েছিলাম। তাই বললাম ভাগবতী লীলার একটা গল্প।

যতীনও ন্যায়তীর্থের সঙ্গে উঠিল। পথে যতীন বলিল—এই গল্প-গুলি যদি এ যুগের উপযোগী ক'রে দিয়ে যেতেন আপনি!

হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন—অনুপযোগী কোন্ জায়গাটা মনে হ'ল ভাই?

—রাগ করবেন না তো?

—না, না, না। সত্যের যুক্তির কাছে নতশির হ'তে বাধ্য আমি। রাগ কর্‌ব?....ন্যায়তীর্থ শিশুর মত অকুণ্ঠায় হাসিয়া উঠিলেন।

—ওই আপনার মাছের চুবড়ি, চতুর্ভুজ—শঙ্খ, চক্র ইত্যাদি।

—ভগবানের অনন্তরূপ। যে রূপ খুসি তুমি বসিয়ে নিয়ো। তা' ছাড়া ব্রাহ্মণ তো চতুর্ভুজ মূর্ত্তি চোখেই দেখেন নি। তিনি দেখলেন—তাঁর স্বপ্নের মূর্ত্তিকে—সেই উগ্র কিশোরকে।

যতীন বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া পড়িয়াছিল, রাত্রিও অনেক হইয়াছে। কথা বাড়াইবার আর অবকাশ হইল না। ন্যায়তীর্থ চলিয়া গেলেন।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে যতীনের মনে অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র গুঞ্জন করিয়া উঠিল!

"ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে,
দয়াহীন সংসারে।
তারা ব'লে গেলো ক্ষমা ক'রো সবে, ব'লে গেলো ভালোবাসো',
অন্তর হ'তে বিদ্বেষ বিষ নাশো।
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে—
আজি দুর্দ্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।"....

সাতাশ

মাস দুয়েক পর। গ্রামের কলেরা থামিয়া গিয়াছে।

আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। সাত তারিখে অম্বুবাচী পড়িল। ধরিত্রী নাকি ঋতুমতী হন এই দিনটিতে। আকাশ ঘন-ঘোর মেঘাচ্ছন্ন। বর্ষা প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। 'মিগের বাতে' এবার যেরূপ প্রচণ্ড গুমোট গিয়াছে, তাহাতে এবার বর্ষা সত্বর নামিবে বলিয়া চাষীরা অনুমান করিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠের শেষের দিকে মৃগশিরা নক্ষত্রে যেবার এমন গুমোট হয়, সেবার বর্ষা প্রথম আষাঢ়েই নামিয়া থাকে। অম্বুবাচীতে বর্ষণ হইয়া যদি কাড়ান্ লাগে, তবে সে অতি সুলক্ষণ—ঋতুমতী ধরিত্রীর মৃত্তিকা জলে ভিজিয়া অপরূপ উর্ব্বরা হইয়া উঠে! অম্বুবাচীর তিন দিন কর্ষণ নিষিদ্ধ। গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল।

অম্বুবাচীতে চাষীদের মধ্যে কুস্তি-প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলিত ভাষায় ইহাকে বলে 'আমুতির লড়াই'। এখানকার মধ্যে কুসুমপুর ও আলেপুরেই সমারোহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এই দুইখানি মুসলমানের গ্রাম। আমুতির লড়াই হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই সমারোহের বস্তু। চাষের পূর্ব্বে চাষীরা বোধ হয় শক্তির পরীক্ষা করে। এ অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া; বিভিন্ন স্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চষীরা—যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত, তাহারা যোগ দেয়। ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়, সেই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তবে শক্তি-চর্চ্চায়—শক্তি-প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশী।

যতীনের বাড়ীর সম্মুখে একটা জায়গা খুঁড়িয়া উচ্চিংড়ে ও গোবরা আখড়া খুলিয়াছে। দুইটাতে সারাদিন যুধ্যমান হইয়া পড়িয়াই আছে।

আজ নিষ্ঠাবান চাষীর বাড়ীতে অরন্ধন। ঋতুমতী ধরিত্রীর বুকে আগুন জ্বলিবে না; ব্রাহ্মণ এবং বিধবারা এই তিন দিনই অগ্নিসিদ্ধ বা অগ্নিদগ্ধ কোন জিনিস খাইবে না। দেবু আজ অরন্ধন-ব্রত প্রতিপালন করিতেছে। একা বসিয়া শান্ত উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে মেঘ-মেদুর আকাশের দিকে। বর্ষার সজল ঘন মেঘ; পুঞ্জিত হইতেছে, আবর্তিত হইতেছে, ভাসিয়া চলিতেছে ওই দূর-দিগন্তের অন্তরালে; আবার এ দিগন্ত হইতে উদয় হইতেছে নূতন মেঘের পুঞ্জ। অচিরে বর্ষা নামিবে। অজস্র বর্ষণে পৃথিবী সুজলা হইয়া উঠিবে, শস্যসম্ভারে শ্যামলা হইয়া উঠিবে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে! ....একা বসিয়া সে এমনি করিয়া কত কথা ভাবে। অকস্মাৎ জীবনে যে প্রচণ্ড বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল—তাহার ফলে তাহার প্রকৃতিতেও একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত, উদাসীন, একান্ত একাকী একটি মানুষ; গ্রামের সকলে তাহাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, কিন্তু তবু তাহারা তাহার পাশে বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না। দেবুর নিশ্চেষ্ট নির্ব্বাক্ উদাসীনতার মধ্যে তাহারা যেন হাঁপাইয়া উঠে।

রাত্রে—গভীর রাত্রে দেবু গিয়া বসে যতীনের কাছে। ওই সময় তাহার সঙ্গী মেলে। যতীন তাহাকে অনেকগুলি বই দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী দেবুর ছিল; যতীন তাহাকে দিয়াছে রবীন্দ্র-নাথের কয়েকখানি বই, শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, কয়েকজন আধুনিক লেখকের লেখা কয়েকখানা বইও তাহার মধ্যে আছে। নিঃসঙ্গ অবসরে উহারই মধ্যে তাহার সময় অনেকটা নিরুদ্বেগ প্রশান্তির মধ্যে কাটে। কখনও কখনও সে দাওয়ার উপর একা বসিয়া চাহিয়া থাকে—

ঠিক দাওয়ার সম্মুখে রাস্তার উপরের শিউলী গাছটির দিকে। ওই শিউলী গাছটির সঙ্গে বিলুর সহস্র স্মৃতি বিজড়িত। বিলু শিউলীফুল বড় ভালবাসিত। কতদিন দেবুও বিলুর সঙ্গে শরতকালের ভোরে উঠিয়া শিউলী ফুল কুড়াইয়াছে।

আজ আবার বৈকালে তাহাকে আলেপুর যাইতে হইবে। আলেপুরের সেখ চাষীরা তাহার নিকট আসিয়াছিল; তাহাকে তাহাদের কুস্তির প্রতিযোগীতায় পাঁচজন বিচারকের মধ্যে একজন হইতে হইবে। সে হাসিয়া বলিয়াছিল—আমাকে কেন ইছু ভাই, আর কাউকে—

ইছু বলিয়াছিল—উরে বাস্‌রে! তাই কি হয়? আপনি যি বাত বুলবেন—পাঁচখানা গাঁয়ের নোক সিটি মানবে।

দেবু সেই কথাই ভাবিতেছে। পাঁচখানা গ্রামের লোক তাহাকে মানিবে—একদিন এমনি আকাঙ্ক্ষাই তাহার অন্তরে ছিল। কিন্তু কোন্ মূল্যে সে ইহা পাইয়াছে?

যতীন যদি তাহার সঙ্গে আলেপুরে যাইত, তবে বড় ভাল হইত। এই রাজবন্দী তরুণটিকে তাহার বড় ভাল লাগে, সে তাহাকে অসীম শ্রদ্ধাও করে। যতীন মধ্যে মধ্যে বলে—আমাদের দেশের লোক শক্তির চর্চ্চাটা একেবারে করে না। তাহাকে সে 'আমুতির লড়াই', দেখাইত! সকলেই একদিন করিত শক্তির চর্চ্চা; প্রথাটা এখন বাঁচিয়াও আছে—ওই চণ্ডীমণ্ডপটার মত। চণ্ডীমণ্ডপটা এবার ছাওয়ানো হয় নাই, বর্ষায় এবার ওটা পড়িয়া যাইবে। গ্রামের লোক ছাওয়ায় নাই, শ্রীহরিও হাত দেয় নাই। শ্রীহরি ওটা ভাঙিতেই চায়। এবার দুর্গাপূজার পর সর্ব্বশুদ্ধা ত্রয়োদশীর দিন সে ওখানে দেউল তুলিবে, পাকা নাটমন্দির গড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপ এখন সত্যসত্যই শ্রীহরির! শ্রীহরিই এখন এ গ্রামের জমিদার। শিবকালীপুর

জমিদারি সে-ই কিনিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ তাহার নিজস্ব। ইহারই মধ্যে অনাচ্ছাদিত চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালগুলি বৈশাখের ঝড়ে, কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। কত পুরাতন দিনের বসুধারার চিহ্নগুলির একটিও আর দেখা যায় না।

শ্রীহরিও এখন তাহাকে প্রায়ই ডাকে—এস খুড়ো, আমার ওখানে পায়ের ধুলো দিয়ো।....ব্যঙ্গ করিয়া বলে না, সত্যই সে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করিয়া বলে।

ওদিকে কিন্তু আবার শ্রীহরির সঙ্গে দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বীজ হইতে অঙ্কুরের মত উদ্গত হইতেছে। সেটেলমেণ্টের পাঁচ ধারার ক্যাম্প আসিতেছে। শস্যের মূল্যবৃদ্ধির দাবিতে শ্রীহরি খাজনাবৃদ্ধি দাবি করিবে। শ্রীহরি সেদিন তাহার কাছে কথাটা তুলিয়াছিল। দেবু বলিয়াছে—আশেপাশের গ্রামে কি হয় দেখ। সব গ্রামে কি হয় দেখ। সব গ্রামের লোকে যদি জমিদারকে বৃদ্ধি দেয়—তুমিও পাবে।

গভর্ণমেণ্ট-সার্ভে হাওয়ার ফলে এ দেশে জমিদারের একটা সর্ব্বজনীন পর্ব্বের মত খাজনা-বৃদ্ধির একটা সাধারণ উপলক্ষ উপস্থিত হইয়াছে। প্রজারা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের মাতব্বরেরা তাহার কাছে ইহারই মধ্যে গোপনে গোপনে আসিতেছে। সে বরাবর বলিয়াছে, মনেও করিয়াছে—এ সব ব্যাপারে আর সে থাকিবে না। তবু লোক শুনিতেছে না। কিন্তু খাজনাবৃদ্ধি! ইহার উপর খাজনাবৃদ্ধি! সে শিহরিয়া উঠে। গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখে—জীর্ণ গ্রাম, মাত্র দুইখানা কাপড়, দুই মুঠা ভাত মানুষের জুটিতেছে না, ইহার উপর খাজনাবৃদ্ধি হইলে প্রজারা যে মরিয়া যাইবে। /চাষীর ছেলে জমিদার হইয়া শ্রীহরি এসব কথা প্রায় ভুলিয়াছে; কিন্তু খোকাকে-বিলুকে হারাইয়া সে আজ প্রায় সন্ন্যাসী হইয়াও এ কথা কিছুতেই

ভুলিতে পারিতেছে না। গত কয়েকদিন ধরিয়া যতীনের সঙ্গে তাহার এই আলোচনাই চলিতেছে।/

/ কি করিবে? যদি প্রয়োজন হয়—তবে আবার সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। মধ্যে মধ্যে মনে হয়—না, কাজ কি এ সব পরের ঝঞ্ঝাটে গিয়াছে? তাহার মনে পড়ে ন্যায়তীর্থের গল্প। ধর্ম্মজীবন যাপন করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কিছুতেই তাহা হইয়া উঠে না। যতীন তাহাকে এ গল্পের অন্তরূপ অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার ভাল লাগে নাই। কিন্তু একান্তভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াও সে থাকিতে পারিল না—এইটাই তাহার নিজের কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। /

জগন ও হরেন তো ইহারই মধ্যে ভাবী খাজনাবৃদ্ধিকে উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধঘোষণার পাঁয়তারা কষিতেছে। হরেন পথে-ঘাটে পাড়ায় বেড়ায়, অকারণে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠে—লাগাও ধর্ম্মঘট। আমরা আছি।

বাংলার প্রজা-সমাজে ধর্ম্মঘট একটি পুরাতন প্রথা। /ধর্ম্মঘট নামেই ইহার প্রাচীনত্বের পরিচয় বিদ্যমান। ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া—ঘট পাতিয়া যে-কোন সর্ব্বসাধারণের কর্ম্মসাধনের জন্য পূর্ব্ব হইতে শপথ গ্রহণ করা হইত। পরে উহা জমিদার ও প্রজার—পুঁজিপতি ও শ্রমজীবীর মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে।/

ইহার মধ্যে তাহারা বিপুল উত্তেজনা অনুভব করে, সঙ্ঘশক্তির প্রেরণায় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে চায়,—আত্মস্বার্থ অদ্ভুতভাবে হাস্যমুখে বলি দেয়। প্রতি গ্রামের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—দরিদ্র চাষীদের মধ্যে এক-আধ জনের পূর্ব্বপুরুষ সেকালের প্রজা-ধর্ম্মঘটের মুখ্য ব্যক্তি হইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ভাবী পুরুষকে দরিদ্র করিয়া গিয়াছে। কোন কোন গ্রামে প'ড়ো ভিটা পড়িয়া আছে; যেথা...

পূর্ব্বে ছিল সমৃদ্ধিশালী চাষীর ঘর—সে-ঘর ওই ধর্ম্মঘটের ফলে রিক্ত হইয়াছে; কেহ কেহ উদরান্নের তাড়নায় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, অথবা রোগ অনশন আসিয়া বংশটাকেই শেষ করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু ধর্ম্মঘট সচরাচর হয় না। ধর্ম্মঘট করিবার মত সার্ব্বজনীন উপলক্ষ সাধারণতবড় আসে না। আসিলেও—অভাব হয় প্রেরণা দিবার লোকের। এবার এমনই একটি উপলক্ষ আসিয়াছে। এ অঞ্চলের প্রতি গ্রামেই গভর্ণমেন্ট-সার্ভের পর শস্যের মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে খাজনাবৃদ্ধির আয়োজন করিতেছে জমিদারেরা। প্রজারা খাজনাবৃদ্ধি দিতে চায় না। এটাকে তাহারা অন্যায় বলিয়া মনে করে। কোন যুক্তিই তাহাদের মন মানিতে চায় না। তাহারা পুরুষানুক্রমে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া জমিকে উর্ব্বরা করিতেছে—সে জমির শস্য তাহাদের। অবুঝ মন কিছুতেই বুঝিতে চায় না। গ্রামে গ্রামে প্রজাদের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। আশ্চর্য্য—তাহার প্রতিটি তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে দেবুকে।

আলেপুরের মুসলমান অধিবাসীরা তাহাকে আজ যে আমুক্তির লড়াই দেখিবার নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে-ও এই তরঙ্গ। লড়াইয়ের পর ওই কথাই উত্থাপিত ও অলোচিত হইবে।

মহাগ্রামের তরঙ্গও তাহার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। গ্রামের লোকেরা ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়াছিল। ঠাকুর মহাশয় তাহাদের পাঠাইয়া দিয়াছেন দেবুর কাছে। একটা চিঠিতে লিখিয়া দিয়াছেন—"পণ্ডিত, আমার শাস্ত্রে ইহার বিধান নাই। ভাবিয়া দেখিলাম—তুমি পার, বিবেচনা করিয়া বিধান দিয়ো।"

ন্যায়তীর্থকে সে মনে মনে প্রণাম করিয়াছে।....তুমি আমার ঘাড়ে এই বোঝা চাপাইতেছ ঠাকুর? বেশ, বোঝা ঘাড়ে লইব।...মুখে

তাহার বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেদিন ন্যায়তীর্থের সম্মুখে সে যে হাসি হাসিয়াছিল—সেই হাসি! সে তাই ভাবিতেছে—অন্যায় সঙ্ঘর্ষ সে বাধাইবে না। আইন যখন বৃদ্ধি অনুমোদন করে—তখন প্রজাকে বৃদ্ধি দিতেই হইবে। কিন্তু জমিদারকেও লইতে হইবে সঙ্গতমত—প্রজার সঙ্গতি বিচার করিয়া। আগামী রথের দিন—ন্যায়তীর্থের বাড়ীতে গৃহদেবতার রথযাত্রাকে উপলক্ষ করিয়া যে মেলা বসিবে, সেই মেলায় সমবেত হইবে—পাঁচ-সাতখানা গ্রামের লোক। প্রতি গ্রামের মতব্বরেরা ন্যায়তীর্থের আশীর্ব্বাদ লইতে আসে। ন্যায়তীর্থ দেবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দেবু ঠিক করিয়াছে, সেইখানে সকল গ্রামের মাতব্বরদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যাহা হয় স্থির করিবে।...

'পোঁ—ভস্-ভস্-ভস্' শব্দে রেলগাড়ী ছুটাইয়া আসিয়া হাজির হইল উচ্চিংড়ে। মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইয়া সে বলিল—'নজরবন্দীবাবু ডাকছে।' তারপরই মুখে বাঁশী বাজাইয়া দিয়া ছুটিল—পোঁ—ভস্-ভস্-ভস্-ভস্!

দেবু উচ্চিংড়ের ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

যতীন বলিল—অনিরুদ্ধের কথা।

—দুমাস তো পেরিয়ে গেল দেবু বাবু। তাঁর তো এতদিন ফেরা উচিত ছিল। আমি হিসেব ক'রে দেখছি—দশদিন আগে বেরিয়েছেন তিনি। হিসাবে তাই হয়, থানাতেও তাই বলে।

—তাই তো! অনি ভাইয়ের তো এতদিন ফেরা উচিত ছিল।

—আমি ভাবছি—জেলে আবার কোন হাঙ্গামা ক'রে নতুন ক'রে মেয়াদ হ'ল না তো?

বিচিত্র নয়। অনি ভাইকে বিশ্বাস নাই। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি,

দুর্দান্ত ক্রোধী। অনিরুদ্ধ সব পারে! দেবু বলিল—কামার বউ বোধ হয় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে?

যতীন হাসিল—মা-মণি? দেবুবাবু, ও এক বিচিত্র মানুষ। দেখেছেন না—বাউণ্ডুলে ছেলে দুটো আর কোথাও যায় না! বাড়ীর আশে-পাশেই ঘুরছে দিনরাত। মা-মণি ওই ওদের নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত। একদিন মাত্র অনিরুদ্ধের কথা জিজ্ঞেস করেছিল। ব্যস্। আবার যেদিন মনে পড়বে জিজ্ঞাসা করবে।

দেবুর চোখে এই তুচ্ছ কারণে জল আসিল। খোকাকে কোলে লইয়া বিলুর হাসিভরা মুখ তাহার মনে পড়িয়া গেল।

যতীন বলিল—বরং দুর্গা আমাকে দু'তিন দিন জিজ্ঞাসা করেছে

চোখ মুছিয়া দেবু হাসিল, বলিল—দুর্গা আমার ওদিক দিয়ে আজকাল বড় যায় না। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম—তো বললে—গাঁয়ের লোককে তো জান জামাই? এখন আমি বেশী গেলে এলেই—তোমাকে জড়িয়ে নানান্ কু-কথা রটাবে।

সত্য কথা। দুর্গা দেবুর বাড়ী বড় একটা যায় না। কিন্তু তাহার মাকে পাঠায় দুধ দিতে, পাতুকে পাঠায়—দু'বেলা। রাত্রে পাতুই দেবুর বাড়ীতে শুইয়া থাকে,—সে ও দুর্গার বন্দোবস্ত। তাছাড়া সে-ও যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। সে আর লীলাচঞ্চলা তরঙ্গময়ী নাই। আশ্চর্য্য রকমের শান্ত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় দেবুর ছোঁয়াচ লাগিয়াছে তাহাকে। যতীনের কিশোর তরুণ রূপ তাহাকে আর বিচলিত করে না। সে মাঝে মাঝে দূর হইতে দেবুকে দেখে—তাহারই মত উদাস-দৃষ্টিতে পৃথিবীর দিকে নিরর্থক চাহিয়া থাকে।

যতীন কিছুক্ষণ পরে বলিল—শুনছি শ্রীহরি ঘোষ সদরে দরখাস্ত করেছেন—গ্রামে প্রজা-ধর্ম্মঘটের আয়োজন হচ্ছে; তার মূলে আমি আছি। আমাকে সরাবার চেষ্টা করছেন। সরতেও আমাকে হবে ব'লে

মনে হচ্ছে। কিন্তু এই স্নেহ-পাগলিনী মেয়েটির জন্যে যে ভেবে আকুল হচ্ছি! এক ভরসা—আপনি আছেন। কিন্তু সেও তো একটা ঝঞ্ঝাট। তা ছাড়া এ এক অদ্ভুত মেয়ে, দেবুবাবু। ওই দুটো ছেলেকে আবার জুটিয়েছে। খাবে কি, দিন চলবে কি ক'রে? আমি গেলেই—ঘর ভাড়া দশ টাকা তো বন্ধ হ'য়ে যাবে। জমিও নীলেম হবে শুনছি। ওদিকে আকুলিয়ার ফেলু চৌধুরীও শ্রীহরি ঘোষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে নালিশ করেছে। বাকী খাজনা, তমস্সুকের দেনা—সে যে অনেক টাকা। জমি তো থাকবে না! আজকাল মা-মণি ধান ভানে, কঙ্কনায় ভদ্রলোকদের বাড়ীতে গিয়ে মুড়ি ভাজে। কিন্তু ওতে কি ওই ছেলে দুটো সমেত সংসার চলবে?

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া দেবু বলিল—জেল-অফিস ভিন্ন তো অনিরুদ্ধের সঠিক খবর পাওয়া যাবে না। আমি বরং একবার কাল সদরে গিয়ে খোঁজ করে আসি।

সদরে গিয়া দেবু দুই দিন ফিরিল না। যতীন আরও চিন্তিত হইয়া উঠিল। অপর কেহ সংবাদ জানে না। পদ্মও জানে না। তৃতীয় দিনের দিন দেবু ফিরিল। অনিরুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। জেল হইতে সে বাহির হইয়াছে দশ দিন আগে। দেবু অনেক সন্ধান করিয়াছে, সেই জন্যই দুই দিন দেরি হইয়াছে। জেল হইতে বাহির হইয়া একটা দিন সে শহরেই ছিল—দ্বিতীয় দিন জংসন পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। সেখান হইতে নাকি একটি স্ত্রীলোককে লইয়া সে চলিয়া গিয়াছে। এই পর্য্যন্ত সংবাদ মিলিয়াছে যে, কলে কাজ করিবার জন্য সে কলিকাতা বা বোম্বাই বা দিল্লী বা লাহোর গিয়াছে। অন্তত, সেই কথাই সে বলিয়া গিয়াছে—কলে কাজ করব তো এখানে কেনে করব? বড় কলে কাজ করব। কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, লাহোর যেখানে বেশী মাইনে পাব, য ব।

বাড়ীর ভিতর শিকল নড়িয়া উঠিল।

যতীন ও দেবু উভয়েই চমকিয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। আবার শিকল নাড়িল। যতীন এবার উঠিয়া গিয়া নতশিরে অপরাধীর মত পদ্মের সম্মুখে দাঁড়াইল।

—পদ্ম জিজ্ঞাসা করিল—সে জেল থেকে বেরিয়ে কি কোথাও চলে গিয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কলকাতা, বোম্বাই?

—হ্যাঁ।

পদ্ম আর কোন প্রশ্ন করিল না ফিরিয়া চুপ করিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। সে চলিয়া গিয়াছে? যাক্! তার ধর্ম্ম তার কাছে!

তাহার এ দেখিয়া যতীন আজ আর বিস্মিত হইল না। পদ্ম বিষণ্ণ মূর্ত্তিতে বসিতেই গোবরা ও উচ্চিংড়ে আসিয়া চুপ করিয়া পাশে বসিল। যতীন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া দেবুর নিকট ফিরিয়া আসিল।

* * * *

দিন চারেক পর! সে-দিন রথের দিন।

গত রাত্রি হইতে নব-বর্ষার বর্ষণ হইয়াছে। আকাশ ভাঙা বর্ষণে চারিদিক জলে থৈ-থৈ করিতেছে! 'কাড়ান্' লাগিয়াছে। প্রচণ্ড বর্ষণের মধ্যে মাথালী মাথায় দিয়া চাষীরা মাঠে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জমির আইলের কাটা মুখ বন্ধ করিতেছে, ইঁদুরের গর্ত্ত বন্ধ করিতেছে, —জল আটক করিতে হইবে। পায়ের নীচে মাটি মাখনের মত নরম, সেই মাটি হইতে সোঁদা গন্ধ বাহির হইতেছে। জল-পরিপূর্ণ মাঠ সাদা চক্ চক্ করিতেছে—মেঘলা দিনের আলোর প্রতিফলনে। মধ্যে মধ্যে বীজধানের জমিতে সবুজ সতেজ ধানের চারা চাপ বাঁধিয়া সবুজ

গালিচার মত জাগিয়া আছে। বাতাসে ধানের চারাগুলি দুলিতেছে, —যেন অদৃশ্য লক্ষ্মী-দেবী মেঘ-লোক হইতে নামিয়া কোমল চরণপাতে পৃথিবীর বুকে আসন পাতিয়া বসিতেছেন।

সেই বর্ষণের মধ্যে যতীন বাসা ছাড়িয়া পথে নামিল। তাহার সঙ্গে দারোগাবাবু। দুইজন চৌকীদারের মাথায় তাহার জিনিসপত্র। দেবু, জগন, হরেন, গ্রামের প্রায় যাবতীয় লোক—সেই বর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে। যতীনের অনুমান সত্য হইয়াছে। তাহার এখান হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ আসিয়াছে। সদর সহরে—একেবারে কর্ত্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সম্মুখে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে এবার। দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে ম্লানমুখী পদ্ম; আজ তাহার মাথায় অবগুণ্ঠন নাই। দুই চোখ দিয়া তাহার জলের ধারা গড়াইতেছে। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে ও গোবরা—স্তব্ধ, বিষণ্ণ।

প্রথমটা যতীন শঙ্কিত হইয়াছিল, ভাবিয়াছিল—পদ্ম হয়তো একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। মূর্চ্ছা-ব্যাধিগ্রস্ত পদ্ম হয়তো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবে—এইটাই তাহার বড় আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু পদ্ম তাহাকে নিশ্চিন্ত করিয়া কেবল কাঁদিল। তাহার পাশে উচ্চিংড়ে গোবরা স্নেহে শান্ত হইয়া বসিয়াছিল। পদ্ম তাহাকে কোন কথা বলিল না।

উচ্চিংড়ে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি চলে যাবা বাবু?

—হ্যাঁ। মা-মণির কাছে খুব ভাল হয়ে থাকবি, উচ্চিংড়ে। কেমন? আমি চিঠি নিয়ে খোঁজ নেব তোদের।

ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিয়া উচ্চিংড়ে বলিল—আর তুমি ফিরে আসবা না বাবু?

যতীন ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে গিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল—তারপর পদ্মকে বলিল—মা-মণি, যেদিন ছাড়া পাব, একদিন তো ছেড়ে দিবেই, তোমার কাছে আসব।

পদ্ম চুপ করিয়াই রহিল।

যতীন আবার বলিল—সাবধানে থেকো, বাড়ীতে অভিভাবক কেউ নেই।

এতক্ষণে পদ্ম নীরব রোদনের মধ্যেও মৃদু হাসিয়া হাতটি উপরের দিকে বাড়াইয়া দিয়া আকাশের দিকে চাহিল।

যতীনের চোখে জল আসিল। আত্মসম্বরণ করিয়া সে বলিল—যখন যা হবে, পণ্ডিতকে বলবে—তার পরামর্শ নেবে।

পদ্মের মুখ এবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ পণ্ডিত আছে।....চোখ মুছিয়া এবার সে বলিল—সাবধানে থেকো তুমি।

নলিন, সেই চিত্রকর ছেলেটিও ভিড়ের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া চুপ করিয়া একটি প্রণাম করিয়া, অভ্যাসমত নীরবেই চলিয়া গেল।

যতীন তাহার দিকে চাহিয়া হাসিল।

হরেন হাত ধরিয়া বলিল—গুডবাই ব্রাদার।

জগন বলিল—Released হলে যেন খবর পাই।

সতীশ বাউড়ি আসিয়া প্রণাম করিয়া একখানি ভাঁজকরা ময়লা কাগজ তাহার দিকে বাড়াইয়া একমুখ বোকার হাসি হাসিয়া বলিল—আমাদের গান। নিকে নিতে চেয়েছিলেন আপুনি! অনেকদিন নিকিয়ে রেখেছি দেয়া হয় নাই!

সতীন কাগজখানি লইয়া সযত্নে পকেটে রাখিল।

আশ্চর্য্য! দুর্গা আসে নাই।

দারোগাবাবু বলিল—এইবার চলুন যতীনবাবু।

যতীন দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হইল—চলুন।....দেবু তাহার পাশে পাশে চলিল। পিছনে জগন, হরেন, আরও অনেকে চলিল। পথে চণ্ডীমণ্ডপের ধারে শ্রীহরি ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। মজুরেরা চণ্ডীমণ্ডপের

খড়ের চাল খুলিয়া দিতেছে ; বর্ষার জলে ওটা ভাঙিয়া পড়িবে। তার-পর সে আরম্ভ করিবে—ঠাকুর বাড়ী। শ্রীহরি ঘোষও মৃদু হাসিয়া তাহাকে ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিল।

গ্রাম পার হইয়া তাহারা মাঠে আসিয়া পড়িল। যতীন বলিল—ফিরুন এবার আপনারা।

দেবু বলিল—চলুন, আমি বাঁধ পর্য্যন্ত যাব। ওখান থেকে মহা-গ্রামে যাব ঠাকুরমশায়ের বাড়ী। তাঁর ওখানে রথযাত্রা।

পথে নির্জ্জন একটি মাঠের পুকুর-পাড়ে গাছতলায় দাঁড়াইয়া ছিল দুর্গা। তাহাকে কেহ দেখিল না। কিন্তু সে তাহাদের দিকে চাহিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল—তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

সকলেই চলিতেছিল নীরবে। বেদনায় সকলেই যেন কথা হারাইয়া ফেলিয়াছে। দারোগাবাবুটিও নীরব। সকলের মিলিত বেদনা তাঁহার মনকে তাঁহার অজ্ঞাতসারেই যেন স্পর্শ করিয়াছে।

যতীনের মনে পড়িতেছিল—অনেক কিছু কথা, ছোট-খাটো স্মৃতি। সহসা মাঠের দিকে চাহিয়া তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই বিস্তীর্ণ মাঠে একদিন সবুজ ধানে ভরিয়া উঠিবে, ধীরে ধীরে হেমন্তে স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। চাষীর ঘর ভরিবে রাশি-রাশি সোনার ফসলে।

পরমুহূর্ত্তেই মনে হইল—তারপর ? সে ধান কোথায় হইবে ?

তাহার মনে পড়িল অনিরুদ্ধের সংসারের ছবি। আরও অনেকের ঘরের কথা। জীর্ণ-ঘর, রিক্ত অঙ্গন, অভাবক্লিষ্ট মানুষের মুখ, মহামারী, ম্যালেরিয়া, ঋণভার ; শীর্ণকায় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অজ্ঞ শিশুর দল। উচ্চিংড়ে ও গোবরা—বাংলার ভাবীপুরুষের নমুনা।...

পরক্ষণেই মনে পড়িল—পদ্ম তাহাদের কপালে অশোক-ষষ্ঠীর ফোঁটা দিতেছে।....

হঠাৎ তাহার পড়া ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের কথা তুচ্ছ মনে হইল। অর্দ্ধ-সত্য—সে শুধু কঠিন বস্তুগত হিসাব। কিন্তু সংসারটা শুধু হিসাব দিয়া বুঝিবার নয়। কথাটা তাহাকে একদিন ন্যায়তীর্থ বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে মনে পড়িয়া গেল। সে অবনত মস্তকে বার বার তাঁহাকে প্রণাম জানাইয়া স্বীকার করিল—সংসার ও সংসারের কোন কোন মানুষ হিসাবের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। ন্যায়তীর্থ হিসাবের উর্দ্ধে—পরিমাপের অতিরিক্ত। আর তাহার পাশের এই মানুষটি—পণ্ডিত দেবু ঘোষ; অর্দ্ধ শিক্ষিত চাষীর ছেলে হৃদয়ের প্রসারতায় তাহার নির্দ্ধারিত মূল্যাঙ্ককে ছড়াইয়া গিয়াছে;—কতখানি—কতদূর—যতীন তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারে নাই, কেমন করিয়া গেল—সেও অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত এক রহস্য।

এই হিসাব-ভুলের ফেরেই তো সৃষ্টি বাঁচিয়া আছে। এক ধূমকেতুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে পৃথিবীর একবার চুরমার হইয়া যাইবার কথা ছিল। বিরাট বিরাট হিসাব করিয়া ও অঙ্ক কষিয়াই—সেটা অঙ্কফল হিসাবেই ঘোষিত হইয়াছিল। অঙ্ক ভুল হয় নাই, কিন্তু পৃথিবী কোন্ রহস্যময়ের ইঙ্গিতে ভুল করিয়া ধূমকেতুটার পাশ কাটাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।....

নহিলে, সেই সমাজ-শৃঙ্খলার সবই তো ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্রামের সনাতন ব্যবস্থা—নাপিত, কামার, কুমোর, তাঁতি—আজ স্বকর্ম্মত্যাগী, স্বকর্ম্মহীন। এক গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রামের বন্ধন, পঞ্চগ্রাম হইতে সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, দশগ্রাম, বিংশতিগ্রাম, শতগ্রাম, সহস্রগ্রামের বন্ধন-রজ্জু গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে এলাইয়া গিয়াছে।

মহাগ্রামের 'মহা' বিশেষণ বিকৃত হইয়া 'মহু'তে পরিণত হইয়াছে, শুধু শব্দার্থেই নয়—বাস্তব পরিণতিতেও তাহার মহা মহিমত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; আঠারো পাড়া গ্রাম আজ মাত্র অল্প কয়েক ঘর লোকের বসতিতে পরিণত। ন্যায়তীর্থ জীর্ণ বৃদ্ধ একান্তে দিন গণনা করিয়া চলিয়াছেন।

নদীর ওপরে নূতন মহাগ্রাম রচনা করিতেছে—নূতন কাল। নূতন কালের সে রচনার মধ্যে যে রূপ ফুটিয়া উঠিবে—সে যতীন বইয়ের মধ্যে পড়িয়াছে—তার জন্মস্থান কলিকাতায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে। সে মনে হইলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, মনে হয় গোটা পৃথিবীর আলো নিভিয়া যাইবে, বায়ুপ্রবাহ স্তব্ধ হইবে, গোটা সৃষ্টিটা দুর্ব্বৃত্ত-ধর্ষিতা নারীর মত অন্তঃসার-শূন্য কাঙালিনীতে পরিণত হইবে। জীর্ণ অন্তর, বুকে হাহাকার, বাহিরে চাকচিক্য, মুখে কৃত্রিম হাসি। দুর্ভাগিনী সৃষ্টি! আহ্নিক নিয়মে তার পরিণতি—ক্ষয় রোগীর মত তিলে তিলে মৃত্যু। তবু কিন্তু সে হতাশ নয় আজ। মানুষ সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অঙ্কশাস্ত্রের অতিরিক্ত রহস্য। পৃথিবীর সমুদ্র তটের বালুরাশির মধ্যে একটি বালুকণার মত ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্তির অভ্যন্তরে এই পৃথিবী তাহার মধ্যে যে জীবন রহস্য—সে রহস্য ব্রহ্মাণ্ডের গ্রহ উপগ্রহের রহস্যের ব্যতিক্রম;—এককণা জীবন প্রকৃতির প্রতিকূলতা, মৃত্যুর অমোঘ শক্তি—সমস্তকে অতিক্রম করিয়া শত ধারায়, সহস্র ধারায়, লক্ষ ধারায়, কোটি কোটি ধারায় কালে কালে উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাপ্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে। সে, সকল বাধাকেই অতিক্রম করিবে। আনন্দময়ী প্রাণবতী সৃষ্টি—অফুরন্ত তাহার শক্তি—সে তাহার জীবন বিকাশের সকল প্রতিকূল শক্তিকে ধ্বংস করিবে। তাহাতে তাহার সংশয় নাই আজ। ভারতের জীবনপ্রবাহ বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া আবার ছুটিবে।

ন্যায়রত্ন জীর্ণ। তাঁহার কাল অতীত হইতে চলিয়াছে। তিনি থাকিবেন না। কিন্তু তাঁহার স্মৃতি—আদর্শ নূতন জন্ম লাভ করিবে। যতীন হাসিল। মনে পড়িল—ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথকে। সে আসিবে। দেবু ঘোষ নবরূপে, পল্লীর এই শৃঙ্খলাহীন যুগে, ভাঙাগড়ার আসরের মধ্যে—শ্রীহরি পাল, কঙ্কনার বাবু, থানার জমাদার, দারোগার রক্তচক্ষুকে তুচ্ছ করিয়া—উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, মহামারীর আক্রমণকে

সে বোধ করিয়াছে। দেবুর বুকে বুক রাখিয়া আলিঙ্গনের সময় সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে, অভয়ের বাণী তাহার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইতেছে। সকল বাধা সকল বিঘ্ন দূর করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভের অদম্য আগ্রহের বাণী।

উত্তেজনায় যতীনের শরীরে থর থর করিয়া কম্পন বহিয়া গেল। আনন্দে তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল অদ্ভুত এক দীপ্তি। তাহার আনন্দ, তাহার সান্ত্বনা—সে তাহার কর্ত্তব্য করিয়াছে, বন্দী-জীবনে এই পল্লীর মধ্যে দেবুর জাগরণে সে সাহায্য করিয়াছে। বন্দীত্ব তাহার নিজের জীবনের জাগরণের ভাবপ্লাবনের গতিরোধ করিতে পারে নাই। এমনি করিয়াই নূতন কালের ধর্ষণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে—মানুষ বাঁচিবে। ভয় নাই, ভয় নাই।

বাঁধের উপর দেবু দাঁড়াইয়া বলিল—যতীনবাবু! আসি তা হ'লে। নমস্কার।

যতীন বলিল—নমস্কার দেবুবাবু! বিদায়!....দেবুর হাত দুইখানি নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিয়া দেবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; হঠাৎ থামিয়া আবৃত্তি করিল—

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী—ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

তারপর সে নিতান্ত অকস্মাৎ মুখ ফিরাইয়া দ্রুতবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। দেবু যতীনের গতিপথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চোখ দিয়া তাহার দরদর-ধারে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। এই একান্ত একক জীবন—বিলু-খোকা চলিয়া গিয়াছে,—জগন, হরেন আসিয়া আর তেমন কলরব করে না; সমস্ত গ্রাম হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ যতীন বাবুও চলিয়া গেল। কেমন করিয়া দিন কাটিবে তাহার? কাহাকে লইয়া সে বাঁচিয়া থাকিবে?....সহসা

মনে পড়িল ন্যায়তীর্থের গল্প। কই, তাহার সে শালগ্রাম কই? সে ঊর্দ্ধলোকে আকাশের দিকে চাহিয়া আত্মহারার মত হাত বাড়াইল। সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া অস্ফুট-কাতর স্বরে ডাকিল—ভগবান!

ময়ূরাক্ষীর গর্ভে নামিয়া যতীন আবার ফিরিয়া দাঁড়াইল। সু-উচ্চ বাঁধের উপর দণ্ডায়মান ঊর্দ্ধমুখ ঊর্দ্ধবাহু দেবুকে দেখিয়া সে আনন্দে তৃপ্তিতে মোহগ্রস্তের মত নিশ্চল হইয়া দেবুর দিকে চাহিয়া রহিল।

দারোগা ডাকিল—যতীনবাবু, আসুন।

যতীন মাটিতে হাত ঠেকাইয়া, সেই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল; তারপর বলিল—চলুন।...

দূরাগত ঢাকের শব্দে সচেতন হইয়া দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ঢাক বাজিতেছে। মহাগ্রামে ঢাকের শব্দ। ন্যায়রত্নের বাড়ীতে রথযাত্রা। ঠাকুর বোধ হয় রথে চড়িলেন। রথ হয় তো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে রথ কোথায় গিয়া থামিবে—কে জানে?

বাঁধের পথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

সমাপ্ত